

তৃতীয় খণ্ড

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৬০

ব্লক,—ব্যানার্জি ব্রাদার্স
৬৪, বিধান সরণি কলিকাতা

৪২, বিধান সরণি কলিকাতা-৬, ডি, এম, লাইব্রেরীর পক্ষে
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাৎ
প্রিণ্টার্সের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

জগত জন অম্বা,—
শ্রীশ্রীমা
জননীকে

—লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

জলাধারের অন্তরীক্ষ

প্রাণকুমার

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম

" ২য়

" ৩য়

অবধূত ও যোগিসঙ্গ

মুক্ত-পুরুষ প্রসঙ্গ

হরি যাকে রাখেন

হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর

হিমালয়ের মহাতীর্থে

গঙ্গোত্তরী হতে যমুনোত্তরী ও গোমুখ

অতীত স্বপন

সেকাল ও একাল

পঞ্চ-মা

কয়েকটি কথা

গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ঘটনার বিবরণগুলি কয়েক বৎসর থেকে কথা-সাহিত্য, গল্পভারতী, জনসেবক, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি মাসিকে কোনটি বা শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছিল,—কেবল বিধিনির্বন্ধ লেখাটি অপ্রকাশিত ছিল। এখন সকলগুলি একত্রে তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের তৃতীয় খণ্ডরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোলো—এইজন্য শ্রীযুক্ত ডি. এম্. লাইব্রেরীর অধিকারী মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

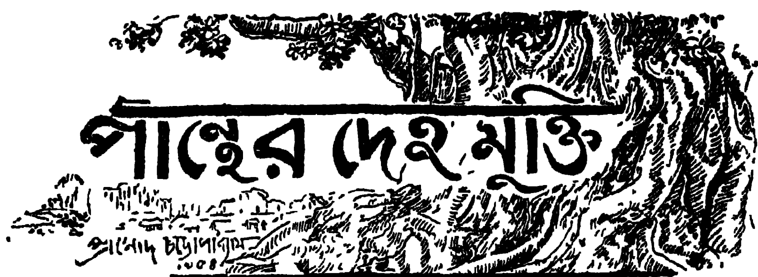
সূচীপত্র

তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

নররূপী নারায়ণ

কভু যদি দেখ, হে রাজন্!
দীনবেশী অদ্ভুত-দর্শন কোন একজন
আসিতেছে তব সিংহাসন পানে,—
অতি-সঙ্গোপনে, নিভৃত অন্তর হ'তে
দূর করে দিও যত শৌর্য-বীর্য রাজ-অভিমান তব ;
যেন কোন অংশ তার প্রকট না হয় তব মুখে,—
আকারে প্রকারে কিম্বা ব্যবহারে, বাক্যে বা করণে।
এই ভাবে হইয়া প্রস্তুত,—দু'বাহু প্রসারি,—
উঠিয়া আসন হতে,—হরি, হরি, নারায়ণ বলি
হয়ে, অগ্রসর,—আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহারে
ধরিও আপন বুকে –।
কিন্তু যদি উদ্ধত প্রকৃতি হেতু আত্ম-অভিমানে,—
দীনহীন ভাবিয়া তাহারে—
বাধে যদি বরিতে আপন বলি ; তবে—
অন্ততঃ এটুকু ক'রো,—
সিংহাসন হতে উঠি জোড় ক'রে দাঁড়ায়ো ক্ষণেক,
অতঃপর ক'রো নমস্কার, নমো নারায়ণ বলি।

সম্ভাষণে স্বাগত জানায়ে,
বসাইয়ো নিজ সিংহাসন-পাশে নিকট আসনে।
কেবা জানে কোন্ অনিশ্চিত ক্ষণে
আসিবেন কোন্ মহাজন, অথবা স্বয়ং
রাজরাজেশ্বর ছদ্মবেশে—
অশেষকল্যাণ-মূর্তি,
যাহার ঈক্ষণে মাত্র
ঘুচিবে তোমার স্বার্থ-অন্ধ মনের গরল,
ত্রিতাপের যত দুঃখ জ্বালা।
টুটিবে গরিমাগ্রন্থি,
শান্তিপূর্ণ প্রাণ,—সর্বঅর্থসিদ্ধি লাভ ঘটিবে তোমার ;
সত্যবাণী মানিও রাজন্। নিজস্থানে করিয়ো দর্শন
অপরূপ বেশে নররূপী নারায়ণে।



পথে যারা চলে পথিক তারাই, কিন্তু এমনও আছে যারা পথে শুধুই চলে না, পথে বাসও করে। বলতে গেলে পথই তাদের আশ্রয়। যাযাবর তারা সত্যই। এই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একবার তাদের এক দলের সঙ্গে কিছুকাল বসবাস ঘটেছিল। ঐ সময়ে বেশ সহজেই সকল প্রদেশের মানুষের সঙ্গে বড় আনন্দে, ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতে পারতাম—তাতেই একটা আনন্দ ছিল, অনেককিছু লাভও হতো। তখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে রাজপুতানা অতিক্রম করে গুজরাটের দিকে যাচ্ছিলাম, দ্বারকানাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে।

ভরতপুর পেরিয়ে জয়পুরের দিকে যেতে পথেই এই পান্থদের সঙ্গে মিলন, সদল বলে চলেছিল পশ্চিমদিক পানে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটলো শৈলবারা নামে একখানা গ্রামের প্রান্তে, মাঠের উপর প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষতলে। দেখতে দেখতে নিকটেই ফাঁকা মাঠের উপর তাদের তাঁবু, ছোট ছোট মোটা কাপড়ের ঘর তৈরী হয়ে গেল।. জনবিরল বসতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অনেক দূরে দূরে। এদের দলটি যেখানে পড়লো পাশেই একখানা ছোট্ট গ্রাম, —শৈলবারা।

এই সব স্থান আমার বৃন্দাবন বলেই মনে হয়,—মাটি, মানুষ, নর-নারী, গাছ-পালা, দৃশ্য যা-কিছুই দেখছি সবই যেন ঐ শ্রীবৃন্দাবনেরই অংশ বলে মনে হচ্ছে।—ব্রজপুরের নেশা এখনও

বোধ হয় কাটেনি। যাক সে কথা, এখন এদের কথাই বলতে হবে। পান্থ বা পন্থ বলেই এরা নিজেদের বলে, আবার কোথাও উদাসী বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে,—অথচ সংসার সঙ্গেই আছে।

দলে যার কথা সবাই মানে তার নাম দেবরাজ। পঞ্চান্ন বৎসর বয়স কিন্তু মনে হয় অনেক কম, চমৎকার কর্মঠ শরীর। এরা তিনটি ভাই, বড় ভাইটি সন্ন্যাসী। এদের পিতা ভীমরাজ—তিনি এখনও আছেন। প্রায় একশো বছর বয়স। শ্রমসাধ্য কাজ আর তাঁকে করতে দেওয়া হয় না—তবে তিনি সবই দেখেন শুনেন। দেবরাজের ছোট ভাই মেঘরাজ, দেখতে যেন রাজপুত্র—কি অসাধারণ শ্রমশক্তি, সারাদিন কাজে লেগেই আছে। যে কয়েকটি পুরুষমূর্তি দেখছি প্রত্যেকের কাজ মনে হয় যেন আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

পরদা-প্রথা আছে। মেয়েরা সবাই ভিতরে থাকে, ব্যতিক্রম কেবল একটি মেয়ের বেলা। কুমারী মেয়েটি মেঘরাজের, নামটি তার ইন্দ্রাণী থেকে ইন্দ্রী হয়ে গিয়েছে, বয়স তার চোদ্দ হবে। এরা রাজস্থানী,—রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য এদের মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণরূপেই প্রকট দেখেছি। মেয়েদের ঘাগরা, কাঁচালী আর ওড়না। আর মরদের চুড়িদার পা-জামা, গায়ে ছাতিবন্ধ পিরান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি।

মেঘরাজকে ভারি সুন্দর দেখতে, বয়স তার প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু দেখতে যেন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবা, তারই মেয়ে ঐ ইন্দ্রী। হাতে তীর ধনুক,—আর নিঃসঙ্কোচ গতাগতি, সর্বত্র। শিকারে তাদের অসাধারণ লক্ষ্য। চোদ্দ বৎসর বয়স, তার রূপটি অপরূপ বলা যায়, তার উপর বাহুবলও অসাধারণ। একটা ডোল, তামার ঘড়ার মতই দেখতে, প্রায় ষাট হাত গভীর কুয়া, তাই থেকে দিনে অনেক বারই জল তোলে। আমি যে কয়দিন তাদের

আশ্রয়ে ছিলাম,—বেশীর ভাগই ঐ ইন্দ্রী, আর মেঘরাজকেই তুলতে দেখেছি।

এদের যে ধনু, বাঁশ বটে কিন্তু খুব শক্ত, হাড়ের মতই কঠিন, কার সাধ্য সহজে বাঁকায়। ছিলাটা থাকে খোলা, ব্যবহারের সময় অতি অল্পক্ষণেই মোটা তাঁতের ছিলাটা পরিয়ে নেয়, অবশ্য হাঁটুর চাড় দিয়েই ধনুকটি বাঁকাতে হয়,—তারপর শর সন্ধান করে। তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আওয়াজ হয়, রামায়ণ মহাভারতে তার নাম টঙ্কার। সে টঙ্কার স্থানবিশেষে বড়ই চমক-প্রদ—ভয়ঙ্কর ; ঐ টঙ্কারে বনের পশুও ভয় পায়। বাঘ ভালুক বা হরিণ যদি নজরের মধ্যে এসে পড়ে তার আর রক্ষা নাই। এদের শিক্ষাই এমন যে তীরটা ধনু থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের অঙ্গ ভেদ করে ফলাটা সোজা বার হয়ে যায়। যদি কোন মানুষ এদের শত্রু হয়, —একটি বাণ তার নামে উৎসর্গ করা থাকে, তাইতেই নিশ্চয় তাকে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে।

একটা বড় বাবলা গাছ কাটা হয়েছিল। এখন তাই থেকে ডাল আলাদা, গুঁড়ি আলাদা, বড় কাঠের চ্যালা সব কেটে কেটে পাশেই রাখছে—মেঘরাজ আর দেবরাজ। গাপ্ গাপ্ গাপ্— কোপ পড়ছে কুড়ুলের ;—অল্প দূরেই বসে দেখছি। এদের কাজটা বটগাছ থেকে খানিক তফাতে। হঠাৎ একটা বাবলা গাছ কাটবার কি এমন দরকার পড়লো বুঝতে পারলাম না ; দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে বললে, এখানে কাল একটা বড় যজ্ঞ হবার কথা আছে,—দেখতেই পাবে।

আমার কি হয়েছে—জানি না। এদের স্বাধীন জীবনের সব কিছুই ভাল লাগে। এদের কাঠ কাটা, জল তোলা, যা-কিছু কাজ সব এমনই সুন্দর, এদের দেহায়তন ভঙ্গির সঙ্গে মানানো—তাইই দেখছিলাম বসে বসে, বেলা তখন প্রায় দশটা,—গরম খুব।

উত্তর দিক থেকে একটি ঘোড়সওয়ার আসছে;—ক্রমে কাছে এসে এখন ঘোড়াটা দাঁড়ালো,—তার উপর থেকে নামলেন এক সরকারী দফাদার। মথুরার কোন সরকারী মহাপ্রভুর চাপরাশী হবেন,—খবর দিলেন, কে এক সাহেব কমিশনার আসছেন, তিনি এইখানেই থাকবেন আজ, এইখানেই তার তাঁবু পড়বে এবং এখনই সব এসে পড়বে—সুতরাং সব হটাও। হুজুর এই সাহেবটি কমিশনার আর বড় লাটেঁা সাহেবের দোস্ত,—হিন্দুস্থান শায়েরমে আয়া,—ইত্যাদি ইত্যাদি। বটগাছ থেকে খানিক দূরেই পান্থদের তাঁবু, সাহেবের তাঁবু অন্যদিকে কিম্বা এই গাছের কাছেই হতে পারতো, কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু তবুও জমাদার সাহেবের হুকুম এখান থেকে সব হটাও। বলতে নেই এখন এটা ব্রিটিশ আমল।

মেঘরাজ বললে,—কাহেজী, হামলোক ক্যা ভগবানকা পয়দা হুয়া জিউ নহি? হাম লোক ইহাই ঠাহরেগা—কইকো বাৎসে হটেগা নহি।

সর্বনাশ—এরা বলে কি?

এদিকে দেখতে দেখতে সাহেবের মালপত্র, লোকজন, ছোল-দারী পর্যন্ত সবই এসে হাজির। ছোলদারী এসেছে—এখনই তাঁবু খাটাতে হবে,—জমাদার তাড়া লাগাতে আরম্ভ করলে। মেঘরাজ কোন কথা না ব'লে নিজের কাজ করতেই রইলো। জমাদার দেখলে এ পক্ষ দুর্বল নয় বরং শক্তিমান;—সে তো প্রমাদ গনলে।

এবার জমাদার মিষ্টি কথায় বলছে,—আরে, এ যে কমশনার, বড়লাট সাহেবকো দোস্ত,—ছোটে লাট-সাহেবকো তরে আদমী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেবরাজ কিন্তু না রাম গঙ্গা, কোন কথা নয়, গপাগপ্ কোপ ঝাড়তে লাগলো বাবলা ডালের উপর।

বেলা বেড়ে যেতে লাগল—শেষে দূরে আগমনশীল অশ্বারোহীকে দেখিয়ে সে বললে,—বো দেখো, অব হামারা সাহাব তো আ গেয়া,

হামকো ক্যা বোলেগা—অব্ তোমলোগ আপনা সামালো। শুনে মেঘরাজ কুড়ুল ফেলে, গাছের ছায়ার মধ্যে এসে বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়ি রেখে, সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,—দৃষ্টি তার দূরে,—ঐ ঘোড়সওয়ার।

দেখতে দেখতে সাহেবও এসে পড়লেন এবং বটগাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে না নেমে, সরল দৃষ্টিতে একবার মেঘরাজের দিকে আর একবার অদূরে এদের তাঁবুর দিকে, তারপর নিজের লোক লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামের দিকে দেখলেন। ইতিমধ্যে জমাদার সেলাম ঠুকে তার বক্তব্যটা বলে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচলো। সাহেব যেন সবই বুঝলেন, কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলেন না বা কোন কথাই বললেন না।

এখন এই বটগাছটার কথা একটু আছে,—গাছটার বহুবিস্তৃত শাখা, এ অঞ্চলের মার্কা-মারা গাছ। এই বিখ্যাত গাছটির তলায়, সারাদিনই মানুষ, পশু, আর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পক্ষী ও সরীসৃপের বসবাস আছে। দিনমানে অনেক পথিক রেঁধে খায়, দুপুরে—রাখাল, গো-পাল ক্লান্ত জীবেরই আড্ডা, ছায়াতে বিশ্রামের সঙ্গেই সবার সম্বন্ধ। বাঁশী বাজায় রাখাল, ক্লান্ত গো-পাল ঝিমুতে ঝিমুতে জাবর কাটে শুয়ে শুয়ে। কাছেই একটি কুয়া আছে,—কাজেই এ অঞ্চলের সবারই যাতায়াতের পথে লক্ষ্য থাকে এই গাছটির দিকে। যাই হোক, এই সাহেবের অবস্থা ক্লান্ত, ঘোড়ারও তথৈবচ,—কিছু কম নয় উপরন্তু তার মুখেতে ফেনা, যেটা বহুদূর থেকে আসার লক্ষণ। এই তরুচ্ছায়া তখন সবার পক্ষেই স্বর্গ। অথচ সাহেব তখনও ঘোড়া থেকে নামচেন না,—কেন? মনে তাঁর একটা কিছু চলছিল,—মেঘরাজের সেই দৃঢ়, পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে হয়তো মনে কিছু বিরুদ্ধ শক্তির আভাস পেয়ে থাকবেন। এমনই সময়ে কোঁস, কোঁস,

হিস্-স্-স্—শব্দের সঙ্গেই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো,—প্রায় বারো হাত তফাতে। দেখা গেল সামনা-সামনি এক চক্রধর—স্থির,—চক্র তুলে সোজা দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচে। দেখতে দেখতে সাহেবের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল,—আর নামার কথা ভাবতেও পারলেন না। কেবল ডান হাতটা সট্ করে বেল্টের দিকে গেল—যেখানে তাঁর মূল্যবান পিস্তলটা ঝুলছিল। কিন্তু আশ্চর্যের উপর তাঁকে আশ্চর্য করে দিলে। হলো কি,—পিস্তলটির হাতল বাগিয়ে ধরবার আগেই একটি তীক্ষ্ণ বাণ এসে ঐ চক্রধরকে বিঁধেই মাটির ভিতরে ফলার খানিকটা ঢুকে গেল। তাঁর দৃষ্টির সামনে সাপটা একেবারে সর্ব শরীর পাকাতে পাকাতে সোজা হয়ে অল্পক্ষণে ঐখানেই স্থির হয়ে রইলো। এইবার সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সদাই প্রফুল্লমুখী ইন্দ্রী এসে দাঁড়ালো, হাতে মুষ্টিবদ্ধ ধনু। সেই



মূর্তি দেখেই সাহেব চমৎকৃত হলেন, মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন —Amazon, indeed! ইন্দ্রী কি বুঝলেন ভগবানই জানেন কিন্তু সাহেবের দিকে চেয়ে উপর নীচে মাথা নাড়িয়ে বললে,— জী হাঁ, সাহেব।

এবার সাহেব চমৎকার হিন্দীতে বললেন,—হাম্ আপ্ কি

হিন্দুস্থান দেখনেকো আয়া, বড়ি দূরসে; অব্ ইয়ে রাজস্থান মে ঘুমরহ। ইতিমধ্যে মেঘরাজ একটা লাঠির উপরে সাপটিকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল পোড়াবে বলে। জাত সাপকে মেরে, না পোড়ালে পাপ হয়, ভারতের সর্বত্রই এই সংস্কার।

সাহেব এখন স্বচ্ছন্দে পায়ে পায়ে এসে একটা মোটা শিকড়ের উপর, সামনে আর এক শিকড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে বেশ যুৎ করেই বসলেন। ইন্দ্রী একদৃষ্টে সাহেবের দিকেই দেখছিল। নারীজাতির মধ্যে যে স্নেহ ও সেবাপ্রবণতা আছে তা যাবে কোথা! সাহেবের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল দেখে,—সে তার চাঁপার কলির মত আঙ্গুল চারটি নিজের মুখের পানে তুলে সঙ্কেতে খাওয়ার ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সাহেব! কুছ খাওগে?

সাহেব চমৎকার হিন্দী বলেন,—এখন উত্তরে বললেন,—আচ্ছা, —বোলো পহলে মুঝে ক্যা খিলাবেগা? ইন্দ্রী বললে, হম্‌লোগকা ঘরমে যো কুছ তৈয়ার হৈ বোহি লায় শক্তা;—রোটি-টিকরা, কুছ ভাজি, আচার ঔর দহি, পেঁড়া দুধকা। আশ্চর্য ব্যাপার—সাহেব বললেন, বহোতাচ্ছা, হাম্‌তো মেহমান্,—লা দো যো আপকী ইচ্ছা, লেকেন্ হামারা পিয়াস লাগা। ইন্দ্রী দ্রুতপদে চলে গেল তাদের তাঁবুর দিকে;—আর অল্পক্ষণ পরেই একটি থালিতে দুখানা বড় বড় মোটা পরোটা, কিছু ভিণ্ডির ভাজি, একটি তেলের আমশী, ছোট একটা পাথরের বাটিতে দই। আর দুটো প্যাঁড়া নিয়ে এলো, আর ঝকঝকে মাজা একটা রূপার মতই কোন ধাতুর ঘটিতে এক পাত্র জল এনে দাঁড়ালো। সাহেব দেখেই খুসি হলেন, কিন্তু থালাটি গ্রহণ করবার আগেই বেশ সরলভাবে বললেন, দো রোটি নেহি, একই হামরা বাস্তে কাফি হৈ, ব্যাস্ ঔর সব ঠিক রহেনে দিজিয়ে।

সাহেব বড়ই উদার দেখলাম, তাঁর বসুধৈব কুটুম্বকম্; একজন কসমোপোলাইট; তখনকার দিনেও এ ধাতের ইংরেজ দুর্লভ ছিল।

যাই হোক, সাহেব তো ঐখানে বসে বসে কোলে থালা রেখে দিব্বি হাতের সঙ্গে আঙ্গুলের ব্যবহার করলেন,—বেশ তারিয়ে তারিয়ে ভাজি দিয়ে খেলেন সেই পরোটাখানি, দুই আঙ্গুল দিয়ে দধিও খেলেন সবটা, শেষে মিষ্টি,—ঘরের তৈয়ারী টাটকা ক্ষীরের প্যাঁড়া দুটি, তাতে চিনির নামগন্ধও ছিল না। ইন্দ্রী চলে গেল, যখন



সাহেব খেতে আরম্ভ করলেন, কেবল সেথা আমি, আগাপোড়া সব কিছুই কাছে বসে দেখছিলাম। খেতে খেতে সাহেব আমার দিকে লক্ষ্য করলেন।

আমার কাপড়-চোপড় এবং চেহারাটাও বোধ করি এদের বিপরীত। তখন মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি,—ভিতরে

কৌপিনের উপর একটা মোটা চাদর মাত্র সর্ব শরীর বেড় দেওয়া, বুকের উপর গাঁট বাঁধা। চলবার সময় পাগড়ি জড়ানো, না হলে খালি মাথা। কাছেই একটা কম্বল পাট করা দেখে সাহেব,—আমার সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দিতে। পরিচয়ে আমায় বাঙ্গালী জেনেই সাহেব যেন কৌতূহলে আবিষ্ট হয়ে বললেন, How strange! I know you people are a terror to the Govt.—I was requested by the Commissioner Mr. Ronald Pierce to keep an eye and beware of Bengalees and now I am to deal with one.

আমার মনে হলো সাহেব কখনই ইংলিশম্যান নয়—তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, উরোপের কোন্ দেশের লোক তুমি, ভদ্র? সাহেব বললে—আমি আইরিশ, চার বৎসর ভারতে এসেছি;—প্রথমে ১৯১০ সালে এসেই আমি হিন্দী শিখলাম;—হিন্দী জানলে সাধারণের সঙ্গে মেশবার সুবিধা হয়। তারপর থেকে আমি সারা উত্তর ভারত ঘুরেছি। দু বছর আগে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখেছি—আমি তখন সরকারী কাজ নিয়েছিলাম। আমি সারা উত্তর ভারতের প্রায় সবই দেখেচি বলতে পারি। হিমালয়ের অনেক স্থান দেখেছি। দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার মত তুষার দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এবার দক্ষিণ ভারত দেখবো মনে করেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কলকাতার কথা হতেই তিনি বললেন,—সেখানে বিপিন পাল, অম্বিকা মজুমদার, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রভৃতি তখনকার বরেণ্য পুরুষ দেশসেবকদের সঙ্গে মিলেছেন। শেষে ভয়ানক খুসী হয়ে উঠলেন যেমনি আমি ই. বি. হ্যাভেলের নাম করলাম—আমাদের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। জানলেন আমি শিল্পী। আমার

খাতাখানিও তাঁর নজরে পড়লো। তার মধ্যে ইন্দ্রীর একটি পেন্সিল স্কেচ ছিল, দেখে ভারি খুসী।

এবার সাহেব একটু বিশ্রাম নিয়েই ঘোড়ায় উঠলেন এবং তাঁর আরদালীকে বললেন,—চিজ বস্তু উঠাকে আগে ভেজো, হাম্ ইধার ঠারনে নহি মাংতা। আগাড়ি, মাইল করিব্ চলো, বন্‌কোটারী গাঁওমে রাতকো রহেঙ্গে। প্রফুল্ল মুখে একবার ইন্দ্রীর দিকে ফিরে একটু হেসে হাতটি তুলেই বললেন—রাম, রাম। ইন্দ্রী কিন্তু রাম রাম করলে বটে—তা ছাড়া শেষে আবার বললে, কেঁও সাহেব, ইহা রহনেকো ডর্ লাগা? সাহেব মুচকে হেসেই বললেন—জী হাঁ, বো চিজকো হাম্ বহোত ডরতে।

সাহেবের ঘোড়া তখনও গতি পায়নি,—পায়ে পায়ে চলছিল—অল্প খানিকটা পথ যেতেই সামনে বেশ লম্বা-চওড়া এক সাধু মূর্তি দেখা গেল,—প্রৌঢ় বয়স, বোধ হয় ষাট বৎসর,—চমৎকার চেহারা, সঙ্গে চেলা একজন, সাহেবের সামনে পড়লেন। সাহেব সাধুর দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ঘোড়ার গতি সংযত করলেন,—ঘোড়াটা যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েচে, সাধু একটু দ্রুত এগিয়ে গেলেন, —একটু মুচ্‌কে হেসে বললেন—এলাহাবাদ কুম্ভ মেলেমে আপকো দেখা থা?

সাহেব বললেন—ঠিক, ঠিক—ইয়াদ আপ কো বড়ি ঠিক। সাহেব যখন কুম্ভ মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যদি এই সব সাধুর মধ্যে এমন কাকেও পান, যিনি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন;—এমনই সময় সাধুটি সাহেবের সামনে এসে বললেন,—সাহেব, কি ভাবচো তুমি? সাহেব বললেন, তুমিই বলো আমি কি ভাবচি। তখন সাধু ঠিক তাহার মনে যা হচ্ছিল সেই কথাই বলে দিলেন। তখনই সাহেব বললেন, ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম বটে; তা আমি আরও

জানতে চাই। তখন সাধু বললেন,—এখন আমি চলে যাবো এখান থেকে, এখন কোন কথাই হবে না। এর পর আর একবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তখন তোমার কথা শুনবো। সাহেব বললেন,—সে দেখাটা কোথায় হবে? সাধু বলেছিলেন, রাজপুতনায় কোথাও হবে। সাহেবের সে কথা এখন মনে পড়লো। সেই ছ বৎসর পর দেখা তো হলো। সাহেব চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এখন তিনি সাধুকে নিয়ে যাবার চেষ্টাই করলেন। বললেন,—

এখান থেকে থোড়াই দূরে আমার তাঁবু,—সেখানেই কথা হবে। সাধু বললেন, আমার এখন যাবার বড়ই দরকার ঐখানে



বলে উদাসীদের তাঁবুর দিকে দেখিয়ে দিলেন। শেষে বললেন, —কাল এখানকার কাজ শেষে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বলেই সাধু চলতে লাগলেন। সাহেব সঙ্গে যেতে যেতে বললেন, —আমার জায়গাটা বক-কোটারী—যেন মনে থাকে,—এখান থেকে অল্পই দূর।

মুচকে হেসে সাধু চললেন পন্থদের তাঁবুর দিকে।

এর পর যে ব্যাপার ঘট্‌লো তা যেমনই অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। সাধু এসে ঐ বটগাছ তলায় বসলেন। কাকেও ডাকতে হলো না;—অল্প কতক্ষণের মধ্যেই প্রথমে অতি বৃদ্ধ ভীমরাজ এলেন, সঙ্গে সঙ্গেই দেবরাজ, আর মেঘরাজ তাঁকে ধরে নিয়ে এলো, আর ইন্দ্রী নাচতে নাচতে এলো। সবাই নতশিরে সাধুর পাদস্পর্শ করলে; সাধুও পন্থদের সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেখানে যেন আনন্দের বাতাস বইতে লাগলো। আমার মনে হলো, এই সাধুটি যাযাবর দলের কেউ হবেন,—কারণ যে ভাষায় তাদের মধ্যে কথা হতে লাগলো সেটা তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রচলিত একটা ভাষা। চমৎকার ভাষা, সেটা মারহাটি, গুজরাটি, সিন্ধি, হিন্দী কোন ভাষাই নয়,—কেমন এক বিচিত্র ভাষা। সেই ভাষায় তারা এমনি আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে আমি কিছু না বুঝলেও ওদের আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেই ওদের সঙ্গেই মেতে গেলাম। ছিলাম আনন্দেই, অথচ মনে মনে চুপচাপ ভাবছিলাম এদের সঙ্গে সাধুর সম্বন্ধটা কি হতে পারে? খানিক পরে ইন্দ্রী যখন আমার খাবার দিতে এলো তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই স্বামীজী কে,—এর সঙ্গে তোমাদের কিছু সম্বন্ধ আছে নাকি?

হাঁ হাঁ, স্বামীজীনে হামারী জ্যেঠা, আমার বাবার বড় ভাই, ভীমরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। সংসার ত্যাগী,—জয়পুর রাজ্যে গলতা গদির গুরু মাধবাচার্যের শিষ্য, বাচপনসে। আশ্চর্য মানুষ। উনি কখনও কখনও আপনিই আসেন, উনি ঠিক টের পান যেখানে আমাদের তাঁবু পড়ে। কিছুদিন থাকেন, উপদেশ দেন, তারপর আপন ইচ্ছামত চলে যান আমাদের আশীর্বাদ করে। উনি ভগবানে প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছেন, উনিও ভগবান হয়ে গেছেন।

এতটা বুঝিয়ে আমাকে বলার পর ইন্দ্রী আমার দিকে এমন ভাবে খানিক চেয়ে রইলো যেন একটা বিশেষ কথা ভাবচে সে আমায় বলবে কিনা, আমি বুঝবো কিনা, আমায় বলা সঙ্গত হবে কিনা, সেই সব কথাই যেন ভাবচে মনে হলো।

আরও মনে হলো,—একটা গুরুতর বিষয় যেন তাকে বেদনা দিচ্চে। কিছু তো বুঝতেই পাবিনি কেবল তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে অপেক্ষাই করচি কতক্ষণে তার মুখ থেকে কথাটা বার হবে। শেষে আমার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত মৃদু স্বরেই বললে—

আপ ক্যা জানতে, জেঠাজি কিসবাস্তে ইসি বখৎ ইধার আয় গেয়া? শুনে তখন আমি অবাক হয়েই বললাম, মুঝে ক্যা মালুম? তার মুখখানি একবার একটু ম্লান হয়ে গেল অন্তরে যেন সে একটা গভীব বেদনা অনুভব কবচে এই বকমই আমার মনে হলো। একটু সামলে নিযেই সে মৃদুস্বরে বললে,— আজ পুর্ণিমা, দাদাজী আজ শরীর ছোড়েঙ্গি—ইসবাস্তে জেঠাজী নে ইহা আগয়া।

আমার কি যে হলো বলতে পারবো না। দুপুরের সময যখন স্বামীজী এসে বটতলে বসলেন, আর বৃদ্ধ ভীমবাজ, দেবরাজ মেঘরাজ সবাই তাঁকে পাদস্পর্শ করেই প্রণাম করলে,—আমিও সব শেষে প্রণাম করলাম স্বামীজীকে।

প্রথমেই পিতা ভীমরাজ এসে পুত্রের পায়ে হাত দিয়ে, একজন সাধারণ শিষ্যের মতই প্রণাম করলেন। এ ব্যাপার বাংলার মাটিতে অচিন্তনীয়,—এমন কি কল্পনাতীত বললেও বেশী বলা হয় না। কি করে পুত্র পিতার প্রণাম গ্রহণ কববেন, তা ভাবতেই পারি না। কিন্তু এ তো হলোই,—এই কর্ম্মক্ষেত্রে স্বচক্ষেই দেখলাম। তারপর আরও চমৎকার কথা,—পিতা দেহত্যাগের কাল জানতে পেরে পুত্রকে আনিয়েচেন অথবা সন্ন্যাসী-পুত্র পিতার অন্তিম জানতে পেরে এসে গিয়েছেন তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্য, সাধনোচিত ধামে

প্রয়াণের জন্য যিনি আজ আটচল্লিশ বৎসর বিপত্নীক হয়ে তাপস-জীবন যাপন করে এসেছেন।

সেই রাত্রে সবার সঙ্গে আমিও মহাত্মা ভীমরাজের দেহত্যাগ দেখলাম।



পূর্ণিমা তিথি,—সন্ধ্যার পর একপাশে দেবরাজ আর এক পাশে মেঘরাজ ভীমরাজকে ধরে নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই প্রাঙ্গণের উপর বিছানা পাতা, তাঁর উপরে তাঁকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলে পর তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। জ্যেষ্ঠ, সন্ন্যাসী পুত্র বিছানার পাশেই একখানি আসনের উপর বসে ছিলেন। বোধ

হোলো এখানে এর মধ্যে ইন্দ্রী ব্যতীত নারী কেউ ছিলনা। সে পায়ের তলায় জমিতেই বসলো। সব চুপচাপ। একদিকে দেবরাজ অন্যদিকে মেঘরাজ,—আমি খানিক দূরে বটগাছের কাছেই বসে আছি।

জ্যোৎস্নাব আলোয় চারিদিকে ভাসচে, এমন আলো যেন আগে কখনও কোথাও দেখিনি, আর নিস্তব্ধ রাত্রির এতটা গাম্ভীর্য কল্পনা অতীত। কাল চলছে, প্রবাহের মতই তার গতি ঐ নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে দিয়েই। দ্বিপ্রহর হোলো, চন্দ্র ঠিক যখন মাথার উপরে,—সন্ন্যাসী আসন থেকে উঠে পিতার কানের কাছেই অত্যন্ত মৃদুস্বরে কিছু বললেন। তখন ভীমরাজ,—আমায় বসিয়ে দাও, বলে হাত দুটি তুললেন। দুইজন দু'দিক ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলে।

চমৎকার বসা; একেবারে সোজাই ব'সলেন, পিছনে কোন অবলম্বন নেই, প্রাণায়ামী যোগিবর যেমন পদ্মাসনে স্থির হ'য়ে বসে আত্মস্থ হন সেইভাবেই ভীমরাজ ব'সলেন, দুই হাত দুই জানুর উপরেই রইল। ক্রমেই তিনি স্থির হয়ে গেলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসী পুত্রও আপন আসনে স্থির। ক্রমে চাঁদ ঢলে পড়লো পশ্চিমে। সেই সময়ে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে একটি ধ্বনি উঠতে লাগলো। এক ধারায় তাঁর ধীর কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে উদর থেকে নির্গত সেই ধ্বনি চারিদিকেই বিস্তৃত হয়ে যেন বায়ুমণ্ডল কাঁপিয়ে তুললে। সবার অন্তরেই সেই ধ্বনির কম্পন, হরি, হরি—ওঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—এইভাবে ঐ ধ্বনিময় বায়ুমণ্ডের মধ্যে যথাকালে কেবল একবার মাত্র—শ্বাসের প্রান্তে হরি-ওঁ,—সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন চমকে উঠলেন,—আর একখানি পা সরে নেমে আসনচ্যুত হয়ে গেল।

দেহত্যাগ ঘটলো ঠিক ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। মুখখানি বুকের উপর ঝুঁকে পড়লো। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে, হরি-ওঁ, ব'লে তাঁকে প্রদক্ষিণ

করতে লাগলো,—সন্ন্যাসী ও ছিলেন ঐ প্রদক্ষিণের সময়। প্রভাত হতেই তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হোলো। আর ঐ সময় মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আর প্রদক্ষিণ করে শেষে প্রণাম করলে।

দেখি, সন্ন্যাসী তখনই চলে গেলেন আর ফিরেও দেখলেন না পিছনে,—কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না।

বেলা হতেই আমি দেখলাম দাহ, বুঝলাম ঐ বাবলা গাছটি কাটা হয়েছিল কেন!

এমন মৃত্যু আগে আর কোথাও দেখিনি।

পরে মেঘরাজের কাছে শুনেছিলাম সব কথাই! ভীমরাজের বিবাহ হয় জয়পুরে উদাসীদের এক পরম রূপবতী মেয়ের সঙ্গে। চিরদিনই উদাসীরা যাযাবর, কিন্তু প্রথমে মেয়ের বাপ ও ভায়েরা ভীমরাজকে পছন্দ করেনি। তখন মাধবাচার্য স্বামীই ভীমরাজের অসাধারণ গুণ ও শৌর্যবীর্যের কথায় তাঁদের আকৃষ্ট করেন—তাইতেই তাঁরা ভীমরাজকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। তারপর স্বামীজী ভীমরাজকে বলেন, তোমার প্রথম পুত্রটি ভগবানের জন্য উৎসর্গ করবে এই প্রতিজ্ঞা যদি করো তা হলে তোমাদের এই বিবাহের ফল শুভ হবে। তিনি তাই-ই করেছিলেন। যখনই আমার প্রথম ভাইটি হোলো,—আচার্য স্বামী এলেন, নিয়ম মত উৎসর্গ করলেন তাকে ভগবানের নামে। তারপর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গলতায় তাঁর গদিতে। তখন থেকেই তিনি সন্ন্যাসী।

আত্মার পরশ

প্রত্যেক উদ্যমশীল ব্যক্তির কাজে প্রতিভার খেলা কিছু আছেই এটা আমরা ধরে নিতে পারি। প্রতিভাবানকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি প্রাণে-প্রাণে।

পৃথিবীর সভ্য সমাজে প্রতিভার আদর সর্বত্রই, ওটি না থাকলে,—সভ্য সমাজ অন্ধকার। অনেকের ধারণা প্রতিভা বাগ্দেবীর বিশেষ অনুগ্রহ। ঐ শক্তি কোন বিশিষ্ট মানবের মধ্যে যথাকালে বিকশিত হয়, ঘষে-মেজে চেষ্টা চরিত্রের ফলে হবার নয়। তবে পরিমার্জনের ফলে অথবা প্রবল চেষ্টার দ্বারা যে খানিকটা হয় না তা মনে হয় না। কিন্তু পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার যে স্ফূর্তি বিদগ্ধ জনের প্রাণে প্রাণে অপূর্ব রসের প্রবাহ সৃষ্টি করে, রসিকের মর্মে যে বিচিত্র রসনানুভূতি জাগায়, ভাবকে জীবন্ত ক'রে তোলে, সেই প্রতিভা যথার্থ ই ভগবানের প্রসাদ,—এ আমাদের অন্তরের কথা। তবে এইটি কালের মধ্যে দিয়েই একজনের জীবনে বিকশিত হয়। অনেক সময়ে বাল্যজীবনে একজন প্রতিভাশালীকে চেনা যায় না—এমনও হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

অবিনাশ ছিল আমাদের সহপাঠি; তার পড়াশুনা বরাবর খুব ভালোই—কিন্তু তার প্রধান যে গুণে আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেটি তার নির্বিরোধী স্বভাব, আর সবার কাছে নমনীয় ভাবটি। যথার্থ ই ক্লাসের সকল ছাত্রের ঐটির অভাব, এটা আমি তখন থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করে আসছিলাম। বরাবরই দেখে আসছি,

ক্লাসের যারা ফার্স্ট, সেকেণ্ড বা থার্ড বেঞ্চে বসে, যার যেটুকু আছে তাই নিয়ে জাঁক আর আস্ফালনের সীমা নেই। যার সুখ-সৌভাগ্যের কিছু নেই তার অভিজ্ঞতার গর্ব। এক সঙ্গে জড়ো হওয়া তার তখনই আরম্ভ হয়ে গেল;—ধন, মান, কৌলিন্য, সম্ভ্রম, কর্ম, জ্ঞানাদি নানা ঐশ্বর্যের গর্ব। কিন্তু অবিনাশ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। সবার সঙ্গেই তার ব্যবহার হয়েছে, কথাবার্তাও তার সকলকার সঙ্গেই সমান ছিল,—কিন্তু তার মুখ থেকে কখনও আমরা কোন বিষয়ে গর্ব, জাঁক বা অহঙ্কারের কথা শুনি নি।

একজন আরম্ভ করলে—এই শুনছিস্! আমরা নৈকষ্য কুলীন, আমার ঠাকুরদাদা মহা পণ্ডিত, পাঁচটি বিবাহ, তোরা কি জানিস! আর একজন,—জানিস্! আমাদের দু'খানা গাড়ি আর যা ছুটো ঘোড়া—কি আর বলবো, দেখতে যেমন সাহেব বাড়ীর ঘোড়া। আর একজন বললে, -আমাদের বাড়িতে এতদিন গ্যাসলাইট ছিল, এখন ইলেক্ট্রিক ফিটিংস আরম্ভ হয়েছে, সুইচ টেপো আলো জ্বলে উঠল, দেশলাইয়ের কিছু দরকারই নেই, পরে অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে,—তোদের বাড়ী কি আলো রে, গ্যাস বুঝি? অবিনাশ বললে, না ভাই, আমাদের সবই কেরোসিনের, হ্যারিকেন লণ্ঠন। এই ভাবের কথা। সে চুপটি করে ঠায় বসে বসে সবার কথাই শুনছে, কিন্তু কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলে কখনও কথা বার হ'ত না তার মুখ থেকে।

একই পাড়ায় আমরা থাকতাম,—সেইজন্য আমার সঙ্গে তার মেশামিশি ছিল একটু বেশী। যখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন তার বাবা মারা যান। কিছুদিন পর যখন সে মাথা নেড়া অবস্থায় ক্লাসে এল, একদল হাঁ হাঁ ক'রে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, একটা টুপী পরিস নি কেন? একজন বললে, নেড়ামাথা নিয়ে এলি কি ব'লে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে কিন্তু কারো কথায় উত্তর

না নিয়ে এমন একটু হাসলে তাইতেই সবার কথার উত্তর হয়ে গেল। তখন থেকেই আমি কিন্তু তাব উপর একটি করুণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপব যখন তার সঙ্গে দেখা হ'ত আমাব মনে হ'ত ও আমাদের চেয়ে ঢের বড় এবং মহৎ।

লেখাপড়ায় তার আন্তরিক যত্ন ছিল, যা আমার শুধু নয় অনেকেরই ছিল না। দেড় বৎসর পরে যখন সেবাব এনট্রেন্স পাশ কবলে, এমন বেশী নম্বব পেয়েছিল, ইউনিভারসিটিতে সে বছরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে। তাই স্কুল থেকে তাকে সৎচরিত্রেব জন্য একখানা আব সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে একখানা -দু'খানা স্বর্ণ-পদক দেওয়া হয়েছিল। ছোটটা আড়াই ভরি আর বড়টা ছয় ভবিব পদক। অবশ্য সোনা তখন সস্তা ছিল সত্য,—তাহলেও সে ঐ দুখানা পদক পেয়ে যা করলে তাইতেই আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে সে কখনই আমাদের মতো সাধারণ ছাত্র নয়, সে ঈশ্বর অভিপ্রেত কোন কাজ করতেই এসেছে।

আমাদেবই প্রতিবেশী এক অত্যন্ত গরীব ভদ্রলোক, প্রৌঢ়, কারেন্সি অফিসে কাজ করেন, সাতান্ন টাকা মাইনে,- তাঁর মেয়ের বিবাহ। কন্যাদায়ে তাঁর বিপন্ন অবস্থা আমরা দেখেছি। অবিনাশও সব খবর জানতো, বিশেষ তার বাড়ী থেকে তিন চার খানা বাড়ীর পরেই তাদের বাড়ী। পরিচয়ও ছিল বেশ। তিনি আত্মসম্মান খুইয়ে, ভিক্ষা ক'রে মেয়েটীর বিবাহ দিচ্ছেন। যেদিন সে ঐ মেডেল দুখানা পেলে, স্কুল থেকে একেবারে তাঁদের বাড়ী গিয়ে উঠল। ভিতরে গিয়ে চুপিচুপি ভদ্রলোকটিকে অবাক ক'রে যখন ঐ দুখানি সোনা তাঁর হাতে দিলে, অবিনাশের মুখের দিকে চেয়ে তিনি নির্বাক; যেন অবিনাশ কি করছে অথবা কি তাঁর হাতে দিয়ে সে বলছে কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না, এমন ভাবেই চেয়ে রইলেন অবাক বিস্ময়ে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে মৃদু কোমল কণ্ঠে বলল,—দেখুন, এটা নিয়ে আপনার মেয়েকে কিছু একটা গড়িয়ে দেবেন। তারপর তাঁর পায়ে হাতটি রেখে বললে,—আমার একান্ত অনুরোধ এটা নিয়ে হৈ চৈ করবেন না,—ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, না হ'লে আমি বড়ই দুঃখ পাব।

এ সম্বন্ধে কোন কথা সে বাড়ীর কাকেও, এমনকি মাকেও জানায় নি। অনেক দিন পরে মায়ের কাছে গোপনে বলেছিল।

এই পর্যন্তই অবিনাশের কথা বা আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কারণ এর পর আমি আর ঘরে থাকিনি। বাড়ী ছেড়ে বাইরে বাইরেই থাকতাম, ঘুরে বেড়াতাম এ-দেশে ও-দেশে। প্রায় দুবছর পরে একবার এসে কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে মাত্র কয়েক দিন ছিলাম। শুনলাম, অবিনাশেরা এপাড়া থেকে অনেক আগেই উঠে গিয়েছে, কোথায় আছে সে, কেউ বলতে পারলে না। ভারি ইচ্ছা ছিল তাকে একবার দেখবো। তা হ'লনা—সে যে কি করছে এখন জানতেও পারলাম না। আমি এখন নিজের ভাগ্যচক্রে, নানা বিপর্যয়ের মধ্যেই ওঠাপড়া করতে করতে দশ-বারো বৎসর কাটিয়ে দিলাম।

তার মধ্যে পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে, তারপর পর্যটন আর সাধুসঙ্গ।

এখন আমি দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানেই ঘুরছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে ত্রিবেন্দ্রামে এসে পড়লাম। খুব বড় না হ'লেও চমৎকার রাজ্য এই ট্রাভাঙ্কোর। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি এবং দেবস্থানও আছে। আবার আধুনিকতায়,—বোধ হয় জয়পুর, মাইশোর, বরোদা প্রভৃতি ভারতের বড় বড় রুলিং প্রিন্সদের রাজ্যের অন্যতম ট্রাভাঙ্কোর, সংস্কৃতির দিক থেকেও কম নয়। নরনারী নির্বিচারে বিদ্যাধিকারে এতটা অগ্রগতি, এমন আর

কোথাও দেখিনি। মহারাজার একটি মিউজিয়াম এবং চিত্রশালা, তাইতে বর্তমান ভারতের শিল্পোৎকর্ষের যত রকমের দৃষ্টান্ত আছে এখানে তার সংগ্রহ প্রচুর। তা ছাড়া বহুকালের প্রাচীন অমূল্য শিল্পকীর্তি ঐ অনন্ত শয়নে নারায়ণ মূর্তি,—তার যে মন্দির তার তুলনা নেই। কয়েকদিন থেকে এখানে সব কিছুই দেখবার পর কন্যাকুমারীর পথে যাত্রা করলাম।

উত্তর-দক্ষিণে এই নগরের বুকের উপর দিয়ে নদীর মতই এক প্রশস্ত জলপথ, বাণিজ্য ব্যপদেশে অসংখ্য নৌকার যাতায়াত। সে নৌকাও বিচিত্র গঠনের, সে ধরনের নৌকা আমাদের উত্তর বা পূর্ব ভারতের কোথাও দেখা যাবে না, তার চেহারাই আলাদা।

এই দীর্ঘ বিশাল জলপথে মধ্যে মধ্যে সেতু। অপূর্ব এই ট্রাভাঙ্কোর রাজ্য। ত্রিবেন্দ্রামকে ওরা ট্রি ভাণ্ড্রামই বলে।

রাজধানী ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একটি প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য জলপথ ও সেতু অতিক্রম ক'রে চলে গেছে সাগরকূলে কন্যাকুমারী মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত। নানাদৃশ্য দেখতে দেখতে সেই পথেই চলেছি। মধ্যে মধ্যে ছোট বড় গ্রাম,—তার ভিতর দিয়ে পথটি বোধ হয় বাহান্নো মাইল হবে। ঐ রাস্তা এখন মোটর রোড হয়ে গিয়েছে, তখন মোটামুটি পুরনো রাস্তা একটি ছিল। গ্রাম ছেড়ে, পথের দুদিকেই বাগান আর কৃষিক্ষেত্র। মাঝে মাঝে এক একটি গোপুরমের উচ্চ চূড়া দূর গ্রামের মধ্যে, পথের ধারে বড় বড় গাছের ফাঁকে দেখা যায়। চমৎকার দৃশ্যের মধ্যে মুক্ত ভাবটাই সর্বক্ষণই যেন প্রাণে জাগায়। চলতে চলতে, প্রথম রাত্রে এক গ্রামে ছিলাম; দ্বিতীয় দিনে বৈকালে নাগরকয়েল নামে একটি বেশ বড় গ্রামে এসে পড়লাম। এখান থেকে সাগরকূলে কন্যা মন্দিরে পৌঁছাতে আরও একবেলার পথ। এখানেও আছে দেখলাম

একটি বিশাল মন্দির—প্রাচীন শিবেরই স্থান। গোপুরম দেখেই পা আমার সোজা পথ ছেড়ে মন্দির পানেই চললো।

গোপুরম অতিক্রম করেই প্রাঙ্গণ, তার চার দিকেই দীর্ঘ পাষাণময় দরদালানেব মতই। তার স্তম্ভগুলি অপূর্ব শিল্প-কীর্তি, যেমন দক্ষিণের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। আবও ভিতর দিকে পথের ধারেই পাষাণময় এক চত্বর—সেই চাতালেব উপর এক জায়গায় বেশ দীর্ঘ শরীর এক সাধু বসে আছেন। দেখেই মনে হ'ল, অদৃষ্ট ভালো—সোনায় সোহাগার মতো! একে এই মন্দির আশ্রয় তার উপর সাধুসঙ্গ লাভ। ভগবানের কৃপা আমার উপর অসীম। সাধু দেখে প্রথমে মনে হ'ল হয়তো এই দেশেবই মানুষ,—তারপর দেখলাম তাঁর মাথা থেকে সর্বশরীরে কোথাও কোন প্রকার ছাপমারা নেই, তখন মনে হ'ল দাক্ষিণী সাধু নয়। তা তিনি যেখানকারই হোন আমার কাজ আমি কবলাম—অর্থাৎ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েই—প্রণাম ক'রে,—একেবারে তাঁর বেশ কাছে গিয়ে বসলাম। সাধুর মুখখানি আমায় আকৃষ্ট করেছিল।—দাড়ি গোঁফ আছে বটে কিন্তু জটাজুট নয়। পরিষ্কার মুখ, অযত্নরক্ষিত নয়,—দাড়ি গোঁফ চুল রুক্ষ হ'লেও পরিপাটি—শরীর তাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গৈরিক নয়—সাদা কাপড়। চুলগুলি বড় বড়,—মাথার একদিকে চূড়া বাঁধা। প্রশস্ত কপালের উপরে তিনটি ভস্মরেখা, ত্রিপুণ্ড্র। কোমল দৃষ্টি, বর্ণ তার উজ্জ্বল শ্যাম। বেশ পুরু আসনের উপর নরম মৃগচর্ম একখানি পাতা, আপন আসনেই বসে আছেন।

তিনি বসেছিলেন চুপচাপ। দেখতে দেখতে একটি বৃদ্ধ লোক এলেন তাঁর সামনে—মালাবারি ভাষায় কিছু বললেন। তিনিও উত্তর দিলেন সেই ভাষায়, তারপর চলে গেলেন বৃদ্ধটি।

ভাবলাম ইনি বোধহয় মালাবারি। কোন্ দেশের সাধু ঠিক করতে খানিকক্ষণ গেল বটে কিন্তু বরাবরই তাঁর সেই মুখ থেকে

দৃষ্টি ফেরাতেই পারিনি। কেমন একটা যেন বড়ই নিকট সম্পর্কের টান মনের মধ্যে স্পর্শ করছিল, আর যেন স্মৃতিকে আলোড়িত ক'রে আবার স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তিনিও নিশ্চয়ই একটা কিছু করছিলেন আমায় নিয়ে নিজের মনে, আমার তাই-ই বোধ হ'ল।

ঠায় তাঁর মুখের পানে চেয়েই ছিলাম। বড়ই যেন পরিচিত মুখ, যেন কোথায় দেখেছি, কিছুতেই স্মৃতির মধ্যে আনতে পারচি না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন, বললেন পরিষ্কার বাঙ্গলায়, আপনি বাঙ্গলাদেশ থেকেই আসছেন বোধকরি। আশ্চর্য। গোঁফ দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুলে কি অদ্ভুত পরিবর্তন আনে একজনের মুখে। যাই হোক আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ আপনি কি বাঙ্গালী? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো,- আমাদের প্রতিবেশী সেই অবিনাশ! তখনই বলে ফেললাম,— আরে! অবিনাশ!— অবিনাশ মজুমদার? উত্তরে তিনিও আমার নামটী সুন্দর ব'লে ফেললেন।

তুমি কি সন্ন্যাস নিয়েছ? আমি বললাম,— না।

তুমি নিয়েছ নাকি? উত্তরে সে বললে, দেখছ শিখাসূত্র সবই রয়েছে, সাদাকাপড় রয়েছে, সন্ন্যাসী হলাম কি ক'রে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কতদিন? অবিনাশ বললে, আজ কয়েক বৎসর এই দক্ষিণ ভারতেই রয়েছি—কিছুদিন হ'ল আমি ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে পড়েছি।

সুধালাম, কন্যাকুমারী দেখেছ? উত্তর পেলাম, কন্যাকুমারী থেকেই তো এখানে এসেছি, ভেবেছি এইখানেই বসে যাব; স্থানটি ভালো লেগেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সমুদ্রতীর ছেড়ে এতদূরে কেন? সে বললে, সমুদ্রতীরে বড়ই গোলমাল, বড় বেশী লোকের যাতায়াত, ঘন ঘন

লোক আসে,—এখানেই বেশ ভালো লাগল। ইচ্ছা হয়, সমুদ্রে যেতে কোন বাধা নেই,—চমৎকার রাস্তা, এক বেলার পথ মাত্র. হেঁটে গেলেই হ'ল। হাঁটার সুখ আমি পেয়েছি ভাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন কি করলে বন্ধু,—একটু বলবে ?

সে বলে কি,—আরে! ওটা যে আমারও জিজ্ঞাসা। আগে তুমিই বলনা ভাই, কতদিন পরে দেখা। সে আরও বললে,—আমার বাবা মারা যাবার পর আর বোধহয় তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে যখন ও-পাড়া থেকে উঠে আসি তখন তোমাব খোঁজ নিয়েছিলাম, তোমাদের বাড়ীর লোকেরাই বললে,—তাব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুনে হেসে ফেললাম,—আমার কথা থাক এখন তোমার কথা বল না ভাই। কি করলে এতদিন ?

করলাম কাশীবাস আর বেদান্ত অধ্যয়ন, অদ্বৈত চর্চ্চা, সন্ন্যাস নেওয়া। পরে ভালো লাগল না,—তাই ঘুরতে ঘুরতে আজ ছ'সাত বৎসর উত্তর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এই দক্ষিণ ভারতেই এক বৈজ্ঞানিকেব পাল্লায় পড়ে এখন ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

কে ভাই তোমার বৈজ্ঞানিক গুরু---বলবে ? অবিনাশ বললে, মহর্ষি রমণ,—নাম শুনেছ ? বললাম, না। তখন আমি কেন. অনেকেই তাঁর খবর রাখতেন না।

এখন বুঝলাম অবিনাশ মহর্ষি রমণেরই আশ্রয় নিয়েছে। তবে গৈরিক ধারণ ওর উদ্দেশ্য নয়--আনুষ্ঠানিভাবে সন্ন্যাস নিতে ও নারাজ,—সেইজন্য সাদা কাপড় রেখেছে। যাই হোক, এখন বললাম,—কাশী ছাড়লে, বেদান্ত ছাড়লে, কিন্তু এখন বলো কি গ্রহণ করলে ?

অবিনাশ বললে, -আচ্ছা আচ্ছা সব বলব, দেখাব, তুমি

থাকো দিকি কিছুদিন।—মাসখানেক থাকো না ভাই, আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করেই দিচ্ছি।

কাজেই কন্যাকুমারীর পথে অবিনাশের পাল্লায়ই পড়লাম, সে ঠিক তালেই আমায় আটকে ফেললে।

থাকবার ব্যবস্থা সে করে দিলে চমৎকার। যেখানে সে থাকে সেখানে নয়, একখানা ছোট ঘর দিলে আমায় মন্দিরের চত্বরের মধ্যেই। সেখানে সব ব্যবস্থাই হলো, খাওয়া দাওয়া, স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত বাইরে যাতায়াত, যাতে আমার কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থাই করলে সে। এখন এ-কথাটি বলবার যো বইলো না যে, আমার এই বিষয়টি একটু অসুবিধা হচ্ছে। অথচ তার নিজেব নিত্য কর্মপদ্ধতিতে ব্যতিক্রম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই প্রথম ও প্রধান। অবশ্য এ কথাটাও ঠিক যে, যেভাবে সে ওখানে জীবন যাপন করছে তাতে ওখানকাব লোকের শ্রদ্ধার সীমা নেই তাব উপর। ওর মুখের একটি কথা, একটি আজ্ঞা পাবাব জন্য সবাই জোড় হাতে অপেক্ষায় সব সময় রয়েছে, যতক্ষণ সে ঐ আসনে বসে সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার বেখেছে।

সে যে গভীরভাবে কেবল আসনেই বসে থাকত তা নয়। ঐ আসনে—যেখানে তাকে প্রথম পেয়েছিলাম. ওখানে বসবার সময় ছিল একটা। খাওয়ার পরেই সে ঐ আসনে আসত, বিকাল অবধি থাকতো ওখানে। অবিনাশেব পাল্লায় পড়ে গেলাম, মানে আমায় পেয়ে অবিনাশ শুধুই যে আটকে রাখলে তা নয় আমি যে এতদিন কি কাজকর্ম করেছি, কোথা ভ্রমণ করেছি---কত কত সাধু দেখেছি. —সবার চেয়ে কাকে বেশী ভালো লেগেছে আর আমার নিজের জ্ঞানানুসন্ধান, ভজন-সাধন তপস্যা কতটা হয়েছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি কী পেয়েছি সব কিছু খুঁটিনাটি পেট থেকে বার করে নিলে। যা কিছু গত সাত বৎসরের সাধুসঙ্গের ইতিহাস, তার মধ্যে

অঘোরী, মহেশ্বরী মা, বামা ক্ষেপা, শেষে অবধূত, মায় কেশবানন্দের আশ্রমে থাকা, তাঁর কথা যা কিছু জানতাম সে সব-কিছুই শুনে নিলে। অবশ্য অবিনাশের কাছে বলতে আমার প্রাণ থেকে প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছিলাম তাই—আনন্দেই তাকে সবকিছুই বলতে পেরেছিলাম।

গোড়া থেকে মানে, আমাদের আর্যমিশনের সেই স্কুল থেকে অবিনাশকে যেভাবে যেটুকু দেখে এসেছি, এখন দেখলাম তারই পরিপক্ক অবস্থা—আসলে প্রকৃতি তার ঠিক সেরকমই আছে, নির্মল মনের গাম্ভীর্য সেটিও ঠিকই আছে।

আমার কথা তো সবই শুনলে, এর পর এখন তোমার কথাটা একটু জানতে দাও, আমি বললাম।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানবে, আর তা জানবে ব'লেই তো বিধাতার যোগাযোগে এখানে এই ভারতের শেষ প্রান্তে আমরা আজ মিলেছি। আচ্ছা, কাল আমার কথা হবে, কেমন? তারপর একটু হেসে—এত তাড়াতাড়ি কেন, জলে তো পড়োনি। ব'লেই নিজের কাজেই গেলো সে।

কথার তিলমাত্র বেঠিক হবার যো নেই। কখন তার সময় হবে ভাবতে ভাবতে সারাদিন কাটলো। ঠিক পরদিন সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের ভোগ আরতি শেষ হ'লে পর অবিনাশ আমায় নিয়ে চললো বিশাল এই ঠাকুর মন্দিরের এক অংশে। দেখলাম, দীর্ঘ বিশাল এক হল, যাকে আমরা দরদালান বলি, তার শেষ দিকে খানিকটা বেড়া দিয়ে পৃথক একখানা ঘর ক'রে নেওয়া হয়েছে। ঘরখানিও বেশ বড়। বাইরের কেউ এঘরে আসে না। যখন ঘরের ভিতর থাকেন তখন ভিতর থেকে বন্ধ,—যখন বেরিয়ে যান তখন বাইরে থেকে বন্ধ। ভিতরে এক দিকে দেয়াল-ধারেই একখানা নেয়ারের খাটিয়া—তার উপর শয্যা রচনা করা আছে।

মাথার দিকে ছোট চৌকীর উপর একটি বাতিদান, আবার তার পাশেই প্রকাণ্ড এক পিতলের পিলসুজ, তার উপরে প্রদীপেরও আয়োজন আছে। তবে অবিনাশ এখন বাতিই জ্বাললেন।

ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেজের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি কাঠের বড় চৌকী—তার উপরে একটি দ্বাদশ দল পদ্ম, একেবারে খোদাই মনে হল। চমৎকার শিল্পকীর্তি। ছয়টি বড় পাপড়ি, আর দুইটি বড় পাপড়ির মাঝে একটি ক'রে ছোট পাপড়ি। মনে হল চৌকীর তলায় ফাঁক নয়, সবটা নিরেট একখানা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরী ঐ আসন। চৌকীর কেন্দ্রে একটি সরু লাইনের চক্র প্রায় ছয় ইঞ্চি তার ব্যাস, তারই কেন্দ্রে আবার একটি শ্বেতবর্ণ বিন্দু একটি পয়সার চেয়ে বড় নয়। ঘরে বাতির আলোয় এইটুকুই দেখা গেল। এখনও পর্যন্ত অবিনাশ একটিও কথা কয়নি, কেবল আরতির পর প্রণাম শেষে সে আমার হাতখানি ধরে স্নেহভরে বলেছিল, এবার এস। আর এখন বললে, তুমি এখানে বসো একটু তৈরী হয়ে নি, তারপর কথা হবে কেমন? বলেই আর কোন দিকে না দেখে কাপড়খানি খুলেই ফেললে। উলঙ্গ হয়ে কাপড়খানা বিছানার উপর রেখে মাথার বালিশটা নিয়ে দেয়ালের কোলে এক জায়গায় ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটি বালিশের উপরে রেখে পা দুটি ঐরকম ধীরে উঁচু ক'রে দিলে উপর দিকে। শিরাসন করে হাত দুটি তার বালিসের কিনারায় রাখলে খুব আলগা। তারপর স্থির হ'ল। চক্ষু বুজিয়েই ছিল।

ঘরখানায় কোন জানলাই নেই। কেবল যে কাঠের দেয়ালটি পার্টিশান বানিয়ে ঘরখানি পৃথক করা হয়েছে প্রায় আট ফুট উঁচু তার উপর থেকে ভিতরের ছাদ অবধি স্রেফ্ দশবারো ফুট, সবটাই খোলা। ঐ মাত্র খোলা, আলো বাতাস যা কিছু ঐ স্থান দিয়েই আসে। ঘরখানি ঠিক যেন একটি বড় ঠাকুর ঘরই।

ভিতরে দেয়ালের ধারে একখানি চওড়া বেঞ্চে বসে আছি আর দেখছি। প্রায় আধঘণ্টা, সমানে স্থির ছিল অবিনাশ, তারপর ধীরে ধীরে আসন ভাঙ্গলে। ধীরে ধীরে মাথার বালিসটি নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলে—আবার মেজেতেই পদ্মাসনে বসল। অল্পক্ষণেই স্থির হয়েছিল, তারপর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটি একেবারেই ডান দিকে বিপরীতমুখী ক'রে নিলে আবার ঐ ভাবে বাঁদিকে ঘুরিয়ে মট্ মট্ করে আড়া মোড়া ভেঙ্গে নিলে। এবার সে উঠে দাঁড়ালো। তখনও মুখে কথা নেই। আমি বসে বসে দেখচি আর ভাবচি অবিনাশের কোন কাজেই খুঁৎ নেই; ঠিক যেন ও একলাই ঘরে নিত্যকর্ম ক'রে যাচ্ছে। চমৎকার, কেউ দেখছে একজন বাইরের লোক, এ বোধই নেই তার।

এবার সেই রকমই ধীরে ধীরে আমার কাছে এল,- অত্যন্ত কোমলভাবে খুবই সন্তর্পণে তার ডান হাতখানি রাখলে আমার কাঁধে, তারপর কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বললে, তুমি তো মূর্তি মানো?

বললাম,—মানি বৈকি।

তোমার ইষ্টমূর্তি দেখতে চাও?

বললাম,—আমার ইষ্ট তো কোন মূর্তি নয়।

তবে তুমি যে নারায়ণ বলো কি মনে করে?

—বললাম, ইষ্ট যে আমার নারায়ণ, অনন্ত।

—তত্ত্বটি এখন ভালো ক'রে ধরো, আগে রূপ তারপর অরূপ। নাও—

তত্ত্ব ত এইটি জানতাম, আমি ঐ রহস্য অতিক্রম ক'রে এসেছি অর্থাৎ আমি একস্তর উর্দ্ধে আছি,—এই রকমই ধারণা ছিল আমার মধ্যে—এখন কিন্তু অবিনাশের প্রভাবের মধ্যে এসে আর একটু ছাড় দিতে হ'ল। অবিনাশ যখন বললে, আগে রূপ তারপর অরূপ

নাও, অর্থাৎ প্রস্তুত হও। আমি প্রস্তুত হব কি তার মুখের দিকে দেখি,—অপরূপ মূর্তি প্রথমেই। বোধ হ'ল আমার দৃষ্টির সামনে যেন ভাসছে আমার ইষ্ট রূপ। সারা স্থান এমন কি আকাশ জুড়ে বিশাল রূপ কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী মূর্তি। তারপর আমার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই বিরাট মূর্তি আমার সত্তার সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেল, আর আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ—অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ পর আমার মুখ বা কণ্ঠ থেকে, নারায়ণ শব্দটি বেরিয়ে এল, সম্বিৎ ও ফিরে এল। এসব দেখা বা বলার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটি এমনই তত্ত্ব আছে, অধিকারী বিশেষের পক্ষে ধারণা কঠিন হবে না, মানুষের পক্ষে যে ভাগবৎসত্তা ধারণার সম্ভাবনা বা মূর্তি দর্শন হয়, সেটি কি ভাবের।

সে রাত্রের কথা এই পর্যন্তই, অবিনাশ আমায় ঐ ঘরেই রাখলে। কথার প্রয়োজনও ছিলনা, তখন যে অবস্থা আমার তাই নিয়ে একাই আমার সারা রাত্রই কাটল।

পরদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই ছিল না, তবুও অবিনাশ আমায় অতীব যত্নে একরকম জোর করেই প্রসাদ খাওয়ালে,—দ্বিপ্রহরে যখন প্রসাদ পাবার সময় হ'ল। ঠিক যেন আমাব মা। অপূর্ব দেখলাম অবিনাশের ভাবটি, যাথার্থই গুরুর অধিকার তার হয়েছে।

সন্ধ্যারতির পর আবার আমরা এলাম সেই ঘরে। পূর্বে সে যা যা করেছিল ঠিক তাই ক'রে নিল, তারপর দুজনে বসে সামনা সামনি। এখন সে বললে,—আমাদের এই ভারতে ভগবান নিয়ে নানা ভাবের সংস্কার রয়েছে নানা প্রদেশে সাধারণের মধ্যে। তবে আমাদের কথা তাঁদেরই নিয়ে,—যাঁরা যথার্থই উচ্চ অধিকারী,—যাঁরা—ভাগবৎ সাধনায় জীবন বেঁধে ফেলেছেন; আর কিছুই কাম্য নেই; তাদেরই উচ্চ অধিকারী বলছি। এ ছাড়া যারা ভগবান বা

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে টেবল টকিং করেন, অনেক পড়াশুনা ক'রে নানা বিষয় বুঝেছেন, অনেক কিছু জেনেছেন—কোন দরকার নেই আমাদের তাদের কথায়। এখন বলতো একটি কথা, এর আগে তোমার ইষ্ট-মূর্তি দর্শন হয়েছিল কি?

বললাম,—না শুনে সে বললে, আমি জানি হয়নি। কেন হয়নি তাও বলছি। তুমি গোড়া থেকেই ধরে নিয়ে ছিলে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মূর্তি হয় না, মন বুদ্ধির অগম্য স্বরূপ যখন, তখন আর রূপ কল্পনার দরকার কি? একেবারে নির্বিকল্প সমাধিতেই হবে যা হবার। কেমন এই তো তোমার কথা?

অন্তর্যামী অবিনাশ!

বললাম, যাথার্থই তাই। তখন অবিনাশ বললে, এখন কি পেলে?

বললাম, এখন মর্মে মর্মে বুঝেছি, রূপ মূর্তির অধিকার পার না হ'লে অরূপ অনন্ত সত্তার অনুভব হবার নয়, শুধু মনে মনে কল্পনায় পার হওয়া নয়। আগে ইষ্টমূর্তি দর্শন, তারপর ঐ মূর্তি আত্মসাৎ করে নেওয়া। তারপর ইষ্টের সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তা, নিজের সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে, তখনই জন্ম ও জীবন হবে সার্থক।

অবিনাশ আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে জড়িয়ে রইল কতক্ষণ। এখন অবিনাশ বললে, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি এতদিন কি করেছি। এই যে দৈব্য রূপের কথা, ভগবানের নামে আশ্চর্য মূর্তির যে সকল সংস্কার আমাদের মধ্যে ভারতের গুরু পরম্পরা চলে এসেছে—তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অন্বেষণ করেছি। আমার মহাভাগ্যফলে আশ্চর্য গুরু পেয়েছিলাম, যা প্রাণে প্রাণে চেয়েছি তাঁর কাছে তাইই পেয়েছি, মুখ ফুটে চাইতে হয়নি। তারই একটুখানি তুমি দেখেছ।

আমি নির্বাক বসেছিলাম, স্থির আসনে, কথা বলবার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও নয়। তখন সে আবার বললে;- অন্য কাকেও আমি এসব বলিনি, এখানে আসবার পর-এই তোমার সঙ্গেই প্রথম এর পরিচয় হ'ল। দেখলাম তোমার মধ্যে তত্ত্বের স্ফুরণ। তাছাড়া তোমার সব কিছুর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাইতে প্রবৃত্তি হ'ল তোমার সঙ্গে এ সকল নিয়ে ব্যবহারের।

আমার ভিতরের কথা তুমি জানলে কেমন করে?—জিজ্ঞাসা করলাম।

এই যে তিন দিন তোমার সঙ্গে ঘর-কন্না করলাম তাইতেই তো গুরুকৃপায় বুঝে নিলাম। তুমি কি পদার্থ তা ভালো মতেই বুঝে নিয়েছি। তারপরও আছে, তুমিই সবার বড় ব'লে যখন রাম-কৃষ্ণকে ধরেছ, তখন তোমার মধ্যে ধর্মের খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে—এতে সন্দেহ নেই। তাইতো আরো ভালো মতে বুঝলাম; না হ'লে ঐ মানুষটিকে সবার বড় ব'লে ধরবার বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি কখনই হ'ত না।

আমার ভুলও হ'তে পারে তো? তাছাড়া, আমার মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ ওঠে, সত্যই কি আমি ততটা ভক্তিমান?

শুনে অবিনাশ বললে—ভুল হ'তে পারবে না কেন মানুষ যখন, তা হোক তাতে কিছুই এসে যায় না; কিন্তু এ জগতে অন্তত আমাদের ভারতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং ধর্মের অধিকারে যারা যথার্থ মহৎ তারা সবাই ঐ পরমহংসদেবকেই এমন ভাবে বড় বলেই জেনেছেন। তাঁদের অনেকেরই মন্তব্য শুনেছি যে, তাঁরা বলেন, এ পর্যন্ত ভারতভূমিতে যতগুলি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে ইনিই সবার চেয়ে বেশী শক্তিধর, সবার বড়, জ্ঞানী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। এভাবের গুরু আগে আসেন নি। আগে আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এমনভাবে প্রচার করেননি। তবে এটাও

ঠিক, তখনকার মানুষ সরল ছিল বেশী, এত বেশী জ্ঞান ও বিদ্যানুশীলন পটু ছিল না, এখন যেমন। এখন মানুষ-সমাজ অনেক বিস্তৃত এবং জ্ঞানস্পৃহা প্রবল, আগে লোকসমাজ এতটা অগ্রসর হয়নি। সবার উপরে, এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধাক্কা খেয়েই এখনকার ভারতবাসী এতটা উন্নত হ'তে পেরেছে,—আর ঠিক সেই কারণেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্ভব হতে পেরেছে।

এক কথা মনে এল, ব'লেও দিলাম :—

তুমি যেভাবে পরমহংসদেবের ধর্ম এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছ, এসব যদি একটু খুলে সাধারণের কাছে পৌঁছে দাও, তাতে তাঁকে বুঝবার সুবিধা হবে। সাহিত্যের মধ্যে দেখি, তাঁর কথা সাধারণে আলোচনা করে বটে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারে না।

উত্তরে অবিনাশ বললে,—সাধারণকে বুঝাবার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। কোনো ভাগ্যবানের যদি গরজ থাকে, তিনি ভাবুন না কেন, মাথা ঘামান না তাঁর কথা নিয়ে, তাতে তাঁর অশেষ কল্যাণই হবে। তা ছাড়া, এসব বুঝবার একটা সময় বা অবস্থা আছে, সেই অবস্থা না হ'লে ওসব মাথায় ঢোকে না। যাক ও কথা, এখন সাধারণকে ছেড়ে তুমি নিজে একটু মন দাও তো, বন্ধু।—এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে জন্মসূত্রে জীব ভোগের কেন্দ্রে এসে পড়ে, তার পর নানা কর্ম ও ভোগাদির ফলে ত্যাগ ও জ্ঞান লাভ ক'রে জীবনচক্র পূর্ণ ক'রে চলে যায়। আচ্ছা, বলতো দেখি, এখানে কোন্ ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগ বা বিলাস আরম্ভ হয়? তোমার কি মনে হয়, কোনটাকে আগে ধরতে চাও?

সহজেই আমি বলে ফেললাম, চক্ষু বা রূপ নিয়েই তো আমরা প্রথমেই আরম্ভ করি।

তত্ত্বের দিক থেকে যদি সত্যকে ধরে এগিয়ে যেতেই হয়,

তাহলে বলতে হবে ঐ পাঁচটি তত্ত্ব এবং তার জ্ঞান বা বোধ বা অনুভূতি তা একটিরই খেলা, আর সেটি হ'ল মহাপ্রাণ। কিন্তু এটি আপ্ত পুরুষ ব্যতীত আর কারো ধরবার কথা নয়। তবে যদি আমার সঙ্গে এস, সহজে তোমার ধারণা হবে যে, আমাদের স্পর্শ-চেতনাই সবার আগে, দৃষ্টি ও শ্রবণ ফুটবার আগে থেকেই স্পর্শ অনুভূতি,—যেটি আকাশতত্ত্বের গুণ। শুনে আমি বললাম, আরও একটু খুলে বল। তোমার বলার মাহাত্ম্য আছে, শুনতে মিষ্টি লাগে।

অবিনাশ বললে, তা হ'লে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়, কেন আবার র‍্যালা করো,—ব'লে অবিনাশ খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখলে। কি প্রশান্ত দৃষ্টি তার—মুখে প্রসন্ন ভাব; যেন আমার অন্তরক্ষেত্র পরিষ্কার দেখে নিলে। আমি তবুও বললাম, বলনা ভাই। তখন তারও তন্ময় অবস্থা, আমারও একটা নেশার ঘোর লেগেছিল যেন। তত্ত্বের আলোচনায় দেখেছি নেশা হয়, যেমন মাদকদ্রব্য সেবনে হয়।

তা হ'লে চল ঐখানে যেথা সৃষ্টি হচ্চে; সেখানে আগাগোড়াই স্পর্শের ব্যাপার,—এমন কি স্পর্শের চরম বলতে পারো,—কেমন? তারপর সেই ঘনীভূত পরশের মধ্যে দিয়েই জননীর সূক্ষ্ম, বিন্দু পরিমিত ডিম্বকোষের আবরণ ভেদ ক'রে জনকের কীটাণুরূপ বীজ প্রবেশমাত্র, সেই মুহূর্তেই যে সূক্ষ্মতম প্রাণস্পন্দন আরম্ভ হয়ে গেল তাও স্পর্শেরই বিষয়, স্পর্শময় জগতে নিরন্তর ক্রিয়মাণ। তারপর ঐ সূক্ষ্মতম প্রাণশক্তি, পরশের ক্রম-প্রসারতাই জীবের বৃদ্ধির কারণ। মায়ের ঐ প্রাণময়াদি পঞ্চকোষের অভ্যন্তরস্থ তাপের পরশে সঞ্জীবিত ঐ জীব যথাকালে সুপুষ্ট হয়ে যখন ধরণীতে অবতীর্ণ হলেন তখন তার নিজ কোষগুলিও অংশত তৈরী। তখন বাহ্য আকাশ-বাতাস-তেজ-জল ও মাটির পরশের সঙ্গে সঙ্গে কোষ-

গুলির বৃদ্ধি। আত্মা থেকে প্রাণ, সেই প্রাণের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের স্থূল ও সূক্ষ্মতম বিকাশের মধ্যে শিশু অবস্থা থেকে স্পর্শের গুণেই জীবনে আমরা গতি পাই। তারই ফলে আমাদের বৃদ্ধি, কর্ম-প্রবৃত্তি, ভোগাদি সব কিছুই চলতে থাকে। প্রথমেই শিশুর মাকে পাওয়া। সে কি দৃষ্টি? তখন দৃষ্টি কোথা তার? শুধু পরশ। পরশেই মাকে পেল। তা হলে দেখ, আকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে সকল তত্ত্বের সঙ্গে সকল রকমে নিরন্তর যুক্ত হয়ে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষণই কাটিয়ে চলেছি। এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ, আর এতই সহজ যে সেদিকে আমাদের লক্ষ্যই পড়েনা।

এই পর্যন্ত ব'লেই কিছুক্ষণ অবিনাশ স্থির হলেন, চক্ষু বুজেই ছিলেন, আমিও স্থির, মুগ্ধ। এবার অবিনাশ বললেন,—এই পরশের মহিমা ওতপ্রোত এই সৃষ্টির মধ্যে, এমন কি পরমহংস-দেবের যে সমাধি তাও ঐ স্পর্শ ধরেই। এই কথা শুনেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—চমৎকার তো!

অবিনাশ বললেন, আরও চমৎকৃত হবে যদি তুমি ঐ আসনে বসেই অন্তঃকরণের মধ্যে ডুবে যাও। সত্যই চমৎকার, আমার প্রতি তার ঐ নির্দেশমাত্রই এক অপূর্ব অনুভবময় কোমল পরশের মধ্যে ডুবেই গেলাম। তখনকার ভাবেই আমি প্রস্তুত ছিলাম ব'লেই এটি ঘটে গেল।

যখন উঠলাম, সময়ের জ্ঞান নাই,—আনন্দের আবেশে টলমল চিত্ত; সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসদেবের সমাধি তত্ত্বটির অর্থাৎ যে ক্রমে তাঁর সমাধির অবস্থা হতো, অতি সরলভাবেই আমার বোধে ধরা দিয়েছে। নির্বাক আমি, তখন কথার কিছুই ছিল না। চিত্তের মধ্যে ঝটিতি এ কথা যেন স্পর্শ ক'রে গেল যে, এর তুল্য আনন্দের বিষয়ও জীবনে আর কিছু নেই। আর তারই মধ্যে অনেক কিছু ভাবের সঙ্গে শব্দের পরশ দিয়ে গেল, যা এখানে প্রকাশ করা

সঙ্গত নয়। যতই সরল এবং অকপট হই না কেন, ভাষার স্পর্শে এলেই কোন একটি ভাব দেখেছি এমনই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে যে আর প্রকাশের যো রাখে না। অথচ বিচার করে দেখলে তার মধ্যে অসৎ কিছুই নেই।

স্পর্শময় ইন্দ্রিয়চেতনা এখন বড়ই স্পষ্ট এবং জাগ্রত বোধ হ'ল। সকল পরশের মূলেই প্রাণ। ঐ প্রাণই নিত্য, চিদানন্দময় অহং সত্তার একমাত্র অবলম্বন, অনুভূতিময় যন্ত্র, যাকে নিয়ে এই জগৎ সংসারের সঙ্গে যতকিছু সম্বন্ধ এবং ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। কি ভাবে? বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়যন্ত্রের যাহায্যে আমার প্রাণী-জীবনের যত প্রবৃত্তি, কর্ম, ভোগ ও বিলাস জাগিয়ে, সংস্কার, জ্ঞান ও আনন্দেই আমার জীবন সার্থক করছে।

একটি গান, তাব ভাষার সঙ্গে সূক্ষ্ম সুরের তরঙ্গ কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের সঙ্গে লোহাব পরশের মতই প্রাণে লেগে গেল,—আর তারই ফল, অহংসত্ত্বা স্বরূপস্থ হয়ে গেলেন। কোথায় দেহ ইন্দ্রিয়াদি বোধ, সব নিস্পন্দ, অহম্ সমাধি মগ্ন। তখন ঐ অবস্থায় পরমহংসদেবের শরীর যন্ত্রের সকল ক্রিয়াই বন্ধ, কোথাও প্রাণের লক্ষণ পাওয়াই যেত না। তারপর ঐ অবস্থা-চ্যুতিতেই আনন্দ-উপভোগই চলতো অন্তঃকরণে অর্থাৎ মন বুদ্ধিব ভূমিতে নেমে এলে পর।

কিন্তু ঐ যে স্বরূপে স্থিতি, বা স্বরূপানুভূতির কথা, বলবার যো নেই, কারণ প্রকাশের ভাষা নেই, কতকাংশে ব্যক্ত করতে ভাষায় একটিমাত্র শব্দ আছে,—আনন্দ।

এইভাবে কোন মধুর, পবিত্র ভাবোদ্দীপক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের স্পর্শে, মোহমুক্ত শুদ্ধমনা জীবসত্ত্বার স্ব-ভাবে তথা স্ব-রূপে স্থিতির কারণ হয়। ঐ সূত্রেই কোন সঙ্গীত বা ভাবের পরশেই পরমহংসদেবের একেবারেই স্বরূপে অবস্থিতি হ'ত। এত

সহজে স্বরূপস্থ হওয়ার দৃষ্টান্ত জগৎ সংসারে বিরল। ইচ্ছা মাত্রই স্বরূপস্থ হওয়া তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য। তাঁর, মা। শব্দটিই ঐ সূত্র, তাই ধরেই ডুব দিতেন।

পাতঞ্জল যোগ দর্শনোক্ত সমাধির দৃষ্টান্ত যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চান, পরমহংসদেবের উপবিষ্ট ঐ দেবমূর্তির পানে চাইলেই হবে।

যখন আমরা সে রাত্রে কথা শেষ ক'রে নিজ নিজ শয্যাশ্রয় করলাম, অবিনাশ বললে, ঐ অবস্থা আত্মাব স্বরূপে থাকার অবস্থা। তার ফলে অন্তঃকরণে মন বুদ্ধির ভূমিতে নেমে আনন্দ উপভোগ করে, এটি সারা দিনে ও রাত্রে অনেকবারই হয়, আর তা প্রত্যেক জীবেরই হয়, কেবল পরিচয় নেই তাই জানতে পারে না, অনেকে কতক কতক বুঝতে পারে। রাত্রে সুষুপ্তির আগে হয়, পরেও হয়, জাগবার অব্যবহিত পূর্বেও হয়। একটু লক্ষ্য রাখলেই বুঝা যায়।

এই ভাবে আমরা আত্মার পরশ পেয়ে থাকি, এ থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না, হতে পারেনা। উচ্চ-নীচ অভেদেই সেই পরমানন্দের পরশ কাজ করছে জীবের-জীবনে, আর তাইতেই আমরা সঞ্জীবিত।

অনাথের বন্ধুলাভ

এক সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মথুরবাবুর পরমহংস বলেই পরিচিত ছিলেন কলকাতার বাবুসমাজে। কারণ মথুরবাবুই তখন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বৈকালের দিকে গাড়িতে আপনার সামনে বসিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে একটু প্রফুল্ল রাখবার জন্য।

কোথায় কে ভগবদ্ভক্ত, অথবা জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি, সাধক বা সিদ্ধযোগী আছেন খবর পাবার সঙ্গেই তাঁকে দেখবার জন্য অধৈর্য হওয়া; একথা তাঁর তখনকার সেবক হৃদয়রাম, তার পরেই পরমভক্ত মথুরবাবুর মত আর কারো জানবার কথা নয়।

তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহর্ষি খ্যাতি চারদিকেই ছড়িয়েছিল, তাঁর ত্যাগ, সদ্ধর্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠার কথা শুনেই একদিন ঠাকুব মথুরকে ধরে বসলেন,—একবার দেবেন্দ্রনাথকে দেখবো। শেষে মথুরের সঙ্গে গিয়ে দেখে শুনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর নিশ্চিন্ত। একথা এখন আর কারো অজানা নয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন পরিণত যুবা; তখনকার উদ্যানবিলাসী সৌখিনবাবু হলেও অন্যদিকে শিক্ষিত, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, সাহিত্য ও সংগীতাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। এখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা শুনে তাঁরও ইচ্ছা হোলো পরমহংসটি কি চিজ্, দেখবেন একবার নিজের চোখে।

যদু মল্লিকের বাগান কাছেই। এক ক্লাসেরই বন্ধু, যদু মল্লিকের বাগানেই যোগাযোগটা ঘটে গেল। যদুকে ঠাকুর স্নেহ করতেন, সবারই তা জানা কথা! খবর পেয়ে ঠাকুর তো আগেই গিয়ে বসে আছেন, আহ্লাদের সীমা নেই। যথাকালে যতীন্দ্রমোহন এলেন;

যত্নও দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে এক নজরেই তিনি ঠাকুরকে দেখে নিলেন। কোঁচার খুঁটটি গায়ে, একমুখ পান, কষ দিয়ে ধারা গড়াচ্ছে,—সামনের ছুটি বড় বড় দাঁত বার করা, হাসি হাসি মুখখানি দেখে তাঁর মনে কি ভাব হয়েছিল তা আমরা জানি না ;—তবে কি কথা হয়েছিল তা ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন।

আলাপ করতে সদানন্দ ঠাকুরই এগিয়ে এলেন। তাঁর ঐটিই স্বভাব। নিরভিমানী ঠাকুর অপরিচিত কোন ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ সূত্রে প্রথমেই একটি প্রশ্ন প্রায়ই করতেন—মানুষ-জীবনের প্রধান কর্তব্য কি? উত্তরটিও আবার নিজেই যুগিয়ে দিয়ে কেবল তার সমর্থনটুকু চাইতেন এবং তাইতেই কৃতার্থ হয়ে অনুকুল পরিবেশ দেখলে কথার অমৃতধারা ছুটিয়ে ধন্য করতেন। এখন, ঐ একজনকে উপলক্ষ্য করে সকলকেই এখানে এইমাত্র কথা, মানুষের প্রধান কর্তব্য কি ; ঈশ্বর চিন্তাই প্রধান কর্তব্য কিনা?

এ ভাবের প্রশ্ন যতীন্দ্রমোহন হঠাৎ এখানে আশাই করেন নি। অথচ সভার মাঝে তাঁকে এই প্রশ্ন একটা উত্তর দিতেই হবে, যেহেতু তিনি নিজেও একজন কেউ-কেটা তো বটে। মনে যা যোগালো তাই দিয়েই পরমহংসদেবের মুখ বন্ধ করে দিতে চাইলেন। যথা, আমরা সংসারী লোক, আমাদেব মুক্তি কোথা? এই দেখুন না, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা বলে নরকদর্শন করতে হয়েছিল।

এই উত্তর শুনেই ঠাকুর যতীন্দ্রমোহনের অন্তরক্ষেত্রটি পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তারপর তিনি যা বললেন, তাইতেই যতীন্দ্রমোহনকে আর ওখানে বসতে হল না, কাজ আছে তাঁর,—বলেই উঠে গেলেন।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের বোধ হয় ৫।৭ বৎসর পর থেকেই তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপার নাম কলিকাতার ধর্মানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত

সাধারণ এক শ্রেণীর লোকের গোচরেই এসেছিল। ক্রমে তাঁর সাধন সিদ্ধি এবং নানাপ্রকার অসাধারণ যোগৈশ্বর্যের কথা পাঁচজন বন্ধুলোকের মুখে শুনেই সম্ভবত যতীন্দ্রমোহন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত একজন কলিকাতার বাবু, রাজা মানুষ, মহামান্য ব্যক্তি, তিনি নিজেই সেই সাধু দেখতে অজ পল্লীগ্রামে যাবেন?—সে কি সম্ভব? কাজেই পর্বতকে মহম্মদের কাছে আসতে হোলো; তবে অনেক ষড়যন্ত্র করেই এটি ঘটাতে হয়েছিল, বাবাকে সহজে রাজী করাতে পারা যায় নি।

অনেকের ধারণা, বামাক্ষ্যাপা তাঁর আসন ছেড়ে কখনও তারাপীঠের বাইরে যান নি। একথা কিন্তু ঠিক নয়। বোধ হয় ১৮৯০ বা ৯১ এর মধ্যে কোন এক সময় তাঁকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল এবং কিছুদিন তিনি এই মহানগরে বাসও করেছিলেন। তখন এদেশে সর্বত্রই তান্ত্রিক গুরুর বড আদর, বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরের পুরাতন বনেদী কুলীন অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ-বংশীয়দের মধ্যে। সবাই জানেন, রাজা রামমোহন রায় প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরা বংশানুক্রমেই তান্ত্রিক কুলগুরুর শিষ্য। আমরা শুনেছি, গৃহস্থ কুলগুরুর উপর আস্থা ছিল না, সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুলাভের উদ্দেশ্যেই যতীন্দ্রমোহন ব্যামাক্ষ্যাপাকে আনিয়েছিলেন। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না; তবে প্রতিবেশী সাধারণের মধ্যে ঐ মহাত্মার কলিকাতায় আসা এবং রাজবাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে থাকার কথা প্রচারিত হয়েছিল। অনেকেই তাঁর দেখা পেয়েছিলেন আবার কৃপাতেও বঞ্চিত হন নি।

ঐ সময়ে শ্যামাচরণ চক্রবর্তী মশাই বিখ্যাত ধ্রুপদী সিঙ্গির বাগানে থাকতেন। তাঁর অবস্থা মাঝামাঝি;—কিন্তু তিনি

ছিলেন সদানন্দ পুরুষ; জনপ্রিয় এবং নির্বিরোধী মানুষ। সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন; গত বৎসর পেন্‌সান্‌ নিয়েছেন। সংসারে স্ত্রী ও দুটি মাত্র পুত্র। পুত্রভাগ্য তাঁর ভালই। বড়টি সোমনাথ; ভালভাবেই এন্‌জিনীয়ারিং পাশ করে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গেই কাজ করছিল। গত বৎসর মধ্যপ্রদেশে এক দূর জঙ্গলের মধ্যে কাজে গিয়ে, সেখান থেকে কি এক সর্বনাশা অসুখ নিয়ে এলো। আজ দুমাস শয্যাগত;—ডাক্তার-কবিরাজ কিছুই করতে পারছে না; এমনকি রোগটা কী, ধরতেই পারে নি,—তারা হাল ছেড়েই দিয়েছে। ছেলেটি এখন মরণের পথেই চলেছে একথা সবাই বুঝছে।

পিতার কণ্ঠে আর গান আসে না;—এক মাসের উপর তানপুরাটায় ধূলা জমচে। এলোপ্যাথি চিকিৎসকদের পরীক্ষামূলক ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার জন্য তিনি ধনেপ্রাণেই মরতে বসেছেন। এটা করে দেখলে হয়, ওটা করলেও হয়, এইভাবে নানা চিকিৎসার ধারা চলেছে। আর তিনি ঋণে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

ছোট ছেলেটির নাম অনাথবন্ধু—জেনারেল এসেমব্লিতে এফ, এ, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তার শিশুকালে কথাটা ফুটতে দেরি হয়েছিল, সেজন্য পিতাকেও তার পিছনে শাস্ত্রীয় স্বরসাধনার ব্যায়াম নিয়ে অনেক দিন তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর শ্রমের পুরস্কার পেয়েছেন, ছেলেটি স্কুলে মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত। যখন এনট্রেন্স পাস করে, তখন স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, তাই এই দুই বৎসর ফ্রীতে পড়চে। কথা তার খুবই কম, লেখায় সে অতীব দ্রুত এবং শ্রেষ্ঠ রচনা তার, সকল শিক্ষকেরই অভিমত। এখন আঠারো উত্তীর্ণ হয়ে উনিশে পড়েচে। সামনেই তার পরীক্ষা, গত একমাস সে ভাল করে

পড়তেও পারে নি। মনকে কোন রকমেই সে পাঠ্যপুস্তকে লাগাতে পারে না। সর্বসময় চিন্তা, দাদার এ কী রোগই হোলো।

সংসারের যত কিছু বাইরের কাজ, সব তারই। যতক্ষণ কাজে থাকে ততক্ষণ একরকম; তারপর আর কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে অস্থিরচিত্তে ছট্‌ফট্ করে, অথবা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঐ পাংশুবর্ণ শীর্ণকায় রোগীর বিছানার ধারে যেতে প্রাণ চায় না।

রাত্রে মা থাকেন সোমনাথের কাছে, ঐ সময়ে সে নিজের স্থানটিতে ঘুমের আগে যতটুকু সম্ভব পড়বার চেষ্টা করে। বাবা তো টাকার ধান্ধায় ঘোরেন, কখন আসেন কখন বেরিয়ে যান তার ঠিক নেই। আজ ক'দিন থেকে সে বই স্পর্শ করতেই পারে নি। একটা নৈরাশ্য এসে গিয়েচে সকল দিকেই। কবিরাজ ডাক্তার এরা মানুষ তো, এদের কতটুকু শক্তি, মরণ থেকে বাঁচাবার সাধ্য এদের তো থাকতেই পারে না;—একমাত্র দৈবই বল;—ভগবান কি এসব দেখচেন না! তার মা-বাবা তারকেশ্বর থেকে আরম্ভ করে যে-যে দেবতার কথা শুনেচেন, তাঁদের পায়েই আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। কে যে তাঁর সোমনাথকে রক্ষা করবে, কে জানে। সবার পায়েই মাথা কুটচেন, ডোর, মাদুলি, কত দৈব কবচ, চরণামৃত পান, পূজা মানৎ, ঝাড়ফুক—কিছুই বাকী রাখেন নি;—কিন্তু কি হল?—ভগবান!

কি করবে অনাথ?—প্রতিদিন দাদা ক্ষীণ, নির্জীব হয়ে পড়চে; চোখের সামনে আর দেখতে পারা যায় না। কাল থেকে আবাব একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েচে; অনাথের চোখের উপরেই হল সেটা, পিঠের দিকে একটা বেদনা উঠে শরীরটা বাঁকিয়ে দিলে। তখনই ডাক্তার আনা হল; তিনি হাতের উপর ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন। তারপর রুগী ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে রাত্রে, উদ্বেগে অনাথের ঘুম হল না।

সকালে উঠেই এসেচে অনাথ,—বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে,—মায়ের কোলে মাথা। দেখলে, সোম যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। তার প্রাণটা কেমন করে উঠলো ; - কাছে বিছানার উপরে গিয়ে দাদার গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি কষ্ট হচ্চে দাদা ? —কিন্তু সোমনাথের চোখের কোণে জল দেখে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বেরোলো না, কেবল তার কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে সোমনাথ এইবার তার দুর্বল হাত একখানি তুলে অনাথের ঠাণ্ডা হাতখানি ধরে নিয়ে এসে একবার তার বুকের উপরে রাখলে, ক্ষীণকণ্ঠে—আঃ, এই কথাটুকু বেরোলো। তারপর সেই হাতখানি নিয়ে আবার চোখের উপর রেখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে যেন অনুভব করতে লাগলো ঐ ঠাণ্ডাটুকু। অনাথ অনুভব করলে দাদার চোখ বেশ গরম, তাতে তাপ আছে। অনাথের চোখ সজল হয়ে উঠলো,—তারপর টপ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো বুকের উপর। মা তখন নিজে চোখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কাল থেকে অন্নজল ত্যাগ করেচেন মা, ছেলের মাথা কোল থেকে নামান নি, ওঠেন নি বিছানা ছেড়ে।

ডাক্তার এলেন যথাকালে, দশটার পর ;—পরীক্ষা করে দেখলেন। কিছু না বলে শুধু একবার মুখে,—হুম্, শব্দ করে চ'লে গেলেন। এইভাবে সেদিনও রাতটা কাটলো। পরদিন সকালে অনাথ এলো,—দাদার যেন আর সাড় নেই। শরীর তো বিছানার সঙ্গে মিশেই আছে। চক্ষু মুদিত, তবে কোণে জল। মা মাঝে মাঝে মুছিয়ে দিচ্চেন। অনাথ সহ্য করতে পারলে না, বুকের মধ্যে তার প্রবল একটা আলোড়ন ;—ছট্‌ফট্ করে সে ছুটেই বেরিয়ে গেল।

খানিক পর পিতা এলেন। তিনি টাকার ধান্ধায় গিয়েছিলেন

এক বন্ধুর কাছে। সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দু-একজন তাঁর পিছনে ঘরে ঢুকল। তাঁরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চিন্তিত বিরস বদনে রোগীর দিকে চেয়ে ;—তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইলেন, পিতা ঘরেই ছিলেন ; মা জিজ্ঞাসা করলেন, অনাথকে দেখলে,—কোথায় গেল সে ? কর্তা বললেন, যখন বাড়িতে ঢুকচি, বাইরে থেকে এসে একটু আগে, সে, দেখি, হন্ হন্ করে গলির মোড়ে চলেচে, ভাবলাম বোধ হয় ডাক্তারের কাছেই গেল। তারপর রোগীর দিকে চেয়ে একেবারেই ম্রিয়মান হয়ে গেলেন বাবা।

এদিকে বেলাও বাড়চে, দুপরের কাছাকাছি ; দেখা গেল রুগীও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও ক্ষীণ ; ক্রমে যেন স্থির হয়েই এলো। পিতা দেখলেন গায়ে হাতে পায়ে হাত দিয়ে, সব ঠাণ্ডা ; তারপর সর্বাঙ্গ স্থির। দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন—যেখানে সবাই ফিস্ ফিস্ করছিল। আর মা, কয়দিন অনাহারে ক্ষীণ, নির্জীব শরীর নিয়ে অনিদ্রায় ছেলের মাথা কোলে, যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ছেলে বোধ হয় একটু সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে,—এই মনে করেই তিনিও যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

অনাথ গেল কোথা ?

তার সহপাঠি একমাত্র বান্ধব ভূপেন। কথা-প্রসঙ্গে গতকাল তাব কাছেই শুনেছিল, ওদের পাড়ার পাথুরেঘাটা অঞ্চলেই তারাপীঠ থেকে বামাক্ষ্যাপা নামে এক সিদ্ধ যোগী মহাত্মা এসেছেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদের কাছেই এক বাড়িতে থাকেন ; অনেক লোক যাচ্ছে তাঁকে দেখতে। এখন আজ সেই কথা মনে করেই সে ভূপেনের উদ্দেশ্যেই চলেছে। অনাথ হন্ হন্ করে চিৎপুর রোড পেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে ঢুকে বাঁ দিকে এক গলির

ভিতরে প্রবেশ করলে। একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, ভূপেন। ভূপেন আছ ?- ভিতর থেকে অল্পক্ষণেই ভূপেন বেরিয়ে এলো। তাকে দেখেই অনাথ বললে,—আমায় দেখিয়ে দেবে ক্ষ্যাপাবাবা কোথা থাকেন, সেই সাধু।

অনাথের খালি গা, খালি পা, মুখের চেহারা দেখেই ভূপেন আর কোন প্রশ্ন না করেই সোজা অনাথের হাতখানি ধরে বেরিয়ে এলো। তারা চলতে আরম্ভ করল এবং অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল যথাস্থানে। ওখান থেকে বেশী দূর নয় বরং কাছেই বলা যায়—পাথুরেঘাটায় যে বাড়িতে সাধু আছেন, দরজার সামনেই তারা দাঁড়ালো। কয়েকজন লোক আগেই দাঁড়িয়েছিল সদরে। একখানা পালকী, —আর কয়েকজন উৎকলবাসী, পিছনে খোপা বাঁধা বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা গিয়ে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একজন বললে, কে তোমরা, এখানে কি চাও? ছেলে-ছোকরার জায়গা এটা নয়।

অনাথ একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে তার স্বভাব সুলভ কোমল কণ্ঠেই বললে, এখানে সাধুবাবা আছেন, আমরা তাঁর কাছেই যাবো।

না না, তাঁর কাছে যাওয়া হবে না, তাঁকে বিরক্ত করতে বারণ, মহারাজার হুকুম নেই,—বলে সে তাদের ভাগাবার চেষ্টা করলে। অনাথও যেন নিরাশ হয়ে পড়লো,—ভাঙ্গা গলায় সে বড় কাতব হয়েই বললে,—তিনি কি দয়া করে যাবেন একবার, আমাদের বড়ই বিপদ,—এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশী দূর নয়।

বোধ হয় অনাথের মুখের কথা তখনও শেষ হয় নি,—এমনই সময়ে, এক শ্যামবর্ণ নধর কান্তি, দীর্ঘ শরীর এক অদ্ভুত মূর্তি এসে দাঁড়ালো। কোমরে মাত্র একটা কৌপীন, আর কোনখানেই কিছু নেই তাঁর। যে লোকটি এদের সঙ্গে কথা কইছিল এতক্ষণ, সে

শশব্যস্ত হয়ে, জোড় হাতে বললে, বাবা, আপুনি নেমে এলেন কেনে ? বিশ্রামের ব্যাঘাত হল। চলুন উপরকে দিয়া আসি।

বাবার কানে তার কোন কথা গেল বলে তো বোধ হল না, কারণ তিনি অনাথের সামনে এসে, তার একখানি হাত ধরে, বললেন,—চলো বাবা, তুমাদের ঘরকে যাই। আর কোন কথা নয় একেবারে রাস্তার উপরে এসে গেলেন।

বন্ধু দুজনেই অবাক ;—দেখতে দেখতে দু-তিনজন উপর থেকে তর তর করে নেবে এসে বাবার কাছে দাঁড়ালো তারা একা বাবাকে ছাড়বে না—সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে চায়। দেখে বাবা বললেন,—কোনো শালা আমার সঙ্গে আসবে নি, খবরদার, আমি আপুনি যাব আপুনিই আসবো যেঁয়ে।

সাধুর কাছে এসেচে, এ কী রকমের সাধু ;—এই অদ্ভুত মূর্তির স্পর্শে অনাথ স্তম্ভিত,—তার নিজের ইচ্ছা বা কর্মপ্রবৃত্তি আর রইল না। বাবা চলতে লাগলেন—যেন তিনিই অনাথকে ধরে নিয়ে যাচ্চেন। থপ্ থপ্ করে চলতে লাগলেন বাবা।

পালকিতে যান বাবা ; না হলে রাজাবাবু রাগবেন যে ! বোলে একজন বাবার গায়ে একখানা চাদর ছড়িয়ে দিলে তাতে বাবার আপত্তি হোলো না ; পালকীর কথায় বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন, উ আমার ভাল লাগে নি। খাঁচার পারা, উয়ার মধ্যে বসতে সুখ নাই যে গো। আমি বেশ হেঁটেই যাবো গা এদের সাথে। যা, যা, তুরা আর জ্বালাস না।

তবুও দুজন দারবান, আর পালকি কাঁধে বেয়ারা পিছনে পিছনে আসতে লাগলো। বাবা আর ফিরেও দেখলেন না।

একজন পিছনে বলে উঠলো ;—রাজবাড়ি থেকে যদি ডাকতে কি নিয়ে যেতে আসে ?

বাবা সেদিকে না ফিরে বললেন, না, না, না, এখন আসবে কেন

দিতে,—যদি আসে, সে আমি বুঝবো যেঁয়ে। বাবার গতিক দেখে তারা আর কেউ এলো না।

পথে যেতে যেতে বাবা অবাক বিস্ময়ে বাড়ি, ঘর, দোকান পসারী, গাড়ী ঘোড়া পালকি দেখতে দেখতে চলেচেন, আনন্দ উপচে পড়চে যেন তাঁর মুখেচোখে; জোড়াসাকোর মোড় বরাবর এসে ওরে ও ছেল্যা, দেখ দেখ, হোই যে গো, বাবু মনিষগুলো সবাই ছুটেছে যেনে পাগল হইচে—এই শালা কলকাতা সহর; পথ লয় যেন রাজ্য। হাঁটবো কোথাকে, যত গাড়ি তত বাড়ি, আর যত বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা, ধাঁচা একই পারা; যেন গোলকধাঁধা বটে গো। কুথা যাব, চেনাই যায় না। অনাথের হাতটি ঠিক ধরা আছে।

চলতে চলতে অনাথকে লক্ষ্য করে যেন আপন মনে আবার বলছেন, এইজন্য বাবুরা যেন আগুলে রেখেছে বটে। আমায় হাঁটতে দিবে না, পালকি রেখেচে, বলে যেথাকে যাবে উয়ার ভিতরে বসেই যাও;—কেনে? আমু কি মেয়্যা,—আমার কি হইচে কি?— এমন সহর পানে এসে হাঁটবু নাই—দেখবু নাই? কি করতে এলাম হেথা;– মা, তারা—

বাবা যখন অনাথদের বাড়িব দরজায় এসে পেঁছিলেন তখন দু-চারজন লোক সেথায় জটলা করচে, একখানা খাটও এনে রাখা হয়েচে। বাবাকে নিয়ে তাডাতাড়ি অনাথ একেবারে উপরে উঠে এলো। বাবার মুখে কোন শব্দই সেই। ঘরে অনাথের বাবা আর দুই তিনজন আছে। অনাথ যেন টেনে নিয়ে এলো ঐ অদ্ভুত সাধুকে খাটের কাছে—যেখানে দাদার প্রাণহীন দেহ, আর জননী তার বুকের উপরে মাথা রেখে পড়ে আছেন অচৈতন্য হয়ে।

সবাই স্থির, নিস্তব্ধ ঘরের হাওয়া, তার মধ্যে দেখা গেল, কেবল পিতার চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। যেন কেমন হয়ে গিয়েচেন এই

দুর্যোগেব মধ্যে। ক্ষ্যাপা বাবা খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছুই-একবার চক্ষু বুলিয়ে দেখে নিলেন। ত্যবপর, 'তারা'। বলে এমনই একটা হুঙ্কার ছাড়লেন যে, উদারা মুদারা তারা তিন গ্রাম জুড়ে সেই শব্দ চতুর্দিকের ব্যোমে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, সবাইকে চমকে দিয়ে—এমন কি অনাথের মনে হল যেন সোমনাথের প্রাণ-হীন দেহখানিও নড়ে উঠলো। ঐ ভয়ঙ্কর তারা রবে মা-ও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন,—সামনে প্রায় উলঙ্গ ভৈরব মূর্তি দেখে অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে চেয়ে রইলেন।

কে তুমি বাবা?—আমার সোমনাথকে,—ঐটুকু কথা—তারপর স্বরভঙ্গ হল, - শূন্য দৃষ্টি উন্মাদিনী মূর্তি। ছেলের মাথাটি তখনও কোলে আব তারা ঠাণ্ডা মাথার উপরে ডান হাতখানি রাখা।

অনাথের দিকে চেয়ে ক্ষ্যাপাবাবা বললেন,—হাঁবে ও ছেল্যা, আমায় আনলি কেনে, কি হয়েছে হেথাকে?

লোকটা পাগল না কি, বলে কি হয়েছে হেথায়। অনাথ মুখে বললে, দেখছেন না কি হয়েছে, দাদার অবস্থা?

এবাব ক্ষ্যাপা যেন একটু ধমকে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদার হইচে কি, ও তো মাযেব কোল পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্চে গো! দেখচিস না! তুব কি চক্ষু নাই।

অনাথ তখন একটু উষ্মার সঙ্গে বললো, ওটা ঘুম! কি বকম ঘুম দেখচেন না?—কথা তার শেষ হল না, চেয়ে দেখে চমৎকার ব্যাপার —দাদার মুখে আর মরণের পাংশুবর্ণের আভাস মাত্র নেই। ক্ষ্যাপা বলেই চলেছেন,—যা, যা, তু দেখ গা যা, আমার দেখা আছে—ইত্যাদি।

এখন অনাথ দেখলে দাদার পেট ও বুকের উপর যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা। সাধুবাবা বলচেন,—হাঁরে বোকা ছেল্যা, মায়ের কোল থেকে ছেল্যাকে যমে লেয়,—সাধ্য কি! তারপর

সোমনাথের দাড়িতে হাতটি দিয়ে, দেখ তো গোপাল, একবার চেয়ে দেখ মায়ের পানে।

সোমনাথের চক্ষু উন্মীলিত হল,—প্রথমেই ক্ষ্যাপাবাবার মুখের উপর পড়লো দৃষ্টি, একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখে ও মুখে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষুতারা মাথা ঘুরিয়ে মায়ের মুখের উপর গেল,—তারপর ক্ষ্যাপাবাবার প্রসন্ন মুখখানির দিকে দেখতে দেখতে তার হাত দুখানি উঠলো কপালের উপর, প্রণামান্তে মুখে উচ্চারিত হল, মা। - মা।

শুনে আনন্দে বাবার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—হাঁ, মায়েরই দয়া বাবা, তু খুব সাবাস ছেল্যা বটে। যেমন বাপ, তেমন মা, তেমনি ভাই, তেমনি তু দাদা; না হলে মায়ের এত দয়া হবেক কেনে?

এই অল্পক্ষণে এই ব্যাপার ঘটে গেল। তখনও সবাই স্তম্ভিত, একটা ভাবে আচ্ছন্ন রয়েছে ঘরখানা।

ঘরের মধ্যে সবার উপরই ক্ষ্যাপাবাবার প্রভাব সত্ত্বেও চক্রবর্তী মশাই প্রথম তা থেকে কতকটা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্ম-শক্তির ব্যবহারে অক্ষম হয়েছিলেন। ক্ষ্যাপাবাবা যাবার জন্য দ্বার-মুখী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এগিয়ে এসে বাবার পা দুটি দু হাতে জড়িয়ে মাথাটি তার উপর রাখলেন।

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন—তু শালাদের ঐ তো দোষ, পায়ের উপর মাথা রাখা কেনে, মাথায় যে মায়ের বাসা,—এত বয়স হল, বুড়া হতে চল্লি, এটা বুঝিস নাই এখনও, কবে আর বুঝবি তু।। যা যা, আপন কাজকে যা—।

এইবার খপ করে অনাথের একখানি হাত ধরে নিজ হাতে নিলেন,—চল বাবা, যাই সেথাকে, তারা ভাবচে, লয়?—বলে, কোথা গেল মনিষটা ছোড়াদের সাথে! এখন মায়ের মুখেও ভাষা

ফুটলো,—কে বাবা, মানুষের রূপ ধরে আমাদের ঘরে এলে? ভগবান না হলে প্রাণদান কে দেবে বাবা,—এত দয়া কি মানুষের হয়?

ক্ষ্যাপাবাবা যাবার জন্য দরজার দিকে যাচ্ছিলেন, মায়ের মুখের কথা শুনে আবার খানিকটা ফিরে এসে বললেন, এ সকলই ঐ তারা মায়ের খেলা, এটা বুঝ নাই জননী, জয় দাও মায়ের নামে। তার পরেই আবার সেই তাণ্ডব ধ্বনি, তারা,—সেই ধ্বনিতেই দিগ্‌মণ্ডল ভরে গেল। সবারই প্রাণে প্রাণে পুলক,—অন্তরের সকল তন্ত্রী বেজে উঠলো। অল্পক্ষণের জন্যই স্থির, নিশ্চল মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা—তারপর স্নেহভরে অনাথের দাড়িটি স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমার নামটি কি মাণিক?

অনাথবন্ধু! শুনেই ক্ষ্যাপাবাবা যেন আনন্দে নেচে উঠলেন। সাবাস ছেল্যা—তুমি আমারও বন্ধু গো; এখন চলো তো স্যাঙাৎ—সেথাকে যাই ব'লে তার হাতখানি ধরলেন এবং বাইরের দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

পথে বললেন, ওগো বন্ধু,—দাদাকে লিয়ে, বাবা-মাকে লিয়ে একবার আমাদের তারাপীঠে যাবে, দেখে আসবে শ্মশানের উপর মায়ের মন্দির,—মা আছেন সেথা;—তারা মা গো! বীরভূমে তারাপীঠ, শুন নাই? সবাই জানে। পূজা দিতে যায়, মহাপীঠস্থান যে।

যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মন আলোড়িত, সেখানে মানুষ-সমাজে এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, যা বুদ্ধি যুক্তির সাহায্যে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধেই যোগটা ঠিকই ঘটে, মানুষ সেটা বিশ্বাস করুক, না করুক। তাঁর অনেক রকমের খেলা থাকে। এখানকার সকল বিষয়ে, মানুষের মত কিছু ক্রিয়া, সৎ-অসৎ কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সকল বিষয়েই আমাদের বিধাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। এই সত্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন তাঁরাই

বলেন,—কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর খেলা যেন চমৎকার নাটকের মতই স্বচ্ছ,—এবং স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়। তবে এটা ঠিক,—তা সকলকারই হয় না। হয় সেই ভাগ্যবানের, যাঁর অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস নামক মহান বস্তুটি জন্মেছে অথবা পরমেশ্বরের এই সৃষ্টির কারণতত্ত্বের দিকে মন বুদ্ধি প্রায় সব সময়েই লেগে আছে; তাই হয়ে আছে তার জীবনে প্রধান ভোগ বা বিলাসের বস্তু। ঐ সব খেলা এমনই অদ্ভূত, যুক্তি তর্কের বহির্ভূত ব্যাপার; সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্যই থেকে যায়। তবুও তা ঘটে, পূর্বকালে ঘটেছে অনেক, বর্তমানেও যা ঘটেছে, তাও অনেক; ভবিষ্যতেও যা ঘটবে, তাও কম হবেনা। কারণ ততদিনে জীব—বিশেষ মহান মানবজাতি, তাঁর অনেক কাছেই এসে যাবে। অন্ততঃ এখন যতটা দেখা যাচ্ছে, তার তুলনায় অনেক নিকটই হয়ে পড়বে, তাঁরই ইচ্ছায় অবশ্য।



অনেক মহাত্মাব কথা শুনি যাঁরা প্রচুব ভোগ ও ধনাগমেব উদ্দেশ্য ছেড়ে এমনই একটি পথে জীবনধাবা বইয়েছেন যাব ফলে তাঁদেব পার্থিব জীবনেব ভোগবিলাসেব সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। পার্থিব উন্নতিব সকল সূত্রই হারিয়ে এমনই একটি উদ্দেশ্যে আত্ম-নিযোগ ক'বেছেন, যাব ফল ইচ্ছামাত্র কাকেও দেওয়া যাবে না, পার্থিব সম্পদের মতো কাকেও দান-বিক্রয়ের অধিকাবী কব'তে পাববেন না। সে পথ নিজেব জন্যই—একমাত্র নিজেকে নিয়েই চলতে হবে সে পথে, অপবেব সঙ্গে আদান-প্রদানের বিষয় নয়। ধর্মপথে নানা ভাবে বৈচিত্র আছে, সিদ্ধি আছে, আজ তাবই একটির কথা বলছি।

একবার পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে—ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফবিদপুব, বরিশাল, খুলনা, রংপুব অঞ্চল ঘুরে আসামেব দিকেই চললাম। কামরূপ হ'য়ে কামাক্ষা দর্শনের পব গৌহাটিব দিকেই চলেছি। পথেই খবর পেলাম, এখানে মাঝপথে ব্রহ্মপুত্রের উপরেই একজন কাপালিক আছেন, কম লোকেই জানে। কাকেও স্থান বা আমলই দেন না। কেউ তাঁব আশ্রমে যেতে এবং থাকতেই পারে না। তিনি নাকি অতি ভয়ঙ্কর লোক। ভূতপ্রেত নিয়ে কাজ করেন, সঙ্গে তাঁর ভৈরবী এক অপ্সরা আছেন। তিনিও কোথাও যান না, কারো সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না।

একজন হিত উপদেশ দিলেন, বাবা, যাবেন না তার কাছে, সে

পিশাচসিদ্ধ কাপালিক, যে যায় সে ওখান থেকে আর ফিরে আসে না।

কতকটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় তাঁর আশ্রমে। আমার মধ্যে কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব আকর্ষণ, তার আসল ভাব একটা কৌতূহল মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল, তাইতে আমায় বড় দ্রুত নিয়ে চলেছিল সেই বনপথে—সেই মানুষটিকে দেখবার আগ্রহে। মনের মধ্যে তার একটা রূপের কল্পনাও ক'রে চলেছি। পথে যেতে যেতে এক গৃহস্থজনের কাছেই বেশ ভালো ক'রে জেনে শুনে জায়গাটা কোথায় তা ঠিক করে নিয়েছিলাম। সারা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে,—শেষে বৈকাল নাগাদ গিয়ে উঠিলাম আশ্রমে।

তিন-চারটি ধাপ উঠে বারান্দা। বিসদৃশ মোটা কাঠের রলা, তার উপরে ছাদ। সামনেই দুখানি ঘর, তার জানালা দেখা গেল, কিন্তু দরজা বিপরীত দিকে। সেই বারান্দা ঘুরে গিয়ে দেখা গেল ঐ বারান্দা ঘরের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পাশেই খানিকটা প্রাঙ্গণ, কিছু কিছু গাছপালাও আছে তার মধ্যে।

হঠাৎ দেখি, সেইখানেই একটা গাছের কাছেই যেন বনদেবীর মতই একটি অপূর্ব নারীমূর্তি। ঐ গাছের ডালে একটা কাপড়ের খুঁট বাঁধছিলেন কিম্বা গাঁট খুলছিলেন। যেমন এই কামরূপ-অঞ্চলের ভদ্র গৃহস্থঘরের বৌ-ঝি হয় ঠিক সেই রকমই দেখতে। গৌরবর্ণ, কপালে জ্বলজ্বল ক'রছে সিন্দুরের ফোঁটা। তাঁর কাপড়ও লাল। অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি। যেন তুলির রেখা ভ্রূ, তার নীচে উজ্জ্বল অথচ কমনীয় নীলাভাময় দুই চক্ষু। মনে হ'লো, এই কি অপ্সরা—নাকি? দেখামাত্রই আমাকে যেন চমকে দিলে, সেটা তিনিও লক্ষ্য করলেন। আমি জোড় হাতে নমস্কার ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এইখানেই কি কৌল বগলা বাবা থাকেন?

কোন কথা না ব'লে তিনি একটু মুচকে হেসেই দাওয়া, অর্থাৎ বারান্দায় উঠে এসে হন হন ক'রে কোণের দিকে একটা ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন।



ভাবলাম একি হ'লো, কোন অপরাধ ক'রে বসলাম নাকি।

দেখতে দেখতে এক দীর্ঘ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ মূর্তি, হাতে একখানা রাম দা, অত্যন্ত দ্রুতপদে একেবারে আমার সামনে এসে এমন ভাবে তাকালেন, যেন এক কোপেই আমায় সাবাড় ক'রে দেবেন। আমি স্তম্ভিত, বেশ ভয়ও ছিলো তার মধ্যে তিনি তাই দেখেই বোধ হয় বেগ সংবরণ করলেন। রক্তবর্ণ চক্ষু যেন ক্রোধে বিস্ফারিত, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ ক'রে বললেন,—কে তুই, এখানে কি চাস?

আমি তখন স্তম্ভিত। ঠিক যেন কালান্তক যমকেই সামনে দেখছিলাম। অমন একটি স্বর্গের লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখবার পরেই ভয়ঙ্কর কালো, রোগা, অতিদীর্ঘ, কুশ্রী মূর্তি দেখে, হঠাৎ তার সঙ্গে রামদা, তারপর কর্কশ কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন শুনে যন্ত্রবৎ আমি ধাপের উপর বসে পড়লাম। এমন অবস্থায় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেলো। ঐ নারীমূর্তি ঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন, একখানা চেটাইয়ের আসন হাতে। সোজা এসে সেখানি আমার সামনে পেতে দিয়ে বললেন, - বসুন, বাবা।



ব্যাস্—অভিনয় এই পর্যন্তই, —যম তখনই সেই অস্ত্রপাণি অবস্থায় সোজা গিয়ে প্রবেশ ক'রলেন—যে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলেন সেই ঘরে। আর তখনি নেশা কাটলে যেমন মানুষের সহজ অবস্থাটি আসে, সেইভাবেই আমিও প্রকৃতিস্থ হলাম। অতঃপর প্রণাম ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মা, এ কি ব্যাপার? মা বললেন,—একজন বাইরে থেকে এলে প্রথমে এই রকমই হয়। উনি ঐ খাঁড়া হাতে যেই ঘর থেকে বার হন, অমনি তারা ছুটে পালায়, আর উনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন। আজ তা হ'লো না। বোধ হয়, মায়ের কৃপা আছে আপনার উপর, না হয়, আপনি শক্তির সাধক। যাই হোক বাবা, আর কোন ভয় নেয়, বসুন, যখন বাইরে আসবেন কথাবার্তা হবে। এঁর খেলাই এই রকম।

মনে বুঝলাম, মা জগদম্বাই এই মূর্তিতে আজ আমায় কৃপা ক'রলেন।

পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় গিয়েছি। আমার ভাগ্যে কেবল ফরিদপুরের জগৎপ্রভু মহাত্মাকেই দেখেছি, আর এখানে এই কৌল বাবা ব্যতীত সাধু বা যথার্থ সিদ্ধ পুরুষ দর্শন হয়নি।

কি অদ্ভুত নির্জনতা,—চেটাই আসনে বসে বসেই কাল হরণ ক'রছিলাম। হঠাৎ মা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কতদূর থেকে আসা হচ্ছে, দেশ কোথা, কি করি, এখানে কেন এসেছি—এই সব। প্রশ্নের সব উত্তরগুলি আদায় করার পর, কিছু খাবো কি না জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ক'রেই বললেন, বাবা, খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতাম না—একেবারে এনেই হাজির ক'রতাম, কিন্তু অপরাহ্ণ, আর তুমি সাধক কি না, তাই আসনে বসবার আগে কিছু খাবে কি না একটু সন্দেহ ছিলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম। এমন সুন্দর, এত মধুর জবাবদিহি কোথাও শুনিনি। যে কাণ্ডটা ঘটে গেল এরপর এখন খাওয়ার কথা মনেই ওঠেনি। যাই হোক, এখন মা নিয়ে এলেন একখানি কোমল কাঁথার আসন, দিয়ে বললেন, ওর উপর পেতে নাও, সুবিধে হবে। বুঝছিলেন, দীর্ঘকাল বসবার উপযোগী আসন এটা নয়, তাই এই অনুগ্রহ।

একটু দূরেই প্রথমে লম্বা এক চাটাই, তার উপরে একখানি সতরঞ্চ, তার উপর পুরু একখানি গালিচা, তার উপর একখানি গুলবাঘের ছাল পেতে দিলেন, সামনে একখানি খুব নীচু কাঠের চৌকি। অল্পক্ষণ পরেই এলেন দিগম্বর বগলা বাবা। এখন দেখলাম সৌম্য মূর্তি তবে চক্ষু লাল,—গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা,—হাতের বাজুতেও রুদ্রাক্ষ এবং প্রবাল, নীল, লাল পাথরের মালা জড়ানো। এসে বসলেন, এখন লক্ষ্য ক'রে দেখলাম,

ইনি একটু ট্যারা। ট্যারাকে আমার বড়ই ভয়, এটা সংস্কারগত। আমার সঙ্গে আর এখন কোন কথাই কইলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, মা প্রথমে দুটি ডিজ্ হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে, একটি ওখানে রেখে অপরটি নিয়ে গেলেন সঙ্গে। তারপব মদের ছোট বোতল এলো। পাথরের রেকাবে খাদ্য মৎস্য, মাংস, মুদ্রাদি উপকরণ এলো সেই চৌকির উপর। জল এলো, আর যা কিছু সবই এলো। এ সব দেখে আমার অন্তর বিস্বাদে ভরে উঠলো। বুঝলাম এবার পঞ্চ ম-কারের পালা আরম্ভ হবে, আর নির্লজ্জভাবে চলবে পশ্বাচারের কাণ্ড। মনের অজ্ঞাতেই আমি উঠে পড়লাম, অন্তরের কথা এই যে, যদি এখনও বেরিয়ে হাঁটতে থাকি, তা হ'লে অন্ধকার হবার আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। তারপর রাজপথে গৌহাটিতে পৌঁছাতে কতই বা রাত হবে। বাবা জপে বসছেন, এই উপযুক্ত অবসর।

আমায় উঠতে দেখেই বিকৃতাক্ষ,—কটাক্ষপাত করে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, উঠছো কোথা, এখনই যে চক্র আরম্ভ হবে। সর্বনাশ—উপায়? মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো, বললাম, এই যে একটু বাইরে থেকেই আসছি, আপনি বসুন না।

আরে এখানে বাইরে কোথা যাবে,—কেউটে, খরিস, গোখরোর রাজ্য,—কলকাতা পেয়েছো নাকি? এ সন্ধ্যায় আর বার হওয়া হবে না। মুখ হাত ধোবে তো যাও, জায়গা আছে; ব'লে ডাকলেন, মা। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আসা, অঙ্গনের এক প্রান্তে খানিকটা পাথর বাঁধা জায়গা দেখালেন, আগে আগে মা ছিলেন পিছনে আমি দাঁড়িয়েছি। মা, অত্যন্ত নীচু গলায়, যেন কানে কানেই বললেন, এঁর বাইরেটা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যেওনা বাবা, এসেছো যখন একটা রাতই থাকো। এখানে কোন অভাবই হবে না, কথাটা আমার শুনো, তোমার ভালোই হবে।

উত্তরে আমি বললাম, আমি তো তন্ত্রমার্গের লোক নই, এ পথে আমার সাধনা নয়।

বাধা দিয়ে মা যা বললেন, সেটা হুকুম বা আজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তিনি বললেন, জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পেয়েছ, এখানে আপন আসনে বসে ইষ্টমন্ত্র জপে বাধা কি? বাইরে যাই হোক না কেন, তাতে তোমার কি? শুনে এবার প্রাণ সহজ হয়ে গেল। সাক্ষাৎ মা জগদম্বারই আদেশ যেন;—কৃতার্থ হ'লাম।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে এসে বসা। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই শেয়াল ডেকে উঠলো। উনি জপেই ছিলেন। সব কিছু কাজ সেরে মা-ও এসে পাশে বসেই জপ আরম্ভ ক'রলেন; আর কেউ আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না। আমিও স্থানমাহাত্ম্য অনুভব ক'রলাম, আর নিজ মন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত রইলাম। এইভাবে কতক্ষণ গেল। প্রায় এক ঘণ্টা স্থির। সন্ধ্যার পর, রাত্রি যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাবা তখন জপ শেষ ক'রে মাকে বললেন, এইবার এসো, পাত্রটা দাও। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এখন দেখো, আমরা খাই, তুমি শেষে কেবল খাবারটা খাবে—তখন আমরা দেখবো, কেমন?

বললাম, সেই কথাই ভালো।

একটি ছোট কালো পাথর বাটি, তাতে এক কাঁচ্চা ধরে। তাইতে কারণ ঢেলে দিলেন মা। এই রকম তিন পাত্র পানের পর মা ঐ বাটির তলা থেকে এক আঙ্গুলে (তর্জনীতে) নিয়ে ফোঁটা দিলেন আপন কপালে। আমায় বললেন, সরে এসো বাবা, ফোঁটা নাও, অবজ্ঞা ক'রতে নেই, পূজার সামগ্রী যে, সবই দেবীর প্রসাদ হয়ে আছে। আমি নিঃসঙ্কোচে তাই ক'রলাম। তারপর মৎস্যপাত্র থেকে বেশ বড় তিন-চার টুকরা, তাই থেকে কৌল বাবা একটি নিলেন, আমায় একটি দিলেন, মা একটি নিলেন, শিবা

ভোগের জন্য একটা রইলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ঘিয়ে ভাজা রুটির মতো, আলাদা পাত্রে নিজ নিজ অংশে কয়খানা ক'রে তুলে



আশ্রমের পথে

নেওয়া হ'লো। তারপর মাংস। তাও ঐ রুটির সঙ্গে তিন-চার

টুকরা খাওয়া হ'লো। যা খাওয়া হ'লো তাতে পেট ভরা মোটেই হ'লো না। অথচ ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লো চমৎকার।

এরপর বিকৃত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে ভৈরব ব'ললেন,—দেখতে এসেছো যখন—তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারের, মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা—এই চারটির কাজ হ'লো, তোমারও দেখা হ'লো। এখন বাকীটা দেখবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বললাম, ও জিনিস তো দেখবার নয়, দেখবার প্রবৃত্তিও নেই, আমি সরে যাচ্ছি।

বাবা—নিজেদের ওকাজ সবাই দেখে জানি, অপরের দেখেচ কথনও?

আমি—দেখবো কি, ঐ জঘন্য, হেয় কর্ম কি দেখবার? ওতে দেখবার কি আছে?

বাবা—আছে, আছে, ওরও প্রয়োজন আছে। যার সংযমব্রত আছে, তার একটা পরীক্ষা নেই? পরন্তু মৈথুনের দ্রষ্টা হওয়াতেই তো তার সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া জানো তো, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তা থেকে মুক্ত না হ'লে সিদ্ধি কোথায়? পরে তিনি বললেন, আচ্ছা, বাবা! বলতো, ওটাকে হেয় জঘন্য বললে কেন?

আমি—জানোয়ার পশুদেরই তো ঐ কাজ, মানুষের মধ্যে ওর কোনো গৌরব আছে নাকি?

তিনি হাসিমুখে বললেন—এইতো বাবা, বলতে পারলে না আসলে কেন ওটা হেয়।

আমি—আপনিও তো জানেন ওটা হেয়,—বলুন না আপনি, ওটা হেয় নয় কেন?

যদি বলি, আমরা ওটা ধর্মাঙ্গ বলেই করি, তখন ও-কাজকে হেয় বা জঘন্য বলবার অধিকার আছে কি?

তা হ'লে বলবো, আপনারা পশু স্তর থেকে কিছুটাও উন্নত হন

নি, যথার্থ ধর্ম বা সত্যকে ধরতেই পারেন নি। শুনে কৌল বাবা তিলমাত্র বিরক্ত না হয়েই বললেন, তুমি তো আসল কথাটা বলতেই পারলে না; এখন মা বুঝিয়ে দেবেন কেন ও'টা হেয়, বলেই মায়েব দিকে লক্ষ্য ক'রলেন। মা সবই শুনছিলেন. এখন মধুর কণ্ঠে প্রশান্ত একটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে যা বললেন,—মুগ্ধ হয়েই তা শুনতে রইলাম।

ও কাজটা কামমূলক, সৃষ্টি আর সম্ভোগের কামনায় ওর উৎপত্তি, সেই জন্যই হেয়। ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কি আছে ওতে? ওটা শরীরের ভার, রক্তেব বোঝা,—নেমে গেলেই আরাম। দীর্ঘকাল অপেক্ষাব পর, মল মূত্র ত্যাগেও একপ্রকাব সুখ হয়। শরীরধর্মেই ওটা হয়, ওতে শরীরেব স্ফুর্তি আছে কিন্তু আনন্দ কোথা? একমাত্র যাদেব মধ্যে প্রেম ঘনীভূত, তাদেবই ওসব হেয় মনে হয়। কাবণ তারা জানে ওটা কাম মাত্র,—যথার্থ প্রেম-প্রীতির হন্তা। ওটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ প্রেম তাব মধ্যে স্থান পায় না, পেতে পারে না। বুঝেছো বাবা? তবে জগদম্বা তাঁর জীব সৃষ্টির ধাবা বজায় রাখবার জন্য প্রত্যেক কামপূর্ণ ঘটের মধ্যে একবিন্দু প্রেম মিশিয়ে দিয়েছেন—তাই যৌবনের কালে সংসারমুখী স্ত্রী পুরুষের মিলনটা যেন প্রেমেরই সম্পর্ক ব'লেই মনে হয়। যেমন, এক গামলা জলে এক ফোঁটা পুষ্পসার মিশিয়ে দিলে সারা জলটাই অল্পক্ষণের জন্য গন্ধে ভরে যায়, ব্যবহারে শরীর সৌরভময় হয়ে ওঠে। এ সংসারে ঐ একবিন্দু প্রেমের মহিমাই এমনি যে নরনারীর কামময় অস্তিত্ব, যৌবনের রঙে আগাগোড়াই প্রেমপূর্ণই মনে হয়। আসলে সৃষ্টির প্রবৃত্তি সতেজ রাখতেই স্রষ্টার এই কৌশল।

আমি যেন আপন মনেই বলছিলাম, প্রেমের মহিমার কথা শুনেছি সত্য, কিন্তু দুইয়ের মোদ্দা কথাটা একই তো মনে হয়। তৎক্ষণাৎ মা বললেন, তা কেমন ক'রে হবে, ও দুটো বিপরীতধর্মী

যে বিশুদ্ধ প্রেমে দুই একাঙ্গ হয়ে যায় যে, আর কামে দুই দুইই থাকে, সম্ভোগের ফলে ক্ষণেকের জন্য এক বোধ হ'লেও শরীর মন পৃথকই থাকে। শুদ্ধ প্রেমের ছিটে-ফোঁটায়ও সিন্ধু প্রমাণ রস সৃষ্টি করে। কাম যেখানে, কেবলই সংঘর্ষ, ঐ সংঘর্ষই কামের সার কথা। আমি মুগ্ধ হয়েই শুনছিলাম, মা, যেই কথা বন্ধ ক'রে স্থির হ'লেন, বাবা অমনি আরম্ভ ক'রলেন,—বুঝলে কিছু ? আর বুঝবেই বা কি, এতে বুঝবার আছেই বা কি ? দুই থাকতে কিছু হচ্ছে না,—বাবা। শুনে আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো, আপনার তো সিদ্ধাবস্থা শুনেছি, আপনাদেরও মৈথুন চলে নাকি স্ত্রী-পুরুষের।

শুনেই তিনি বললেন, মৈথুন পরম তত্ত্ব, এ সাধনের শেষ, তখন দুই মিলে এক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, জানি, ওটা শোনা কথা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে আছে পড়েছি, কিন্তু কখনও দেখিনি।

হয়তো তাই দেখতেই এসেছো,—বলে বাবা আবার বললেন, তুমি তো ওটা দেখতেই চাও না ; হেয় ব'লে সরেই যাচ্ছিলে।

আমি ভাবছিলাম, ঐ কালো কুৎসিৎ রোগা মানুষটিকে দেখে ভক্তি দূরে পালায়, ঐ মানুষ কি সিদ্ধ যোগী হ'তে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রলেন, পরে বললেন, এখনও রূপ আঁকড়ে আছো বাবা, ঐ স্থূল বুদ্ধিতে সিদ্ধ অসিদ্ধ বুঝবে কি ক'রে ?

একখানি চাবুক যেন পিঠে এসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই বাকরোধ।

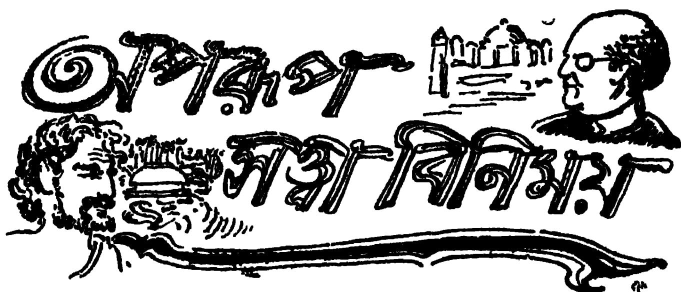
কৌল বাবা বললেন, দুই প্রহর হ'লো, এখন আসনে বসতে হবে। যদি দেখতে চাও তো আপন আসনে ব'সেই দেখ। আমাদের অবস্থান্তর দেখলে ভয় পেয়োনা বা উঠে পড়োনা যেন। এমন সময় পাশে কাছেই একদল শেয়াল ডেকে উঠলো, হুকা হুয়া।

মনে প্রবল আলোড়ন নিয়েই বসে আছি। নিম্নদৃষ্টি। এখানে শুনেছিলাম শেয়ালেরাই প্রহর জানিয়ে দেয়।

বাবা তো উলঙ্গই ছিলেন, এবার মা বস্ত্রত্যাগ ক'রে উঠে বসলেন কৌলবাবার কোলে, কিন্তু দুজনেই মুখোমুখী আর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে,—দুজনেই দুজনের চক্ষে চক্ষে, দেখলাম এইমাত্র, তারপর আমার শরীর আপন আসনের গুণেই স্থির হয়ে এলো। এমন দৃঢ় সংযম আমার ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। অল্পক্ষণেই কে যেন কানে কানে বলে দিলে, এইবার দেখো! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো; আমি সামনে চেয়ে দেখলাম, শূন্য ঐ আসনে কোন মূর্তিই নেই। আলোটা যথাস্থানে ঠিকই জ্বলছিল। প্রভাত পর্যন্তই নিস্পন্দ বসেছিলাম।

এই মহাশক্তির ক্ষেত্রে পরদিন আমার থাকবার সাধ্যই রইলো না—যখন চলে আসি, প্রসন্নমুখে মা বললেন, আর থাকতে পারলেনা বাবা!

বললাম, মা, আমার জন্মজীবন সার্থক, মনে হচ্ছে সবই পেয়েছি। কিন্তু মা, আসন শূন্য দেখলাম কেন? মিলনের এক মূর্তি তো দেখতে পেলাম না। মা বললেন,—আমরা কালের মধ্যেই তো ছিলাম দুই হয়ে, যখন এক হলাম, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তো রইলো না, মিলবার সময় ক্ষণেক দেখা যায়, তারপর আর দেখা শুনার বাইরে। তোমার জন্যই কাল ওটা হয়েছিল। যাও বাবা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। যা দেখলে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রচার ক'রে বেড়িও না, তোমার ভালো হবে।



লোকটা শেষকালে আমাকে এমন কল্পনার অতীত একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারবে এ ধারণা কোন সময়েই ছিল না। হয়তো সে ব্যক্তি এর জন্যে দায়ী নয়,—হয়তো বিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে গিয়েছে,—হয়তো বা আমারই গলদ বা অপরাধের ফল হিসেবেই এটা হয়েছে। তা সে যাই হোক, যার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটাব ফলে আমার এই অবস্থার উদ্ভব; মনে হয় তার সবল নিরীহ প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু ঢাকা ছিল যার স্বরূপ কোন প্রকার ব্যবহারের ফাঁকেও আমাব লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়নি।

আমাদের মত উচ্চপদস্থ মোটা মাইনের ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ-সরকাবের গেজেটেড অফিসার; সোপার্জিত পদগৌরবের উপর সচ্ছলতা, উপরন্তু বিলাসের নেশায় মশগুল, সর্বক্ষণই নিজ নিজ সৌভাগ্যে সচেতন যারা, তাদের যতই জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তিই থাকুক না কেন. এইভাবের একটি লোকের সম্বন্ধে ধারণা কতটা সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রমসঙ্কুল, আবার নিজ নিজ অন্তঃসারশূন্যতার ফলে কতটা বিকৃত হতে পারে, আজ ভালোমতে সবাইকে জানিয়ে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি।

সম্ভবত ১৯৩৮ সালের কথা। তখন ইম্পিরিয়্যাল দিল্লীর অফিসারদের বড় বড় গ্রেড্ থেকে লোয়ার কেরাণী পর্যন্ত সবাই মাসিক মাইনের অঙ্কের হিসাবে সমাজে ব্যবহারিক ছোট বড় সাব্যস্ত হতো অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ যিনি অধিক বেতনের অধিকারী,—তাঁর সঙ্গে নিম্নপদস্থ কারো সম্বন্ধ হ'ল—উপেক্ষার। অতি অদ্ভুত

সমাজ আমাদের। এমন অবস্থায় দেড় হাজারী ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে, আড়াই হাজারী আমার কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ক্ষীণ বন্ধুত্ব জন্মেছিল। তার কারণ ডাঃ গুপ্ত ছিলেন উচ্চ বিদ্যাধিকারী, তাঁর এডুকেশন কেরিয়ার অনেকেরই ঈর্ষ্যার বিষয় ছিল। সুতরাং দুজনেই দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ করে, হরিসভা, কালীবাড়ী, স্টুডেন্টস্ ক্লাব ইত্যাদি প্রায় সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম।

এই বৎসরের কালীপুজার সময়ে আমাদের মধ্যে একটা পরামর্শ এই হলো যে, নাচ, গান থিয়েটার যাত্রা বা বাজী পোড়ানোতে উৎসব সম্পূর্ণ না করে একটু ইণ্টেলেক্‌চুয়াল অথবা রিলিজিয়াস এনটারপ্রাইজের মত কিছু করলে বোধহয় ভালই হয়.--এইভাবেই কিছু আনন্দ ও জ্ঞানের অনুশীলন করা যাক। ডাঃ গুপ্ত বললেন— আমার এক বন্ধু আছেন আর্টিস্ট। তন্ত্র সম্বন্ধে সাধনার কথা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। আপনাদের সবার মত হলে তাঁর কাছ থেকে তন্ত্রধর্ম সম্বন্ধে কিছু শোনা যেতে পারে। সবাই সায় দিলেন: তার করে তাঁকে তলপ করা হলো এবং যথাকালে তিনি এসেও গেলেন।

ডাঃ গুপ্তর অতিথি হয়েই রইলেন এ কয়দিন।

নামটি তার দর্পনারায়ণ উপাধ্যায়। দেখতে একরকম সুশ্রী বলা যায়। বয়স তার দেখায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু যদি তার নিজমুখে না শুনতাম তাহলে বিশ্বাস হয় না যে দুবছর পরে তাকে ষাটের কোটায় পা দিতে হবে। যাই হোক, তার প্রথম দিল্লীতে আসা এবং দুদিন ধর্ম বা তন্ত্র সম্বন্ধে কথা শুনে, আলাপ পরিচয়ে শ্রদ্ধা একটু হয়েছিল, যেন একটু আকৃষ্টও হয়েছিলাম, কারণ চলে যাবার পরেও তার কথা মনে ছিল। আমার ঐ শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবটি বোধহয় চিরদিনই থাকতো, যদি সে ব্যক্তি আবার দিল্লীতে ফিরে না আসতো।

প্রায় তিনবৎসর পরে সে আবার দিল্লীতে এলো ডাঃ গুপ্তের আহ্বানে এবং এবারেও ডাঃ গুপ্তর গেষ্ট হয়েই রইলো। সরকারী দপ্তরের ক'খানা ছবি রিনোভেশানের কাজেই তিনি শিল্পীকে আনিয়েছিলেন। কাজটি মাস দেড়েকের মধ্যেই হয়ে গেল। তার পব ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কিছুদিন রয়ে গেল সে। মধ্যে মধ্যে দেখা-শুনা হতো,—কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ ভাবটি ছিল তার প্রকৃতি-গত। তার সঙ্গ আমাদের ভাল লাগতো, এ কথা সত্য।

ডাঃ গুপ্ত ছিলেন তার যথার্থ কল্যাণকামী বন্ধু। লোক'টার জন্যে তিনি ভাবতেন। তিনি চেয়েছিলেন লোকটি দিল্লীতে স্থায়ী-ভাবে বাস করে, তাহলে আমাদের কালচারাল এসোসিয়েসনটা বেশ জোরালো হয়। লোকটা ভারতের সবদিকেই, এমনকি তিব্বতেও ঘুরেছিল - তাইতেই তাকে ভ্রমণ-সাহিত্যে সুপরিচিত করেছে। তারপর সাধুসঙ্গ গ্রন্থ তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাছাড়া সুকণ্ঠ, সঙ্গীতেও তার অধিকার আছে।

তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব তখন পর্যন্ত ভালই ছিল। মাঝে মাঝে দেখা-শোনাও চলছিল। এই সময়েই একদিন ডাঃ গুপ্ত, একটু বিশেষভাবেই আমায় বললেন ;—দেখুন, লোকটি অনেক বড় শিল্পী, কাজও অনেক করেছেন, কিন্তু বর্তমানে কলকাতায় ভাল সুবিধা হচ্ছেনা, এখানে কিছুদিন থেকে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেখতে চান। ওব মত লোকেব পক্ষে এই জায়গাটাই ঠিক মনে হয়। আমাদের সকলকার যথাসাধ্য কিছু করাই উচিত।

যেইমাত্র কথাটি শুনলাম,—আশ্চর্য ব্যাপার, যেটুকু শ্রদ্ধা প্রীতি আমার মধ্যে ছিল সবটাই ম্লান হয়ে গেল ; এক বিপরীত ভাব, যেমন দরিদ্র ভদ্রলোকের উপর অবস্থাপন্ন দাতা একজনের হয়ে থাকে সেই ভাবই এসে গেল আমার মনে। অথচ বাইরে রইল এমন একটি ভাব, যাকে শ্রদ্ধা তো নয়ই, আবার ঠিক অশ্রদ্ধাও

বলা যায় না,—কেমন একটি কৃত্রিম ভাব। তারপর থেকে তার সঙ্গে দেখা হ'লে কেবল সামনের দাঁত কয়টা দেখিয়ে, আচ্ছা বোলে পাশ কাটানো ;—এই রকমই চলতে লাগলো।

॥ ২ ॥

কয়েকদিন পর, এমন একটি ব্যাপার ঘটলো তাইতেই আমার ভিতরটি একেবারে তিক্ত হয়ে উঠলো। ডাঃ গুপ্তের চতুর্থ কন্যা ক্লাস সেভেনে পড়ে, আর আমার মেয়ে মীরা এবার ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠবে। ডাঃ গুপ্তই প্রস্তাব করলেন যে আপনার আর আমার মেয়ে দুটিকে যদি চিত্রবিদ্যা শিক্ষার একটা সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে লোকটিকে বেশ একটু সাহায্য করা হয়। পঞ্চাশ টাকা হিসাবে দুজনের টুইশান্ ফি একশো টাকা,—মন্দ হবে না আরম্ভটা। মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখা গেল তাদেরও মত আছে। যাই হোক, এই কথাটি নিয়ে আমিই একটু মুরুব্বিআনা দেখিয়ে একদিন তার কাছে প্রস্তাব করলাম। তাকে বুঝিয়েও দিলাম যে তার উপকারার্থেই আমাদের এই প্রথম উদ্যম। শুনে লোকটি একটু যেন ভেবে নিলে, তার পর জিজ্ঞাসা করলে—যাঁদের শেখবার কথা, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?—তাদের ইচ্ছা—

ধমক দিয়ে বেশ মুরুব্বির মতই গরম মেজাজে বললাম, হাঁ হাঁ, কথা হয়েছে, তাদের ইচ্ছাও আছে।

আচ্ছা লোক যা হোক, বলে কি, আপনাদের অনুরোধেই হয়তো ইচ্ছা হয়ে থাকবে,—কিন্তু উৎসাহ দেখলেন কি ? এবার বিরক্তি দেখিয়েই বললাম—শিখতে শিখতে হয়তো উৎসাহ আসতে পারে,—আপনার চাই কিনা বলুন না। সে বলে,—দেখুন, আমি গোড়াতেই বুঝেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করতেই এটা ঘটাতে

চাইছেন। কিন্তু এমন কাজে হাত দিতে চাই না, যাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এতে সন্দেহের কথা আসছে কেন?—আমিই বললাম কথাটা।

যে পাত্রী দুই এক বৎসরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, অথচ পূর্বে কখনও একটি লাইনও টানেনি, একেবারেই নতুন, তাদের এই আঠারো কুড়ি বৎসর বয়সে লাইনটানা থেকে, যাকে বলে ষ্ট্রেট্-লাইন থেকে আরম্ভ করা—আমার মনে হয় এটা তাদের ভালই লাগবে না; আমারও পণ্ডশ্রম, মনের শান্তি ও শক্তি নষ্ট, আর, উভয় পক্ষেই অনর্থক সময় নষ্ট।

কীরকম ছাত্র বা ছাত্রী হলে আপনি শেখাবার ভার নেবেন?

যাদের আগে কিছুটা করা আছে, বেশ ঝোঁক আছে চিত্র-বিদ্যা শেখবার, খানিক লাইন প্র্যাকটিস আছে,—বুঝতেই তো পাচ্ছেন।

ব্যাস্, এইমাত্র কথা। এর পর আর তার উপর শ্রদ্ধা রাখা চলেনা,—একমাত্র উপেক্ষা ছাড়া তার উপর শ্রদ্ধার কিছু অবশিষ্ট রইলো না আমার। লোকটার কিন্তু মনে তিলমাত্র দাগ কাটলোনা এ ব্যাপার নিয়ে। যথার্থ তারই উপকারের জন্য আমরা একটা উপার্জনের সূত্র বার করে তাকে আহ্বান করলাম, আর সে এটা উপেক্ষাই করলে। চুলোয় যাক্,—আমি আর কি করতে পারি,—সে নিজে যা পারে করুক। শুনলাম, সে পলিটেক্নিকে একটা মাস্টারীর চেষ্টা করছে।

একদিন বিকালের দিকে আমার বাংলোয় এলো,—এমন মাঝে মাঝে আসতো। আমরা বেড়াতে যেতাম খানিকটা ইণ্ডিয়া গেটের দিকে বা এদিক ওদিকে। সেদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার মেয়ের মুখে শুনলাম, উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণই বসে আছে আমার অপেক্ষায়। একটা মিথ্যা

আছিলায় বললাম—আমার সময় কোথা, এখনি স্টেশনে যেতে হবে, এক বন্ধু আসবেন। গাড়িটাও ছিল দরজার কাছে হুকুমের অপেক্ষায়। জানলা দিয়ে দেখি, লোকটা বাগানে বসে বসে সামনের প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস্ গাছটা আঁকচে। হাতে তার সব সময়েই একটা স্কেচবই থাকতো। আমি এখন কথা কইচি ঘরের ভিতরে, নানা কাজে ব্যস্ত, চাকরদের হুকুম করচি, টেবলে খেতে খেতে--মেয়ের সঙ্গেও কথা কইচি। মেয়ে আবার আমায় মনে করিয়ে দিলে ; অনেকক্ষণ তিনি এসেছেন, একবার দেখা করবে না, বাবা ?

এই মীরাকেই ছ'বি আঁকা শেখবার কথা হয়েছিল। তার প্রত্যাখানটা দেখলাম মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি ঐ মেয়েটি। ব্যাপারটা সে এই ভাবেই মানিয়ে নিলে যেন, ম্যাট্রিক পড়তে পড়তে আর্ট লাইনের ক, খ থেকে শেখা চলে না। উপরন্তু সে বলে কি ? উনি সত্যসত্যই আমাকে হিউমিল্লিয়েশান থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েচেন বাবা,—ও আমার হতো না। দেখলাম,—উল্'ট তার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে।

এখন তার লক্ষ্য—কলকাতা থেকে যে ছবিগুলি তিনি সঙ্গে এনেছেন, আর যা এখন ডাঃ গুপ্তর বাড়িতে বসে বসে আঁকচেন, —তা দেখবার জন্য সময় ঠিক করতে আমায় অনুরোধ আরম্ভ করেছে,—চল না, বাবা—একদিন দেখে আসি।

সে যাই হোক, এখন তাকে বিদায় করতে হবে একটা ভদ্র অছিলায়। বললাম,- যাকগে, বলিস, আমি বিশেষ দরকারে স্টেশনে গিয়েচি, সে আপনিই চলে যাবে'খন।

জানিনা, এই মৃদু উপেক্ষা সে বুঝেছিল কিনা। আর যদিই বা বুঝে থাকে তাহলেই বা কি,—আমার মত লোকের ফেভার পেতে যদি দুচার দিন হাঁটাহাঁটিই করতে হয়, এটা এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং এটাই দস্তুর। সবাই করে থাকে, যাদের কাজ চাই।

ডাঃ গুপ্ত তার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং সমপদস্থ একজনের মতই ব্যবহার করেন, যার ফলে সে আমাদের সঙ্গেও খুব খোলাখুলি ব্যবহার করতে চায়। আমি তা চাই না। আমি চাইতাম, সে আমাদের পদমর্যাদার উপযুক্ত সম্মানজনক ব্যবধান রেখে চলুক। কিন্তু সে সেদিক দিয়েও যেতে চাইত না,— আমরা যে তার মুরুব্বি আমাদের অনুগ্রহই যে তার কাম্য একথা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকানো যেত না। সে স্পষ্টই বলে দিতো, দেনেওয়ালা একমাত্র ভগবান, মানুষে কি করবে? এইখানেই আমার সঙ্গে তার বিরোধ।

প্রায় মাস পাঁচেক কাটলো ঐভাবে। আমারও বাইরের ভাব একই বকম রইলো। তার পরই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, একদিন সে এসে সোজা কথায স্পষ্টই বললে,—

আপনার আশ্রয় ছাড়া আব আমার গতি নেই, দেখচি।

ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। ডাঃ গুপ্তের এক আত্মীয়ঃ পবিবাব আসছেন। তাঁব বাংলো ছোট, জায়গা কম,— কাজেই তাকে ওখান থেকে সরতে হবে। সেইজন্যই আমার আশ্রয় ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন আমার সি ক্লাসের, বেশ বড় বাংলো অনেক ঘব। ফ্যামিলির মধ্যে আমার ছেলে ও একটি মেয়ে; স্ত্রী প্রায় সাত বৎসর পুর্বে স্বর্গে গেছেন; মেয়েটিকে নিয়ে আমি একটি ঘরে থাকি, আর ছেলে একটি ঘরে তার পড়াশুনা নিয়েই থাকে। বাকী ঘরে গেষ্ট অথবা আপন কেউ এলে থাকে। একবার কথা প্রসঙ্গে আমিই তাকে এ কথা জানিয়েছিলাম,—সে জানতো ব্যাপাবটা,—তাই আশ্রয়ের কথা বলা সহজ হয়েছিল।

তাকে বললাম,—বেশ তো, চলেই আসুন না, পশ্চিম দিকের ঘরখানায় থাকবেন। প্রসন্নমনেই বলেছিলাম কথাটি;—আমার আশ্রয় ছাড়া তার গতি নেই কথাটা তার মুখ থেকে শুনতে ভারি শ্রুতিরোচক লেগেছিল।

সে অবশ্য তখনই এলো না, কারণ তাদের আসতে কিছু দেরী ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে তার যাতায়াত যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে যা ঘটবার তাও ঘটে গেল; তাকে একটা বিষম আঘাত দিয়ে ফেললাম, যার ফলে আমার এই অসাধারণ দুর্ভোগ, আমার জ্ঞান বিশ্বাসের ধারা একেবারেই বদলে দিলে।

ঘটনাটা সহজেই ঘটে গেল। সত্যই তখন কোনো রকমেই ধরতে পারলাম না যে, আমার এই ব্যবহার তার সরল প্রাণে কতটা গভীর আঘাত দিয়েছে।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল, তাই অফিস থেথে এসে আর বাইরে বেড়াতে গেলাম না। বিরাট কম্পাউণ্ড, যত রকম মুরশুমি ফুল ফুটে যেন আলো করে আছে বাগান। এক জায়গায় প্যানসির বিছানা, তারই মাঝে মাঝে পপিও আছে। সেই ক্ষেত্রেই কিছু তফাতে তফাতে পিচগাছ—ফুলে ভ'রে গিয়েছে। সে যে কি রংয়ের খেলা তা ব'লে বুঝাবার নয়। দেখতে দেখতে মনটা যেন ভ'রে উঠলো। ঠিক ঐ সময়েই দেখি—শিল্পী একটা জায়গায় বোসে, নিবিষ্ট মনে ঐ দৃশ্যই উপভোগে তন্ময়। দেখে ভারি চমৎকার লাগলো। কাছে গিয়ে;—কখন এলেন? জিজ্ঞাসা করলাম। তার ধ্যানটি যেন ভেঙ্গে গেলো,—বললে, এই কতক্ষণ এসেচি। প্যানী, পপি, তার সঙ্গে ফুলে ভরা পিচের শোভাই দেখছিলাম; কি চমৎকার—এমনটি আমাদের বাঙ্গালায় তো দূরে কথা, এখানে আর কোনো কোয়ার্টারে দেখি নি। অপূর্ব রচনা।

আমার মধ্যে একটা প্রীতির দোলা লাগলো। লোকটির কথায় এমনই একটা -আন্তরিকতা আছে যেটি শুনলেই নিঃসন্দেহে প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করতেই হয়। তাকে বেশ সহজ একটা বন্ধুত্বের আহ্বান দিলাম—আসুন না, একটু বসে কথা কওয়া যাক।

ডাকলাম আমি, কিন্তু কথা কইলে সে। সুন্দর একটা প্রসঙ্গ, প্রাকৃত নিয়মের কথা নিয়েই আরম্ভ করলে—আগে ঐ ধরণের কথা কোথাও শুনিনি। তার একটা বৈশিষ্ট্য দেখেছি, যে প্রসঙ্গ নিয়েই কথা আরম্ভ হোক না কেন, সে ঠিক প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ভগবৎ প্রসঙ্গে এনে ফেলবেই,—আর তখনকার মত বিশ্বাসী করে তুলবে। বেশ যেন একটা নেশার মত ভাব এসে যায়। এখন শ্রদ্ধাই হয়েছিল, বললাম, আজ বেশ লাগচে আপনাকে পেয়ে। কিন্তু, আমায় এখুনি বেরোতে হবে, একটা বিশেষ এনগেজমেণ্ট আছে কিনা। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

বিনয়পূর্ণ ভদ্র ভাবেই সে বললে, হুকুম করুন,—

দেখুন, আগামী শনিবার আপনার নিমন্ত্রণ রইলো, সকাল সকাল আসবেন, বেশীক্ষণ থাকবেন, শেষে খাওয়া দাওয়া করে যাবেন। শুনে সে বললে, এ এমন বেশী কথা কি, বেশ তো তাই হবে। তখন বললাম, আর আমার ছেলেদের একটু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা শোনাবেন। কেমন?

তাইতে সে বলে কি,– যে ভাবে এ্যংলিসাইসড্ করে তুলেছেন ছেলেদের,—ধর্ম কথা ভাল লাগবে কি? তাদের জীবনের আউট লুকটাই বদলে গিয়েছে যে।

কথা শুনে আমার ভিতরটা আবার রি রি করে উঠলো, স্পর্দ্ধা দেখ। তবু বল্‌লাম—আমাদের যে এদিক ওদিক দু দিকই রাখতে হবে, এটাও চাই, ওটাও চাই। তাইতো এখন থেকেই তাদের কানে একটু একটু ঢুকিয়ে দিতে হবে, তবেই না সময়ে তার ফল পাওয়া যাবে।

সে আর তর্ক না করে বললে;—আচ্ছা, তাইই হবে।

কথা রইলো শনিবার সন্ধ্যায় আসবে, খাওয়া দাওয়া করবে—ইত্যাদি,—এইভাবে সে দিনের কথা শেষ।

শনিবারে তার আসবার কথা,—আমার মনেই রইলো না; কারণ একটা মহা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিল।

মিঃ বোস—বড় একটা কমিশনে রেঙ্গুন যাচ্ছেন। এত বড় কাজ এর আগে কোনো ভারতীয় কর্মীকে দেওয়া হয়নি। সেই শুভ উপলক্ষ্যে তাঁর ওখানে একটা পার্টির আয়োজন হয়েছিল।

খুবই সত্য, আমার এ ভুলটা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত। ঐ লোকটাই তো সেদিন আমার ছেলেদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাবার অনুপযুক্ত, এংলিসাইসড্ বলেছিল—তাতেই আমার মধ্যে এমন ভাবে একটা আঘাত লেগেছিল যাতে আমি তাকে এতটা উপেক্ষাই করলাম।

তার কথা যাই হোক, শনিবারে কিন্তু বোস সাহেবের বাড়িতে যে পার্টিটা হলো তা যথার্থই উপভোগ্য। সুখের তো বটেই, তা ছাড়া তাকে ইউনিক্ বলাই ঠিক। এর আগে এতটা কোথাও হয়নি। যতো বড়ো বড়ো অফিসার, ছ হাজারী, পাঁচ, চার, তিন, আড়াই, দুই এবং এক হাজারী পর্যন্ত ছিল। তারপর মহিলা সমাবেশ,—সে কথায় আর কাজ নেই। আর ডিনারের কথা একমুখে বলবার নয়। সত্য বলতে, এমন বিচিত্র ব্যয়-সাধ্য পানীয় ও ভোজ্য এর আগে কোথাও ভোগ করেছিলাম ব'লে তো মনে পড়ে না। তাবপর পরিবেশ,—পবম সুখকর। তৃপ্তি আমার পূর্ণরূপেই হয়েছিল; সবার উপর স্যার বি. এল. ও লেডি মিত্রের উপস্থিতি, মহামান্য শ্রেষ্ঠ অভ্যাগত রূপে। মহাভাগ্য না হলে এ যোগাযোগ কারো কখনও ঘটে না। শেষে, রাগিনী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য পর্যন্ত। কোনো দিকে ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই।

ঘরে ফিরতে আমার সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

তখনও পোষাক ছাড়িনি, শুনলাম, শিল্পী ঠিক সাড়ে সাতটার সময়েই এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেও ছিল; যখন

এখানকার কেউ এলোনা তখন একখানা স্লিপ লিখে রেখেই চলে গিয়েচে।

নেপালি চাকর স্লিপটা হাতে দিলে, তাইতে পরিষ্কার বাঙ্গলায় লেখা ;—

আপনার অনুরোধপূর্ণ আহ্বানে ঠিক সময়েই এসেছিলাম ; তৃপ্তিপূর্বক ভোজন,—শেষে ছেলেদের সঙ্গে খানিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বিদায় নিলাম। ধন্যবাদ !

চাকরের কাছেই শুনলাম, ছেলেবা বিকালেই ক্লাবেব পার্টিতে গিয়েছে,—এখনও তারা ফেরেনি।

ভেবে দেখলাম, তাদেরও তো শনিবার !

কাগজখানা টুকরো টুকরো, যাকে বলে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। গা জ্বলে যায় - আঃ, কি অশান্তি। উঃ—এই ভদ্র ভিক্ষুকদের স্পর্দ্ধা কতটা বেড়ে গিয়েছে, আর সেটা আমাদেরই উদারতার গুণে।

দূর করো ছাই !

যাই হোক, আমাব তিলমাত্র অনুশোচনা হলো না। বরং খুব খানিকটা স্ফুর্তি হলো এই ভেবে যে, ঠিক হয়েছে—কেমন ? এই ইন্‌সালট্‌টাই আমার শাস্তি।

তারপর মন থেকে তাকে দূর করে দিলাম। আজকে পার্টিব সুখের কথা, রাগিনী দেবীর নৃত্য যে স্বর্গের জিনিস, কি মিউজিক, আর অপূর্ব পরিবেশ ! ভোজনে বহুকাল এমন সুতৃপ্তির মুখ দেখিনি !—রাত্রি বারোটা,—আজকের সুখের ভাবনায় বিভোর ;— শুয়ে পড়লাম এবং অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেলাম অল্পক্ষণেই।

॥ ৩ ॥

ঘুমটি ভাঙলো ভোরবেলায়, যে সময় আমি উঠি। অবশ্য ঠিক ঘুম ভাঙবার আগে, যেমন হয়ে থাকে খানিক স্বপ্নাবস্থা,—সেই সময়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য, পাড়াগাঁয়ের পথের ধারে যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি—ডান হাতে আছে আমার একখানা কাস্তে আব বাঁ হাত ধরে টানাটানি কবছে একটি কালো, ময়লা কাপড় পরা, মাথায় চুড়ো-খোঁপা বাঁধা একটি ছোট মেয়ে; বলছে—চলো না, বাড়ি চলো না, মা যে এঁদে বেড়ে বোসে আছে। ঠিক তখনই ছ্যাং করে ঘুমটা ছুটে গেল আর তখনই উঠে বসলাম।

স্বপ্নটা বুঝি তখনও ছাড়েনি,—একি বিছানা, একটা তক্তার উপর মাছুর, আর জরাজীর্ণ কাঁথা, একি ব্যাপার, মশারীর চাবি দিকে তালি, ময়লা, দুর্গন্ধ, শিশু-ছেলে-মেয়েদের শুকনো মুতের গন্ধ। পাশে শুয়ে ও কে? কালো-পাড় কাপড়, ময়লা রং, হাতে রূপোর দুগাছা চুড়ির নীচের দিকে একটি শাখা, লোহা আর কাঁচের চুড়ি। মোটা মোটা গাঁটওয়ালা অঙ্গুল, একটি হাত ফেলা আর একটি হাত মাথার নীচে, আমাব পাশেই ঘুমোচ্ছে ভোঁস ভোঁস শব্দে। কাপড় গায়ে নেই, কতকটা কোমরে জড়ানো। পিঠের দিকে খোলা আর পায়ের দিকে হাঁটুর উপর অনেকখানি গুটানো। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি, বীভৎস লাগে সেদিকে চাইতে। একি ব্যাপার, এরা কে? আমিই বা কোথা? তারপর গোঁফটা চুলকে উঠলো। আমার এ কি শরীর? মাথায় টাক নেই, ঘন ঘন চুলভরা মাথা, মোটা গোঁফ, এত বড় দীর্ঘ শরীর, এ দেহ তো ছিল না আমার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সাত আট দিন না কামালে যেমন হয় সেই রকম। এমন স্বপ্ন তো কখনও দেখিনি জীবনে।—এ স্বপ্ন—নিশ্চয়ই স্বপ্ন—

আমি মিঃ দত্তগুপ্ত, সাজাহান রোডে, সি গ্রেড বাংলোতে থাকি, আমি কখনও এখানকার কেউ নয়। এখানে আসবো কি করে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙ্গছে না যে, কি মুস্কিল, বসেই আছি, চোখ রগড়ে রগড়ে বেদনা হয়ে গেল, তবুও স্বপ্ন অনেকক্ষণই দেখছি—অদ্ভুত, বিচিত্র অবস্থার স্বপ্ন এর আগেও অনেক দেখেচি, অল্পক্ষণেই ঘুম ভেঙ্গেছে, জেগে উঠেছি, বাথরুমে ঢুকেছি।

আমার বাথ-রূমে কারো প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আজ এ কি আপদ,—কোথা বাথরূম? একটা পুরানো, খড়ের ছাওয়া চালা ঘর;—ছেলেবেলা যেতে আসতে রেলপথের ধারে গ্রামের চাষা-ভুষোদের যেমন দেখেছি এ যে সেই রকম সব। আচ্ছা, মনে মনে জিজ্ঞাসা করছি এরকম অবস্থার কেমন করে সম্ভব হলো? কোথা দিল্লী, সেই ইম্পিরিয়্যাল দিল্লী আর কোথা বাংলার এই চাষা প্রধান পল্লী। যাক মজা মন্দ নয়। আর কতক্ষণ এটা থাকবে, কাটলে যে বাঁচি।

এমন সময় একটা বুড়ীর গলার আওয়াজ, যেন দরজা থেকে গলাটা বাড়িয়ে বলছে, অ—নিস্তার,—ওমা, এখনও শুয়ে আছিস? শুনামাত্র পাশের নিদ্রামগ্না প্রায় উলঙ্গিনী নিস্তারিণী ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—ওমা, ফরসা হয়ে গেছে, আমায় একটু গা ঠেলে ডেকে দিতে পারোনি—দেখ, মিনষের রকম দেখ, যেন কাকে বলছি তো কাকে বলছি;—বলি, ওগো শুনতে পাচ্ছনা,—মা যে ডাকতেছে। ভোরে উঠে পড়বো, ধান সেদ্দর কাজ পড়ে রয়েছে। বলি বসে বসে ঘুমুচ্ছো নাকি? টাকার কি হলো, কিছু সুবিধে হলো কোথাও? তোমার হলো কি—রা কাড়োনা যে বড়—ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে রয়েছো? কাছারীতে যেয়ে আজ টাকা দিতে হবেনি বাবুদের?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে একবার মাত্র ঐ জমাদার চাষানী

স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে দেখলাম;—এত সব কথা এ মাগি কাকে বলছে? তারপর দেখি, তাড়াতাড়ি উঠে মশারীর বাইরে গিয়ে কশি দিয়ে কাপড় পরতে লাগলো। এমন সময় ছোট মেয়ে একটি, যে মায়ের পাশেই শুয়েছিল, উঠেই, ও মা—বলে একটানা কান্নার সুর ধরলে।

ততক্ষণে ঘরের দরজার কাছ থেকে আমায় লক্ষ্য করে নিস্তার বললে, ও মা, অমন ঝুম মেরে বসে বসে দিন কাটাবে নাকি? নাঃ, ওঠো না গো—তুমি মেয়েটিকে একটু দেখো, আমি ঘাটে চল্লুম ম্যালা কাজ পড়ে আছে। নিস্তার চলে গেল, মেয়েটিও মশারী তুলে বেরিয়ে উপর থেকে নামতে চেষ্টা করলে,—না পেরে,—মা, মা করে জোর গলায় কান্না লাগালে। আমি মহাবিরক্তির মধ্যে এই স্বপ্নই দেখতে লাগলাম।

স্বপ্ন অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন নচ্ছার, দীর্ঘকালস্থায়ী স্বপ্ন কখনও দেখিনি। ছি ছি. আমার মাথা খুড়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগলো—বিরক্তিতে এক একবার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হলো। কি করি? এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে আমি যে কি সুত্রে আসতে পারি সেটা ভেবেই পেলাম না। স্বপ্ন হলেও তার তো একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ সূত্র থাকবে? কিন্তু আমি মিঃ দত্তগুপ্ত, সি আই. ই., সাড়ে তিন হাজার গ্রেডের গেজেটেড অফিসার, আমার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের এক অজ পল্লীগ্রামে ঘৃণ্য চাষী পরিবারের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?—কি সুত্রে আমায় এই নোংরা দুর্গন্ধপূর্ণ ছেঁড়া মশারীর মধ্যে, কাঁথার বিছানার উপর বসে প্রভাতে, তাড়কা রাক্ষসীর মতো উলঙ্গিনী চাষাণীর এই সম্বোধন শুনতে আর নোংরা কুৎসিৎ একটি মেয়ের ঘ্যান ঘ্যানানী শুনতে হচ্ছে?

আড়কাঠের উপর খস্ খস্ করে এক রকম কি শব্দ হলো;

তখন কতক আলো হয়েছে, তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখি,—সর্বনাশ, প্রকাণ্ড একটি সাপ, বাঁশের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়ে পাঁচিলের ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে। হায়, হায়, কাকেই বা ডাকবো, কাকেই বা দেখাবো। তাড়াতাড়ি বাইবে বেবিয়ে এলাম, সামনেই দেখি, বুড়ী একটি, হেঁট হয়ে শপ্ শপ্ করে কোঁস্তা দিয়ে দাওয়া ঝাঁট্ দিচ্ছে। বললাম, ওগো একটা সাপ ঐ যে উপর দিকে, আড়কাঠে।

বুড়ী ঠিক সেই ভাবেই হাত চালাতে চালাতে বললে,—যাও বাবা, সকালবেলা আর ঘরেব ভেতর কেন, বাইরে যাও। আশ্চর্য বুড়ী কালা নাকি? বললাম, সাপ,—কথাটা শুনতেই পেল না। আবও চীৎকাব করে বললাম, শুনতে পাচ্ছ না—সাপ, একটা প্রকাণ্ড সাপ যে,—ঐ আড়কাঠে। বুড়ী বললে, কে জানে বাছা, আজ তোমার আবার কি হলো, সকালবেলা, বাইরে যাওয়া নেই, ঘরের ভেতর থেকে না বেরিয়ে, সাপ সাপ কবে চীৎকার কবছো—যেন একটা কি ভয়ানক লড়াই হয়েছে। যেন বাপেব জন্মে ঢোঁড়া সাপ কখনও দেখনি, চালেব উপর। বোলে, সে বিরক্ত হয়ে দাওয়ার অপর দিকে চলে গেল।

ঘুম ভেঙে গেলেই কোথা বাথরুমে ঢুকবো, তারপবে শাওয়ার বাথ আছে। স্নানশেষে একেবারেই অফিসের সুট পরে সোজা ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসবো, কাগজখানায় চোখ বুলোতে বুলোতে জবজবে মাখন মাখানো একখানি টোষ্ট রুটিতে জেলীর সঙ্গে হাতে নিয়ে কামড় দেবো, ইতিমধ্যে ছেলে-মেয়ে সবাই খাওয়া আরম্ভ করেছে দেখবো,—দুই একজন বান্ধবও সামনে বসে দুই একটা সরকারী অফিসের কর্ম সংক্রান্ত বুকনী ছাড়বে, আমি মহা প্রাজ্ঞের ভাবে একটু মাথা নাড়াব; কোথাও বা একটা কথা বোলে সেটাতে বশান দেবো; তা নয় আজ আমি কোথা? এখানে কি করে এলাম, স্মৃতির সাহায্যে কোনো রকমে মীমাংসা করতে না পেরে

দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে জড়বৎ এই অজ পল্লীগ্রামের মধ্যে এক চাষার ঘরে ছটফট করছি স্বপ্ন দেখতে দেখতে। এটা কি স্বপ্ন নয়? তবে এটা কি?

॥ ৪ ॥

মনের মধ্যে এক একবার কে যেন বলছে—স্বপ্ন বোলে বাস্তবকে উপেক্ষা পবিত্রচিত্ত দার্শনিকদেরই সাজে, তোমার মত পার্থিবমনা গরিমা-গ্রন্থি প্রধান চাকুরে একজনের সাজে না।

তবে কি সত্যই আমি সেই দিল্লীর মিং এল. এম. দত্ত গুপ্ত নয়?—আমি তবে কে?—

উঠান থেকে একজন ভারী গলায়,—হলধর আছো,—হলধর! বোলে সামনে আসতে লাগলো। আমাকে দাওয়ার উপর দেখে আবে দাওয়ায় দেঁড়িয়ে হাপু গুনচো কেন?—হেথা এসো না— মাঠে যাবা নী?

আমি হলধর চাষা? কোথায় মিঃ ললিতমোহন দত্ত গুপ্ত, সি. আই. ই.—তা নয়, স্বপ্নে হলাম হলধর?—কিন্তু আশ্চর্য, আমার এই পরিবর্তনটা ঘটলো কেমন করে?—আমার স্মৃতি তো হলধরের নয় শরীব মাত্র রূপান্তরিত হয়েচে। বেশ মনে হচ্ছে কাল রাত্রে মিঃ বোসের বাড়ি চব্য চোষ্য তৃপ্তিকর ভোজ্য উপভোগের পরে নিজ ঘরে এসে নিজের দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শুয়েছিলাম নয়া-দিল্লীর সাজাহান রোডের ভিলার মধ্যে, আর আজ প্রভাতে ঘুম থেকে উঠলাম কি না হলধর নামে এক চাষা, নিস্তারিনীর স্বামী হয়ে— বাংলার অজ পল্লীর মধ্যে চাষাদের গ্রামে; এটাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে? তাহলে—ঐ আসল হলধর—সেই মানুষ যার শয্যায়

শুয়েছিলাম সে কোথা ? হা ভগবান ! এই টোয়েন্টিএথ্ সেঞ্চুরীর মধ্য ভাগে এমন ঘটনা ঘটে কি করে ? মন্ত্র তন্ত্রের ব্যাপার তো কিছু নয়, আমার উপর ও-সব করেই বা কে ? আমি তো কারো কোনও অনিষ্ট করিনি, আপনার যা আছে তাই নিয়েই আমি এব মধ্যেই যা কিছু ভোগ উপভোগ ক'রে চলেছি। আমার শরীর কিভাবে পরিবর্তিত হলো ? মন, ব্রেন, চেতন ও স্মৃতি তো ঠিকই আছে কিন্তু পবিবর্তন শুধু দেহ আর পরিস্থিতি নিয়ে—এ কি ব্যাপার ?

এখন লোকটি আমাব হাত ধরে হুড়মুড় করে টেনে নিয়ে গেল একেবারে দবজার বাইরে পথেব ধারে। সামনেই অনেকটা চওড়া মাটির রাস্তা আর সেই রাস্তার উপবে একটা বটগাছ ; তার নীচেই একটা চালাঘবে কামারশালা ; হাপর চলছে এই সকালেই। লোকটা সেইখানে নিয়ে গেল আমায়। কামার হাতুড়ি পেটা বন্ধ কবে আমাব মুখের দিকে দেখলে,—বললে, এই যে হোলো দা,—তোমার চাউনিটা যেন কেমন কেমন দেখছি।

তাইতো তোলো! ত্রৈলোক্যর ডাকনাম তোলো, ঠিক তো বোলেচিস, বটে বটে। দেখে শুনে আর একজন বললে, হাঁরে হোলো, তোব হলো কি ? ওবকম চেয়ে রয়েচিস ক্যানো বল্ দি –

আমি কি এখনও ভাবব যে স্বপ্ন দেখচি এই সকালবেলা ?

মোড়লের ভাই! তোর যে দেখি আজ ভাব চাগালো—হাঁরে হোলো, কাল হরিসভায় তো খোলে একবার হাতও দিলিনি। বল্ না তোর কি হলো ? দেখতে দেখতে আরও জন দুই তিন এসে জুটলো সেখানে। বেশ বেলা হয়েচে,—এবার গাছের ফাঁকে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। আমি তো ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে আস্তে আস্তে পথ ধরে সামনের দিকে চলতে লাগলাম। ওরা আর আমার সঙ্গ নিল না। পিছনে তারা পরস্পর কথা কইতে লাগলো, শুনলাম একজন বলচে—কি ব্যাপার বল দি, আজ ওর হলো কি ?

ত্রৈলোক্য বলচে—আমি তো টেনে আনলাম, না হলে ঘরের দাওয়ায় দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে ভাবতেছে—ওর একটা কিছু হয়েচে, উপরি দেবতা লেগেছে! আর একজন বললে—ও সব কিছু নয়, খাজনার টাকার কথাই আসল।

পথে আর এক ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম;—বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এযে আমাদেরই সেই দিল্লীর আর্টিস্ট, অতিথি। ঠিক যেন সেই লোকটা, নিজের জায়গায় থাকলে যেমন হয়—খালি গা, পায়ে চটি, কোঁচা ঝুলছে, দাঁতন করতে করতে চলেছে। আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। মুচকি হাসি তার মুখে, বললে, কি হলোধর।

আমি তো অবাক। ভাবলাম,—আমায় হলোধরই বললে। এ্যাঁ, তা হলে এ কি জানে আমার সব কথা?

আমি বললাম,—আপনি এখানে যে? সে বললে,—আরে তুমি জানো না নাকি এখানে আমার মামার বাড়ি– আমায় কখনও কি তুমি এখানে আগে দেখনি নাকি যে জিজ্ঞাসা করচো? আর অমন অবাক হয়েই বা দেখছো কেন বলতো? ভাবাবেগ সামলাতে না পেরে আমি বললাম,—আপনি দিল্লীতে ছিলেন না? রাতারাতি এখানে এলেন কি করে?

সে বললে, যেমন করে তুমি এসেছ তেমনি করেই আমিও এসেছি। এমন সময়ে একটি ফুটফুটে ছোকরা এসে তাকে সম্বোধন করে বললে,—অপু দা, তোমায় মোহিনীকাকা ডাকতেচে।

লোকটা কে? একেবারেই আমাদের সেই দিল্লীর অতিথি উপাধ্যায় শিল্পীর মতই দেখতে। তাকে যখন অপু'দা বোলে ডাকলে, তখন আমার মনে হলো এটা আমারই ভ্রম। মানুষের মত একটা মানুষ কি থাকে না, এ তাই হবে।

যাই হোক, এখন এই যে অপুদা, সে কিন্তু তখনই তার সঙ্গে

গেল না; সে ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললে, ওরে পান্নু, এ বলে কি রে? দিল্লী থেকে কবে এলাম জিজ্ঞাসা করছে। তাহলে আমাদের হলোর দেখচি দিল্লী পর্যন্ত জানা আছে। দিল্লী তুই কবে দেখেছিলি, বল্‌তো হলোধর?

তখন আমি আবার সত্যকে নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করলাম। বললাম, আজ সকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। যেন দিল্লীতে গিয়েচি আর আপনিও যেন আছেন।

অপুবাবু আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি বলে গেল;—আর তুই সাজাহান রোডে একখানা সি ক্লাসের বাংলোয় আছিস, লাটসায়েবেব দপ্তরে কাজ করিস, মাসে আড়াই হাজার মাইনে পাস, বড় বড়, লোকের সঙ্গে ডিনার খাস, বাথরুমে শাওয়ার বাথে স্নান কবিস। বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে সেক্‌হ্যাণ্ড করিস। সাইকেলে অফিসে যাস, মটরে করে পার্টিতে যাস, এঁ্যা, কেমন, নয় কি? আমার মত একজন পোটো ক্লাসের লোককে রাত্রে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে ভুলে যাস্, নয় কি? তোর চেয়ে কতই না ছোট আমরা,—দাতা ও ভিক্ষুক সম্পর্ক, আমাদের মত লোকের সঙ্গে তোর,—না রে?

আমি তো স্তম্ভিত, বিস্ময়ে আমার দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসচে। তাহলে এ লোকটা তো সত্যই সব জানে। তারপর আর একটা মনে হলো, যে উপায়ে আজ প্রাতে আমার অবস্থান্তর ঘটেছে, এরও হয়তো তাই। মনে হলো, আমার দম্ভের ফলে বিধাতার এই দণ্ড।

॥ ৫ ॥

কি অদ্ভুত শ্লেষব্যঞ্জক হাসি অপূবাবুর মুখে,—আমার অন্তরাত্মাই জানেন কি আঘাত পেলাম তার কথায়। আমার অবাক-বিস্ময় আর অন্তরের তোলাপাড়াটি যেন লোকটা বেশ তীক্ষ্ণ ভাবেই লক্ষ্য করছিল, তাই তারপর আবার বললে, কি ?—হাঁরে হলোধর, নতুন দিল্লীর লাটসাহেবের অফিস, সহরের ঐশ্বর্য, চাকরীর মান আর সব সমান পদের বড় বড় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজের চরম উন্নতির অবস্থার স্বপ্ন—তাছাড়া আর দুনিয়ার তেমন সুন্দর কী-ই বা আছে ?—আমার মত একজন তাঁবেদার, সে কি আব অত বড় ধনবান, উঁচু পদের অধিকারীর সঙ্গে সমান হতে পাবে ? তারপব ভগবান বোলে সত্যি কেউ আছে কি ? অন্তর্যামী একজন সবার মনের কথা টের পায় এমন কেউ সত্যি সত্যি আছে নাকি ? এ্যাঁ, এই সব ভাবিস না তো ?

আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কি ভয়ানক, এই লোকটাই কি আমার মনের কথা বুঝে দণ্ড দিচ্ছে নাকি এখনও কি আমি স্বপ্ন দেখছি ?

আমি যেন কি একটা বলতে গেলাম,—আপনি আপান,—এইটুকুই মুখ থেকে বেবিয়ে গেল, কানেও শুনলাম,—তারপর কি যে হলো জানি না, কেবল এইটুকু শুনতে পেলাম, ওরে পানু, ধর্ ধর্, আমাদের সম্ভ্রান্ত নতুন দিল্লীর একজন কম্যাণ্ডার অফ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ব্যাস, আর কোনো সংজ্ঞা নাই আমার। কতক্ষণ পর যেন জ্ঞান ফিরে পেলাম, আমার সেই দাঁড়ানো অবস্থাই রয়েছে। পানুর বলবান বাহু আমায় ধরে আছে, আমায় পড়ে যেতে

দেয়নি। সেখানে অপুবাবু ছাড়া তখনও কেউ নেই। চেয়ে দেখি, লোকটা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ হাসিমুখে আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি চক্ষু মেলতেই সে বললে—আর কাজ নেই হলধর, তুমি যাও যেখানে যাচ্ছ, তোমার ভাবে ভঙ্গিতে আমার মনে হল যেন তোমার জীবনের মধ্যে এই সময় একটা অভিজ্ঞতা এসেছে—যা কস্মিন কালেও তুমি ভাবোনি, চিন্তাও করনি, এমন কি কল্পনাও করনি—অবস্থাটা যেন স্বপনেরও অগোচর,—নয় কি? —আমার দিক থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে লোকটা আবার বললে,—আমি আর কিছু জানি না, কেবল এইটুকু মনে হচ্ছে,—তোমার অন্তরের স্বার্থ, উচ্চপদ আর ধনের অহং গরিমাই তোমাকে এই অবস্থায় হয়তো এনেছে—দেখো যদি এতে তোমার চৈতন্য হয়।

ঐ কথা শুনে ভেবে দেখলাম, সত্যই তো, আমরা এই সংসারের এখানকারই মানুষ,—একটু উঁচু হয়েছি কি অহংকারে ফুলে উঠি আর দম্ভই তখন আত্মপ্রসাদের স্থান অধিকার করে;—যাকে দেখি সেই-ই আমার চেয়ে কোন না কোন দিকে ছোট, আমার সব কিছুই সম্ভ্রান্ত, এই হলো আমাদের রোগ—আর তার ওষুধ-ও ঠিক পড়েছে?

ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের বিচারের ভুল হয় কিন্তু তাঁর বিচারে কখনও ভুল হয় না। আমরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী কেউ হয়তো একটু বুঝি, কেউ বা বুঝিই না, বুঝতে পারিই না। কারণ, ভিতরের জমাট অহংকার আর ততোধিক জমাট দম্ভ ঠিক বুঝতেই দেয় না যে।

আবার সময়মত একটু ভেবেই দেখো কথাটা। এই পর্যন্ত বলে লোকটি চলে গেল আর আমার দিকে চেয়েও দেখলে না।

আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম—হন্ হন্ করে ভদ্রলোক যাচ্ছে, এতটা দ্রুতপদে চলে গেল, সেটা অস্বাভাবিক মনে হলো।

আমি তো তাহলে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য-পথেই আছি। কিন্তু লোকটা যেন সব কিছুই জানে, এবং বোঝে যা কিছু আমার অবস্থান্তরের ব্যাপার। বেশী দম্ভ-অহংকার আমার আছে। এ সংসারে কারই বা নেই? সবারই তো প্রচ্ছন্নভাবে ঠিক ওটা আছেই, বিশেষতঃ তাদের তো থাকবেই সেল্‌ফমেড্ ম্যান যারা,—তবে আমার বেলা বিধাতার এমন একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা হলো কেন?

আমায় এই স্বপ্নেই পেয়ে বসলো দেখছি। তবে কি স্বপ্নই দেখতে হবে? দেখি পথের ডানদিকে টিনের উপর লেখা রয়েচে, বাকুলে-চাঁদপুর পোস্ট অফিস, থানা কুলপী। হে ভগবান!

একি, আমি আবাব ভগবান বলছি কেন? আমি তো ও জিনিসটি কখনও মানি না,—মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি যে সমাজে অথবা সংসারে অন্যায় ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের মনবুদ্ধির অগোচর একটা অস্বাভাবিক আদর্শ দেখানো আছে মান্ধাতার আমল থেকে, না হলে আসলে ভগবান বলে সত্যি সত্যি কেউ আছে নাকি? তবে হেথায় হরিসভা করি, কালীবাড়ীর চাঁদা দিই, দুর্গাপূজার ব্যবস্থার মধ্যে থাকি কেন? আমার মত অবস্থাপন্ন একজন,—এসব না করলে হবে কেন? ঢাকার আনন্দময়ী মায়ের ভক্তদের মধ্যেও তো আমি একজন অন্তরঙ্গ—সবাই তাঁর এঁটো ফল, মিষ্টি, গ্লাসে খাওয়া জল প্রসাদ পায়, আমিও পাই। তাতে কি হয়েচে,—লোকে ভক্ত বলে বলুক না, আমি তো জানি আসলে ও-সব কিছুই নয়।

এর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, আমার মূর্তিটা ঠিক এদের হলধর হলো কি করে? তারপর সেই আমি কেমন করেই বা ওভারনাইট নিউ দিল্লীর সাজাহান রোড থেকে এই বাকুলে চাঁদপুরে এসে গেলাম।—আর এখানকার সংসারী হলধর,

দরিদ্র চাষীর মেটে ঘর-দোর, খড়ের চাল, তাতে সাপ বেড়াচ্ছে, এ সব ফেলে সে গেল কোথা? আশ্চর্য নয় কি? এখানে আমার স্থান হলো কি করে, এর মধ্যে কার ষড়যন্ত্র আছে? আবার ভাবি, অদ্ভুত ব্যাপার—এই হলধর গেল কোথা? তাহলে নিউ দিল্লীর আমার বাংলোতে যেখানে আমি থাকতাম, সেখানেই আমার বদলে নিশ্চয়ই এখানকার শ্রী হলধর আছেন। এ যে স্বুবর্ণ গোলকের গল্প। এখানে দুটো মানুষের রূপ ছাড়া মন বুদ্ধি নিয়ে বদলাবদলি হয়ে গেল। এ কখনও হয়?

তাও যেন হলো, কিন্তু ওভার নাইট জায়গা বদল হলো কি করে, হলধর গেল দিল্লীতে বাংলোয়, ললিতকুমার এলো বাকুলে-চাঁদপুরে ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ড হারবার সাবডিভিসনে কুলপী থানার অধীন এই অজ পল্লীগ্রামে। এরকম ট্রান্স্‌ফরমেশান, এক্স্‌-চেঞ্জ অফ সোল,—বিংশ শতাব্দিতে! কেউ শুনলে মনে করবে লেখক অপ্রকৃতিস্থ··যুক্তির একটা সীমা আছে তো? আচ্ছা, আমার বাংলোয় এতক্ষণ কি হচ্ছে—যাওয়া যায় না একবার দেখতে?

এখান থেকে যেতে কম্ সে কম্ থার্ডক্লাসে গেলেও প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগবে। আমার কাছে এই টাকা তো নেই—কোথা পাবো টাকা? পঞ্চাশ টাকা এক সঙ্গে এ গ্রামে করো আছে কিনা সন্দেহ।

আবার একটা কথা মাথায় এলো—আর ঠিক করেই ফেললাম মনে মনে যে, অপরিচয়ের ভাবটা ত্যাগ করে এদের সঙ্গে পরিচিতের মত ব্যবহার করিনা, তাতেই দিল্লীতে ফেরবার পথ দেখতে পাবো, হয়তো পেয়েও যেতে পারি।

এখন, সকল বিষয়ে সব কিছু অপরিচিত ভাবটা ত্যাগ করে সহজ হলধরের অভিনয় আরম্ভ করে দিলাম, যেন আমি সত্যই হলধর। ঐ কামারশালার ঘর থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম,

এখন সেইখান দিয়েই চললাম। যেটা হলধরের ঘর সেখানে গিয়ে দাওয়ায় দেখি আগুনভরা মালসা সামনে, তামাক খাচ্ছে দু'টো ছোকরা ;—আমাকে দেখেই তার মধ্যে একজন বলে উঠলো,—ও বা, অর্থাৎ বাবা, এই মাত্তর বাউঁদের বাড়িথে খেত্তোর পাক্ এসেছিল, বলে বাউরা তোমায় ডেকেচে,— তুমি যাবা না ?

বুঝলাম দুটি হলধরের ছেলে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—কালো রং, কিন্তু সুন্দর ছেলে—আমার নিজের ছেলের চেয়ে ঢের মানুষের মত। বেশ লাগলো কিন্তু জমিদার বাবুদের বাড়ি কোন্ দিকে তা তো জানি না,—ভাবলাম—এই ছেলেকে নিয়েই যাওয়া যাক্, সে তো চেনে ? এখানকার বাবুদের সঙ্গে তো দেখা হবে,—এক নূতন অভিজ্ঞতা। ভেবে চিন্তে বললাম, চ' তুই আমার সঙ্গে, দুজনে যাই। সে বলে, আমায় খড কাট্টে হবে এখন, হাতের কাজ ফেলে পারবুনি,—বাবা, তুমি যাও না।

এও তো এক সঙ্কট, তার দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাত করে জোর করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না—কি করি মহা মুস্কিল ! এমন সময় উদ্ধার করলে ঐ ক্ষেত্তোর পাক এসে।

এই যে হলোধর,—তোকে মেজবাবু ডেকেছে, তুই গিয়িলি কোথা রে ? তার কথায় জবাব না দিয়ে বললাম— চ—যাই।

॥ ৬ ॥

পথ সোজা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তারপর ডানদিকে ঘুরে একেবারেই জমিদারদের দেউড়িওয়ালা বাড়ির সামনে। গিয়ে উঠলাম প্রকাণ্ড আটচালায়। সামনেই চণ্ডী দালান। বারান্দা তিন দিকে,—বড় বড় ঘরের সারি। সামনে বাঁদিকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মোটাসোটা গায়ে কোট, আধা বয়সী, এক হাতে

ঝক্‌ঝকে চাবির গোছা, একবার করে বার কচ্চে আবার পকেটে পুরে রাখছে অন্যমনস্কভাবে। আর তার পাশে রোগা, ফরসা একজন, কেবল জুলপিতেই কাঁচাপাকা চুল, গায়ে গেঞ্জি, টেরীকাটা ভদ্রলোক একখানা চেয়ারে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছে। তাছাড়া অনেকগুলি প্রজাও আছে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখেই সেই কোটওয়ালা বললে,--এই হলো— তুই থাকিস কোথা? আজ সকালে টাকা নিয়ে আসবার কথা মনে নেই বুঝি নবাব পুত্তুরের? কথা শুনেই আমি একেবারে জ্বলে উঠলাম, আর অভিনয় মনে বইল না, প্রণাম কার্যটি কবতেও ভুলে গেলাম। বললাম, আপনারা ভদ্রলোক, ওরকম অভদ্র ভাষায় কথা কইছেন কেন? আমবা তো সবাই মানুষ, আপনারা না হয় জমিদারই হয়েছেন।

বিস্ময়ে অবাক। ওখানকাব সবাই আশ্চর্য ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বইলো। বুঝলাম এক্ষেত্রে আমার কথাগুলি খাটেনি, ব্যাপারটা খারাপ করে ফেললাম। বাবু বললেন, দেখো উমাচরণ, তোমার ভাই-এর বাড়টা কিরকম হয়েছে। তবে রে হাবামজাদা. শুয়াব কী বাচ্চা, তুমি বড় ভদ্রলোক হয়েছ বটে, দাড়াও, তোমার ভদ্রতা বাব করচি। বোলেই, এই কে আছিস— এই দোবে!

আমার ভাই—উমাচরণ। দেখি. বেশ ভব্যযুক্ত চমৎকার মূর্তি, প্রৌঢ়, গলায় তুলসীর মালা, শান্ত চাউনি, আমার দাদা।

দোবেজী ঐখানে দেউড়িতেই ছিল,— জী হুজুর, বোলেই লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালো। বাবু বললেন, এই। হলোকো কান পাকাড়কে হামারা সামনে ঘোড়দৌড় করাও। ঠিক ঐ সময়ে উমাচরণ জোড়হাতে এসে বললে, মেজবাবু। ওর মাথা খারাপ

হয়েচে ; কাল থেকে দেখেছি, টাকা যোগাড় করতে পারেনি,—খায়নি দায়নি, সারা রাত ঘুমোয় নি।

দোবে কিন্তু বাবুর হুকুম মতই আমার কান ধরতে এলো, কিন্তু সেই বিরাট শরীরের কাছে আমি পারবো কেন, আমার হাত দুটো ধরে সে এক হাতে মুঠের ভিতর রাখলে, তারপর কান ধরতে এলো, মেজবাবু বললেন,—থাক্ থাক্। তখন ছেড়ে দিয়ে সে পাশে দাঁড়ালো।

বেশ বুঝতে পারলাম, গাঁয়ের মোড়ল উমাচরণের জন্যই বেঁচে গেলাম, আর সে হলধরেরই দাদা, এখানে আমারও। এমন সময়ে দেখি, সেই অপুবাবু, বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো, আমার দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে সে একটু মুচকে হেসে ধীরে ধীরে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবেই পায়ে পায়ে আমার পাশেই এলো, তখন মেজবাবু গোমস্তার সঙ্গে কি একটা কথা কইছিলেন, এদিকে লক্ষ্য ছিলনা, এই অবসরে অপুবাবু আমার ঠিক কানে কানে বললেন,—এতবড় বুদ্ধিমান মানুষ, দেশ কাল পাত্র হিসেব করে কথা কইতে পারো না,—বোলে যেমনভাবে এসেছিলেন সেই ভাবে বরাবর বাড়ির ভিতর দিকে আবার চলে গেলেন। আমার যা হচ্ছিল সে কথায় কাজ নেই। এখন আসল ব্যাপারটাই বলি,—

বাবু এবার বললেন,—কই ভদ্রলোক! টাকা কোথা?

আমি ধীরে ধীরেই বললাম, কই টাকা, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন—তবে যে পরশু সকালে বড় জাঁক করে বোলে গেলি, আজ সকালেই খাজনা মিটিয়ে দিবি। উত্তরে শুধু বললাম যে,—আমার টাকা নেই।—তাতে বাবু রেগে বলে কি, একথা বললে আমাদের চলবে কি করে? আজ বাদে কাল, লাটের কিস্তি পাঠাতে হবে না? আমি সেই এক কথাই

বললাম,—টাকা নেই আমার। তখন বললেন, নেই তো ধার করে দে।

ভাবলাম, ধার করেই দেবো। দিতে যদি হয়তো ভালো করেই ধার করে এদের টাকা, আরও গোটা পঞ্চাশ টাকা বেশী করে নিয়ে দিল্লী পাড়ি লাগাই, তারপর যার দেনা সে বুঝবে। যদি তার সঙ্গে দেখা হয়তো টাকাটা দিয়ে দেওয়া যাবে। একবার দিল্লী পৌঁছতে পারলে হয়। এই সব মনে মনে ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ধার কোথায় পাবো টাকা। বাবু বললে, কেন, চৌথী আছে, দোবে আছে, এদের কাছে চোটাব সুদে ধাব কর্‌গে যা না।

তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কত টাকা চাই ঠিক করে বলে দিন তাহলে। বাবু গোমস্তাকে বলতেই, গোমস্তা খাতা দেখে বললে, পরশু সকাল্‌বেলা ঠিকঠাক হিসেব করে দিলুম,—সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা তিন পাই।

যাক্, তাহলে দুবছরের খাজনা সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা আর পঞ্চাশ টাকা, মোট অষ্টআশী টাকা। এইমাত্র কান মলা খেতে খেতে রয়ে গেছি যে লোকটির কাছে, তার কাছেই আবার যেতে হোলো। সে আমায় গোলাবাড়িতে নিয়ে গেল, বললে,—বৈঠ যা। বসেই রইলাম। আমার অদৃষ্টে এতেও ছিল, তৎক্ষণে দোবে কোথা থেকে টাকা নিয়ে এলো। টাকা রাখবার জয়গাটা তাদের লোকচক্ষুর অগোচর। কত টাকা গুণতে সে বলে কি, এত টাকা কেন চাই? এমন সময় গোমস্তাটি পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত, বললে, ওই সঙ্গে আমাদের টাকাটিও আছে, সেটিও যেন ধরে নিও।

আমি তো অবাক, তোমাদের টাকা আবার কি?

আহা, খোকা, যেন কিছু জানেন না, আমাদের হিসাবটা কে দেবে? তারপর ঐ পেয়াদার টাকাটি, যে ধরে এনেছে সরকারী

কাছারীতে, তারপর চৌকিদারি, পথ-কর, বারোয়ারীর চাঁদার টাকা কে দেবে?

বাব্বা! এ সব কি? শেষে খাজনার উপর আরও পাঁচ সাত টাকা দিয়ে তবে মুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে হলধরের উপর একটি মমতা এলো, আহা, বেচারা তো ধনে-প্রাণেই মরচে এই জমিদারের জমি চাষ করতে এসে। হঠাৎ আপন মনেই প্রার্থনা করে ফেললাম,—

হে ভগবান! এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে দাও, কমিউনিসম্ আসুক। চট্ করে মনে পড়লো; ব্যাঙ্কে যে আমার দেড় লক্ষ টাকা আছে। তাছাড়া আরও কত দিকে কত টাকা রয়েচে, তা হলে আমার সে টাকার কি হবে? কমিউনিসম্ এলে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা থাকবে কি করে? যাক্, চুলোয় যাক, কাজ নেই ও সব পাপ কথায়—এখন দোবেকে বললাম, তাহলে আমায় নব্বই টাকা দাও! টাকা পিছু রোজ দু'পয়সা সুদ হিসাব করে প্রথম দিনে প্রায় আড়াই টাকা কেটে নিয়ে সে দিলে টাকাটি। তা থেকে জমির খাজনার সব টাকা, হিসেবানা, তারপর পেয়াদা, এ চাঁদা সে চাঁদা ইত্যাদি করে সবসুদ্ধ তেতাল্লিশ টাকা দিয়ে পরিত্রাণ পেলাম।

হাতে রইলো বাহান্নো টাকা। যখন ফিরে আসছি তখন একজন কে, জানি না পিছনে পিছনে এসে বলে কি,—হাঁরে, অত টাকা কি জন্যে ধার করলি বল্ দিকি? বললাম, আমার দরকার আছে।

গোটা কুড়ি টাকা দেনা, তোকে ঠিক দু-এক দিনেই দিয়ে দেবো, আর বাবুকে বোলে তোর ভাল করে দেবো। সর্বনাশ, এ থেকে আমার দেবার যো নেই, আমি কিছুতেই পারবো না দিতে। সে লোকটি পিছু ছাড়ে না, শেষে ভয় দেখাতে লাগলো,—যদি না দিস্—

সকালে ত্রৈলোক্য বোলে যে লোকটা আমায় ডাকতে গিয়েছিল

সে দেখি আমার দিকেই আসছে। তাকে দেখে আমি একটু সাহস পেলাম। যখন তার কাছে গিয়ে সব কথা তাকে বলতে যাচ্চি তখন সঙ্গের সেই লোকটা বলে কি, আরে হলোধর এটি বুঝলি না, তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করছিলাম, যা যা ঘরে যা। বোলে চলে গেল চট্ করে। তখন ত্রৈলোক্যকে বললাম, ভাই, একটি উপকার কর, আমার সঙ্গে স্টেশনে চল, একটি কথা আছে।

হলধর বলে, ইষ্টিশান হেথা থেকে পাকা আড়াই ক্রোশ পথ, কি করতে এখন তুই ইষ্টিশানে যাবি বল দি? বললাম,—একটা দেনা পাওনার ব্যাপার, আমায় যেতেই হবে—ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই চ, তোকে দুটো টাকা দেবো। ভাবলাম, একেবারে পাঁচ টাকা বললে যদি আরও চায় তাই দুটাকা থেকে সুরু করবো এই মৎলব করেই বলেছিলাম। ওমা! সে বলে কি, শুধু শুধু আমায় দুটাকা দিতে যাবি কেন, আর আমিই বা নেবো কেন তোর কাছ থে। তোব কি হয়েচে বল দি?

বললাম—কিছুই হয়নি, তুই আমার সঙ্গে চ যাই। সে বলে, কিন্তু কি আজ তোর হয়েচে একটু খুলে বল দি, দেখচি সকাল থে. যেন কেমন হয়ে গেছিস? ঠিক যেন এ গাঁ-ভুঁয়ের কেউ নয় তুই। বল দিকি, ব্যাপার কি তোর হলো--বল্‌না? আমার কাছে লজ্জা কি, সেই ন্যাংটো পোঁদে কত খেলেচি তোর সঙ্গে, তারপর কত— মারামারি করেছি, বল্ না।

কি আর বলবো, শুধু বললাম,—চল্‌তো আগে স্টেশনে যাই তারপর বলবো। পথে কথা কইতে কইতে আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে সংগ্রামপুর স্টেশনে পৌছে বললাম—তুই একটু এখানে থাক, আমি আসচি। বোলে টিকিট ঘরের ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসায় জানলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে একখানা কলকাতার গাড়ি আছে, আর কলকাতার ভাড়া বারো আনা মাত্র। টিকিট কিনে ফিরে এসে

বড় কৌশলে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি কলকাতায় যাচ্চি, বড়ই দরকার; আমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে একটা দরকারী পরামর্শ আর কিছু টাকার ব্যাপারও আছে।

সে বিশ্বাস করবে না, বলে চাষাভূষোর আবার কলকাতায় কাজ কি, তা ছাড়া উকিলবাবুদের সঙ্গেই বা তোর কি কাজ? খবরদার বলচি, মামলায় নামিস নি, ধনে-প্রাণে মারা যাবি। ঐ তো তোর কয়েক বিঘে জমি,—ও খোয়ালে খাবি কি করে? ছেলেপুলে ইস্ত্রি তাদের পথে বসাবি নাকি? এইসব কথা,—থামতেই চায় না। শেষে যখন দেখলাম মহামুস্কিল—এখন এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শেষে খুব চেঁচিয়ে বললাম—শোন শোন, বলতে দিবি আমাকে, না তোর কথাই বলতে থাকবি?

বুঝিয়ে বললাম, তুই এই পাঁচটা টাকা নে, আমার ছেলের হাতে দিবি, ফিরে এসে তোকে আমি খুসী করে দেবো। যা, তুই বাড়ি যা। যাই হোক, কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে গাড়িতে উঠলাম,—টিকিট কেটে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

এখন আর এক দুর্ভাবনা, সেখানে যে হলধর আছে সে কী অবস্থায় আছে? দুজন হলধর একত্র হলে ব্যাপারটি কি রকম যে হবে? মনে নানা কথা তোলাপাড়া করতে করতে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছলাম। স্টেশন থেকে বাইরে এসে বউবাজার থেকে একখানা ধোয়া কাপড়, একটা গেঞ্জি, একটা টুইলের সার্ট—শেষে একজোড়া চটি জুতা কিনে নিয়ে উঠলাম ক্যালকাটা হোটেলে। স্নানের পর ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে বেলা চরটা আন্দাজ হাওড়ায় পৌছে, যে ট্রেনে যাবো ঠিক করে ফেললাম।

বোধ হয় আধঘণ্টা পরেই ট্রেনে উঠলাম।

ভীড় বেশী ছিল না,—দিল্লী একস্‌প্রেসে ইণ্টার ক্লাসে ভাল

জায়গাই পেলাম, বাঙ্কের উপর পুরো শোবার মতই জায়গা। সন্ধ্যার পর শুয়ে পড়লাম। আমার চক্ষে রাজ্যের ঘুম এসে ভীড় করে লাগলো, আমিও ঘুমেও একেবারে অচৈতন্য। কলকাতায় ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, সব ভরপুর, কারো সঙ্গে দেখা করলাম না। যত তাড়াতাড়ি এখন দিল্লী পৌঁছাতে পারি সেই বাসনাই প্রবল ছিল—কাজেই যাতে একটুও দেরী হয় এমন কিছুই করিনি।

হায় হায় ;—ঘুম আমার ভাঙ্গলো। কি সর্বনাশ, আবার সেই হলধরের শয্যায়, তারই শয্যা-সঙ্গিনীর সঙ্গে, আশে পাশে একপাল ছেলেমেয়ে,—শুকনো মুতের গন্ধ। আঃ—হে ভগবান,—কেন মরতে ঘুমোতে গেলাম, না ঘুমোলে হয়তো এসব কিছু হতো না। আর ঘুম নয় ; ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম,—মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লেগে গেলাম, এ কি হলো! এখন কী-ই বা করি? তবে কি আমার মুক্তি নেই, -না—কি এই দীর্ঘ স্বপ্নেরও শেষ নেই। এমন সময় হলধর-গিন্নি উঠলেন—'ওমা, এখনও ঘুমোও নি তুমি সারারাত বসে কাটাবে নাকি? হ্যাঁগা, তোমার হয়েছে কি বলতো?

বোলে তিনি বাইরে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বসলেন আমার পাশে। আমার একখানা হাত বেশ জোর করে ধরে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে বললেন—দেখ তো, কি রকম আছাড়ি পিছাড়ি করতেছে বুকটা, জমিদারের বাড়ি কি কাণ্ডটা করেছো তুমি শুনে কেঁদে মরি। এত টাকাই বা ধার করলে কেন, তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই? তুমি নাকি বাউদের দোবের কাছে একশো টাকা চোটায় ধার করেচ? এ্যাঁ, সুদবে কি করে বলতো? চাষ-বাস তো হয়ে গেল, এখন আমাদের উপায় কি? বলনা, বোবার মত বসে অইলে কেন গো? বলনা, আমার মাথা খেতে অত টাকা নিয়ে কলকাতা গিছিলে কেন?

না রাম না গঙ্গা, আমার মুখ থেকে কিছুই বার করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে সে বেচারা আবার শুয়ে পড়লো। আমি বসেই রইলাম। আর মুক্তির উপায় চিন্তা করতেই মাথা ঘামিয়ে ফেললাম। আমার বুদ্ধি কোনো কাজেই এলো না।

॥ ৮ ॥

তারপর যা হলো বলতে আমার লজ্জা ও সঙ্কোচের কোনো বালাই নেই। খানিক পরে যখন হলধর-গিন্নি নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন,—এই অসহায় অবস্থা ভেবেই আমার চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ ধারা আরম্ভ হলো। কি তীব্র অনুশোচনা এলো আমার অন্তরে তা ভাষায় জানাবার নয়। হে ভগবান! হে দয়াময়, মনে মনে এই সব ভাষায় আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার জীবনে এই প্রথম প্রার্থনা জানালাম,··যথার্থই চক্ষের জলে আজ তাঁর শরণাগত হলাম। কাতর প্রার্থনার কথা শুনেছিলাম, লোকে বিপদে পড়েই করে থাকে, যা বইয়ে পড়েছিলাম, আজ সত্য সত্য তাই নিজে করলাম। জীবনে কখনও এমন করে ভগবানকে ডাকিনি। নিজেকে আর বড়ো মানী লোক মনে হলো না। সম্ভ্রম বা কৌলিন্য—প্রচুর অর্থোপার্জনের সঙ্গেই যার সম্বন্ধ—সে ভাব কোথায় উড়ে গেল। নিজেকে ঐ হলধরের মতই অকিঞ্চিৎকর বরং হলধর বড় সুখী চাষী বোলে, তার সৎস্বভাবাশ্রিত সংসারী মানুষ পরিশ্রমী জীবন, এখন তাকেই যথার্থ মহৎ ব্যক্তি বোলেই মনে হতে লাগল, দিল্লীর সম্ভ্রমের উপর এলো এক ঘৃণা। মনে আছে, শেষে—হে অন্তর্যামী, আমি অতি হীন, অতি মূঢ়, বুদ্ধিহীন, যথার্থই তোমার দয়া পাবার অনুপযুক্ত—আমার কি গতি হবে—আমায় রক্ষা করো, আমায়

সৎপথে মতি দাও। শেষে, অসুরের দম্ভ, অভিমান, আর আমার কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির মোহ—চূর্ণ হোক, আত্মম্ভরিতা কিছু যেন আর না থাকে আমার মধ্যে,—এই প্রার্থনা করলাম। সত্যই অনুভব করলাম যে এই হলধরের চেয়ে মানুষ হিসাবে আমি শ্রেষ্ঠ নয়—কখনই নয়। এই পর্যন্তই মনে আছে, তারপর গভীর নিদ্রার কোলে ডুবে গেলাম। মনে আছে—ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না যেন অনুভব করেছিলাম।

অন্য অবস্থায় আমার স্বভাবের এই বিপর্যয় কল্পনারও অতীত ব্যাপার কিন্তু সত্য সত্যই তা ঘটে গেল। প্রকৃতির রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয় আর মনে স্থায়ী ভাব বোলে কিছুই নেই। প্রভাতে জেগে উঠলাম,—এবারে আর স্বপ্ন নয়, সাজাহান রোডের বাংলোর মধ্যে নিজ শয্যায় শুয়ে যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গলো। তখনও ভাগবতী প্রভাব আছে। জেগেছি মাত্র, চক্ষে যেন জল এখনও আছে। মনে মনে ভয়ও আছে যে আবার এটাও বা পাছে স্বপ্ন হয়ে যায়—আবার হলধরের সেই মশারীর ভিতর বিছানার মধ্যেই বা ফিরে যেতে হয়। অনুতাপে আমার সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, মনে আমার এই ভাব! কি নির্মল আনন্দ! জীবনে এই প্রথম উপভোগ করলাম। যেন নতুন জন্ম হলো আমার।

প্রথমে এলো আমার মেয়ে মীরা,—সে এসে বলে কি বাবা, আজ কেমন আছ! সত্যি! তোমায় যেন অনেকটাই সহজ দেখচি,—কি হয়েছিল বাবা? উত্তরে বললাম,—কি সব হয়েছিল আমায় বলতো শুনি! মেয়ে বলে—গত কাল থেকে তুমি আর ঘর থেকে বার হওনি, বিছানায় শুয়েই আছ, জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলোনি,—জল ছাড়া কিছু খাওনি, কারো সঙ্গে কথা কওনি,—কি হয়েছিল বাবা?

ভাবলাম, বেচারা হলধরেরও তাহলে বড় কম দুর্ভোগ যায়নি তো! হা ভগবান!

তখন আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, সেই উপাধ্যায় আর্টিস্ট মশাই এসেছিলেন কি ইতিমধ্যে? মীরা বলল,—হ্যাঁ বাবা, রবিবার তিনি আসেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তুমি কেবল তাকে দেখলে, পরিচিতের মতই কথা কইলে, তারপর আমায় বললে, এখন আমি একটু কথা কইব আড়ালে। তাই আমি চলে এলাম। কতক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন। আজ তোমার কাছে আসবার সময় দেখি তিনি এসে বাগানে একটা বেঞ্চে বসে আছেন—

শুনেই মীরাকে বললাম, যা, এখনি তুই তাকে ডেকে নিয়ে আয়,—যেন চলে না যান আমার সঙ্গে দেখা না করে।

*　　　　*　　　　*

মিঃ ডাটের সঙ্গে যার অস্তিত্ব বিনিময় ঘটেছিল, এখন সেই নিরীহ ধর্মভীরু পল্লীবাসী কৃষক হলধরের কথাও আছে; সেটি না জানলে, বিধাতার আসলে খেলাটি ধরাই যাবে না।

তার কি হয়েছিল?

একটু আগের কথা,—সংক্ষেপে এই যে—চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত, ডায়মণ্ড হারবার বা হাজিপুর মহকুমার মধ্যে কুলপী থানাব অধীনে বাকুলে চাঁদপুর একখানা গ্রাম; সেখানে উমাচরণ আর হলধর দুই ভাই। উমাচরণ ছিল গ্রামের মোড়ল বা প্রধান;—হরিসভার-সভাপতি। সকল কাজেই গ্রামে তার ছিল অসাধারণ প্রভাব আর প্রতিপত্তি। প্রথমে অনেকদিনই হলধর দাদা উমাচারণের সঙ্গে একই সংসারে ছিল; কিন্তু বিবাহের পর থেকেই কেমন একরকম হয়ে গেল; শেষে স্পষ্টই বললে—দাদা আমার ভাগের যা-কিছু সব বুঝিয়ে দাও, আমি আলাদা হবো। উমাচরণ

বিচক্ষণ মানুষ, গ্রামের জমিদার আর ভিনগাঁয়েব সম্ভ্রান্ত কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডেকে হলধরের যা তার প্রাপ্য, জমিজমা, বাগান পুকুর, ঘর-দোর, বাসন-কোষণ—সব কিছু ভাগ কবে দিলে, এমন কি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের মাঝে পাঁচিলও উঠে গেল,—তখনই যথার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন সংসার হ'লো তাদের। এর মধ্যে তিলমাত্র অসদ্ভাব জন্মাতে পারেনি,—সবাই জানে, সেটা উমাচবণের গুণে আব হলধরেব দাদার উপব অসাধারণ বিশ্বাসেব ফলে সম্ভব হয়েছিল। দুই ভাই, সন্ধ্যাব পব হরিসভায় কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে অনুপস্থিত থাকেনি। এই ভাগাভাগির পর প্রায় আট বৎসব কেটে গেছে। হলধবেব এখন দুটি ছেলে-মেয়ে হয়েচে। তার অবস্থাও খাবাপ হতে আবস্ত হয়েচে, বিশেষতঃ গত দুই সন অজন্মা, জমিদারেব খাজনা বাকী, তিন বৎসব হতে চললো। এই সব কারণে হলধরেব উদ্বেগের সীমা নেই।

একটা কারণে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। এই সেদিন জমিদার সবকাব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেদিনই মেজবাবু গ্রামেব অনেকগুলি প্রজাকে কাছারীতে ডেকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, লাটেব কিস্তির সময়, সবকাবী খাজনা মেটাতেই হবে, না হলে তাঁদের তালুক আসচে মাসেব শেষ তাবিখে নিলামেই উঠবে। সুতরাং যার কাছে খাজনা যা পাওনা আছে তা মিটিয়ে দেওয়া চাই। এখন যেমন করে হোক অর্দ্ধেকটা চাইই। হলধবেব প্রায় আড়াই তিন বছবেব খাজনা যাকী—সে জানে তাব বিপদ কেমন। এখন পাঁচজনেব সঙ্গে তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে সামনের ববিবাব দিন অর্দ্ধেক টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে আসবে। এখন মান বাঁচাতে তাকে যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে। এই তার বিপদ।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। সেই দিন থেকেই হলধরকে

ভাবিয়ে তুলেচে। সে কিছু জমি বাঁধা রাখতে বস্তিপুরে মোড়লদের কাছে গেল। সেখানে সুদের বহর দেখে সে ফিরে এলো; এই সুদে তার ঐ জমি চলে যাবে যদি দু বছর দিতে না পারে। তার চেয়ে বিক্রি করাই ভালো। কিন্তু যে জমি কিনবে সে বলে চার চার কিস্তিতে টাকা দেবো। কিন্তু তাতে খাজনার টাকা সম্পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা অর্দ্ধেকও হয় না। এই ভাবে বৃহস্পতি, শুক্র দুদিন কাটলো। শনিবার সকালে উঠেই ভিনগাঁয়ে এক বড় ঘর কুটুমের কাছে গেল। তারা আমলই দিলে না,—একরকম অপমানিত হয়েই ফিরে এলো। তাছাড়া আট ক্রোশ পথটা যাওয়া আসাতেই দিনের তিন প্রহর গেল। এই দুদিন সে হরি-সভায় ঠিকই হাজির হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই নামে যোগ দিতে পারেনি। তার ভরাট গলা, দোয়ার গাইতো—খোলও সে ভাল বাজায়, কিন্তু এই গত দু'দিন সে ভাল করে গাইতে পারে নি, খোলেও তার হাত পড়ে নি। অবশ্য সবাই বুঝেছিল তার মনের অবস্থা, কিন্তু কারও হাত ছিল না এতে, তাই কেউ কিছু বলেনি। সেও কাকেও কিছু বলোনি, মর্মের দুঃখ মর্মে মর্মে ভোগ করেই চলে এসেচে।

আজ এই শনিবারে তার ছটফটানিটা বেড়েই গেল, সে যেন আর সামলাতে পারে না, এমনই তার মনের অবস্থা।

আজ বাদে কাল রবিবার, জমিদারের লোক অর্থাৎ পাইক টাকার তাগাদায় আসবে আর ধরে নিয়ে যাবে, আপনি না গেলে। কিন্তু তার টাকা কোথা? সে আশপাশের গ্রামে তো কোথাও বাকী রাখেনি সন্ধান করতে।

একবার সে উমাচরণের কাছেও কথাটা তুলেছিল। স্নেহ থাকলেও উমাচরণ ঘাড় পাতলে না, কারণ তাকেও দুশো টাকার একটা কিস্তি এই সময়েই দিতে হবে। তার জমি জমা বেশী, তাই

তাকে দিতেও হবে বেশী। বিশেষতঃ এই দুর্বৎসর শুধু তো হলধরের একলার নয়, গ্রামের বোধহয় প্রত্যেক চাষীর একই হাল। এই সূত্রে অনেকের ঘব দোর বাঁধা বন্ধকও পড়েচে। হলধরও তো নিজ অংশের বাগান, জমি বাঁধা দেবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কে বাখবে,—গ্রামেব মধ্যে ধনবান কোথা। সামান্য রকম ধন সংগ্রহ যাদেব আছে তাবা শুধু হাতে তো কেউ টাকা দেবে না। মহাজন বলে—গ্রামের তিন চাব জনের ভিটে বন্ধক বেখে তো টাকা দিয়েচি আর কত দেবো,—আমাব আর টাকা নেই।

সন্ধ্যায় সে দিন কীর্তনে গেল হরিবাসবে সবাই যেমন পূর্ণ উৎসাহে সেদিন গাইলে হলধরও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রাণ ভ'রে হরিনাম কবতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই পুরো মন লাগাতে পাবলে না। তখনই মনে মনে সে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে টাকাব চিন্তাব ভারে মনটি তাব হরিব কাছে পৌঁছতে পাবছে না। যাই হোক, গান ভেঙ্গে গেল। সকালে কি হবে যখন পাক্ এসে তলব করে বাবুদের আটচালায় নিয়ে যাবে - এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বেরুলো। কিন্তু আব তো পারে না সে, যেন অবসন্ন হয়ে আসছে তার শরীর।

একবার ভাবলে আর ঘবে যাবো না, যে দিকে দুচক্ষু যায় চলে যাই;—সকালে গ্রামের কেউ আমায় দেখতে না পায়। কিন্তু তা হলো না। শেষ অবধি, ছেলে পুলে, স্ত্রী নিস্তারিণীর কথা মনে করেই সে ঘরে ফিরলো। তারপর দুটি ভাত খেয়েই,—শোবার ঘরে ঢুকলো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শেষ আশ্রয় শয্যা। আর সে ভাবতে পারে না। যে নামটি নিয়ে সে রোজ শুয়ে পড়ে আজও সেই শ্রীহরি বলেই, তাদের ঘরজোড়া তক্তার উপর ছেলে-মেয়ে ভরা বিছানাতে এক ধারে সে শুয়ে পড়ল, আর অচিরেই বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে মগ্ন হয়ে গেল। সে এখন সত্যই

শান্তি লাভ করলে। কাল সকালে কি হবে সে তার শ্রীহরিই জানেন।

সংসারে সে একলা নয়, তার স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গিনী সে তখনও হেঁসালে, রাতের দিকেও তার কাজ কম নয়,--সংসারের সব কাজ সেরে প্রায় দেড় প্রহর রাতে নিস্তারিণী এসে তার পাশে শুতে এলো। একবার ভাবলে মিন্সেকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করে নেয় যে সারা দিনে সে কি করলে, টাকারই বা কি হলো। কিন্তু অসহায় হলধর এমনই অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে, তার মুখ দেখে আর জাগিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্তি হোলো না। সারা দিনেব ক্লান্তি তারও কম নয়, কাজেই সেও অচিরে সুপ্তির কোলে ডুবে গেল।

* * * * *

শ্রীহরি বলে হলধর রোজই ভোরে ওঠে। আজও যথাকালেই তার ঘুম ভাঙ্গলো। শ্রীহরি বোলেই সে উঠলো,—কিন্তু একি? শ্রীহরির একি খেলা? স্বপ্নই দেখচে না কি? এখনও কিছুই ঠিক বুঝতে পারচে না প্রথমটা সে যেন স্বপ্নই দেখচি মনে করলে বটে, কারণ এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা তো জীবনে কখনও দেখেনি। মশারী নেই, পালঙের পুরু গদির উপর বিছানায় ধপধপে চাদর পাতা, ঝালরওয়ালা বালিশ মাথায়। সঙ্গে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, একাই সে এক পরিপাটি শয্যায় শুয়ে। কোথায় তাদের খড়ের ছাওয়া চালের ঘর, মাটির দেওয়াল? এ যে ইমারৎ—প্রকাণ্ড ঘর, দেওয়ালে ছবি, ফটো-বাঁধানো, আয়না, দেরাজ আলমারি দিয়ে সাজানো চেয়ার-টেবিলের উপর ঘড়ি, ফুলদান। বড় লোক জমিদারদের ঘরের মত, এ কোথায় এসে পড়লো সে? হে ভগবান,—হরি হরি!

এ কি কাণ্ড? এখনও স্বপ্ন! গত কাল তো টাকা টাকা করে সারাদিন আধমরা হয়ে ফিরেচে। হরিসভা থেকে একপোর রাতে

এসে যখন ঘরে ফিরেছিল তখন আর শরীরের মধ্যে সাড় ছিল না।

শুয়েছিল তক্তার উপর ;—তার গা-সওয়া সেই দুর্গন্ধে ভরা কাঁথাব বিছানায়, –আর বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়েই তো শুয়েছিল। তাই তো তার অভ্যাস চিরদিনেব। সে বিছানাই বা কোথা, সে ঘরই বা কোথা ? এ কোথায় এসে গেল সে ? টাকা টাকা করে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তাব ?

নাঃ, এটা তার স্বপ্নই,—না হলে বস্তুতঃ এ সব কি সম্ভব তাব ঘরে ? স্বপ্ন মনে হলেও সে শুয়ে থাকতে পারলে না নিশ্চিন্ত হয়ে, উঠে বসলো সে। চারদিকে চেয়ে দেখছিলো—এমন সময় খস্ খস্ খস্—সানের মেজেতে চটি ঘষে ঘষে চললে যেমন শব্দ ওঠে সেই শব্দ, কাছেই আসতে লাগলো, –সে আবার শুয়ে পড়লো, তবে চক্ষু না বুজে। দরজা তো খোলাই ছিল,—একটি সুন্দব ফুটফুটে মেয়ে, পোনের ষোল বছর বয়স, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী—পান পানা মুখ,—একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো,—একবারেই হলধরেব মাথার শিয়রে খাটের বাজুর উপর দুটি হাত রেখে দাঁড়ালো, আব,—বাবা ! বোলে ডাকলো,। মিষ্টি গলার স্বর। যেন লক্ষ্মী মূর্তি মনে হলো হলধরের। আর ঐ বাবা ডাকটি শুনে প্রাণ তার আনন্দে যেন দুলে উঠলো। তারও মা বোলে একবার উত্তর দিতে ইচ্ছা হলো ; কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করেই রইলো।

কি হয়েছে, বাবা—বোলে মেয়েটি তার কপালে হাত দিলে, যেন তাপ আছে কিনা দেখলে,—তার শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সে কথা বললে না বটে কিন্তু মনে মনে ভাবছিল,—মেয়েটা বোকাই বটে, না হলে এই দিনের আলোয়, আমার মত এই চাষার মূর্তি দেখেও বুঝতে পারলে না যে আমি তার বাপ হতেই পারি না। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ও যেন বলতে চাইলে,—

বোকা মেয়ে—দেখ্‌তো আমার মুখটা একবার ভাল করে, এটা কি তোর বাপ ?

মেয়ে বলতেই লাগলো—আমায় বলনা কি হয়েচে তোমার আজ এখনো উঠচো না কেন ? নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ।

হলধর এবার একটু আশ্চর্য বোধ করে। মাথার চুলে, যেমন কিছু ভেবে দেখবার বেলা করা অভ্যাস, একবার আঙ্গুল চালিয়ে দিতে গেল, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল যখন দেখলে মাথায় তার ঘন কাঁচা পাকা চুলের রাশ তো নেইই তার জায়গায় মাথা ভরা টাক্। তারপর নাকের নীচে আঙ্গুলগুলি চালিয়ে বুঝে নিলে যে তার সে গোঁফও নেই, দাড়িও তার কামানো পরিষ্কার, যেন কালই কামিয়েচে অথচ সে পোনরো দিন ক্ষৌরী হয়নি—তাইতো, তাহলে তো ও আমার মধ্যে বাপের মুখই দেখচে। আমার মধ্যে ওর বাপের মূর্তি এলো কি করে! তাজ্জব ব্যাপার, হে হরি, এ তোমার কি খেলা, এঁ্যা, তাহলে আমার কি হলো ?

নিরুত্তর দেখে মেয়ে বলচে, বাবা, ডাক্তার মৈত্রকে খবর দিচ্চি। নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। না হলে,—

এবার হলধর চেঁচিয়ে বললে,—না না, না না,—আমার কিছুই হয়নি, আমি ঠিকই আছি।

মেয়ে বলে, শরীর তোমার নিশ্চয়ই খারাপ, না হলে ভোরে যার সবার আগেই ওঠা অভ্যাস, এখনও সে ওঠেনি কেন ? তোমার দৃষ্টিটা ওরকম কেন ?—বলতে বলতে চলে গেল দ্রুতপদে,—বারান্দায় গিয়ে কর্‌র্ কর্‌র্ কর্‌র্, যন্ত্রে কি করলে ; তারপর বলতে লাগলো—হাঁ, আমি মীরা, মিঃ ডাট্-এর এখান থেকে বলচি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরই বাড়িতে বেশ হৈ হৈ চলতে লাগলো।

এই ভাবে বাড়ির কাণ্ড,—তারই মধ্যে হলধরের স্বপন দেখাও

চলতে লাগলো। অধৈর্য হয়ে আবার ভাবে, এ বাবা স্বপন যে ভাঙ্গবার নামও করে না,—কি বিপদ—হে হবি!

অল্পক্ষণেই সাহেবী পোষাক, চক্ চক্ কবচে বক্ষযন্ত্র নিয়ে ডাক্তার এলো,—এই যে মিস্টাব ডাট্—সম্বোধন কবে বলে,—ব্যাপাব কি বলুন তো দেখি। হলধব বললে, আমাব তো কিছুই হয়নি ডাক্তারবাবু। এই বাবু শুনেই ডাক্তার কি একবকম কটোমটো চেয়ে রইলেন, আব যন্ত্র দিযে পবীক্ষাও আবম্ভ কবলেন। শেষে বললেন, কৈ কিছুই তো দেখচিনা, বেশ চলচে সব। ওঁর মনে একটা কিছু হয়ে থাকবে।

তাইতো, কি কবা যায়—কি কবা যায, বলতে বলতে হোঁৎকা ডাক্তাব সায়েব বাইরে গেলেন।

কত বকমের কত ভাবনাই যে হলধরের মাথার ভিতব দিযে চলতে লাগলো তাব শেষ নাই। এ সবটা কি স্বপ্নই চলচে। ভগবানই জানেন, এতক্ষণ তাব ঘরে কি হচ্ছে। কোথাও কোন কুলকিনাবা না পেয়ে শেষে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসলো, যা হবার তাই হোক। আমি কি কববো, হে হবি!—দয়া করে এ স্বপন ভাঙ্গিয়ে দাও, -যা অদৃষ্টে আছে তাই হোকনা আমাব। আবার ভাবচে, এই স্বপন ভাঙ্গলেই তো জমিদার বাবুদের খাজনার টাকা দেবাব দায়ে পড়তে হবে, টাকা তো কোনরকমেই জোগাড় হয়নি। দেবাব সাধ্য যখন নেই, তখন চলুক না, এমন বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ কাটে, স্বপ্নেই কাটুক, - শ্রীহরিব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হলধর বিছানা ছাড়লো না।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটবার পব, মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, বাবা—সেই উপাধ্যায়বাবু এসেচেন, আমি তাঁকে নিযে এসেচি তোমার কাছে। বলতে যাচ্ছিল হলধর,—কে উপাধ্যায়? কিন্তু তাকে কিছু বলতে হলো না, দরজায় দেখলে এক দীর্ঘশরীর,

মাথায় টুপী এক মূর্তি উপস্থিত। বাঙ্গালী কি কোন্ দেশের লোক বুঝবার যো নেই। তবে মুখখানা দেখেই মনে হলো তার যেন অতি পরিচিত—সে যেন অনেকবাবই দেখেছে তাকে।

আরে, এ যে আমাদের অপুবাবু, না? যেই মনে হওয়া, ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বোসলো হলধর। হাঁ, ঠিক যেন সেই মুখই। আমাদের গ্রামের জমিদারবাবুদের ভাগনে—অপুবাবু। —ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচি—এ না হয়ে যায় না। মাথায় গান্ধিটুপী, তাই প্রথমটা ঠিক ধরতে পারিনি।—তার পরই তার মাথায় এলো—মানুষের মত মুখ মানুষের তো হয়, দেখাই যাকনা, যদি আমায় চিনতে পারে তাহলেই বুঝা যাবে। হলধর তখন মেয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমরা একটু কথা কই তুমি এখন যাও। বাপের মুখে এভাবের কথা শুনে মেয়ে অবাক হয়ে চলে গেলো।

হলধর বড় ব্যাকুল হয়েই তখন বললে, আপনি বলো বাবু আমি কি স্বপ্ন দেখচি; আপনি কি অপুবাবু? উপাধ্যায় তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, তার পর বললে—মিষ্টার ডাট্, আপনার কি হয়েছে বলুন তো; কাল রাত্রে আমি এসেছিলাম। যাবাব সময় লিখে রেখে গিয়াছিলাম, পান নি?

হলধর বললে, আমায় আপনি কি বলচেন বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ, তার পর আমায় চিনতে পারচেন না. আমি যে হলোধর—আপনার মামাদের গেরাম চাঁদপুরের পেরজা, উমাচরণ মোড়লেরই ভাই।

এবার মহা বিস্ময়ে উপাধ্যায় অনেকক্ষণ হলধরের দিকে চেয়ে থেকে শেষে বললেন,—আমি কিছু না বুঝলেও একটা কথা তোমায় বলচি শোনো,—দেখো, কাকেও এখানে তোমার ঐ পরিচয় যেন

বোলো না। আমায় যা বললে তা বললে,— আর কাকেও কখনও যেন বোলো না, মহা অনর্থ ঘটবে।

তখন হলধর প্রাণের সব কথাই খুলে বলতে লাগলো—

কাল কোথায় ছিল, আজ ঘুম ভাঙ্গলো এই বিছানায়। কাতর-কণ্ঠে বললে, আচ্ছা বলো তো, আপনি আমাদের অপুবাবু কি না? এখন আমি কি করবো আপনি আমায় বোলে দাও সব। তিনি বললেন, আমি কে, তোমাদেব অপু কি না, সেকথা চাপা থাক এখন—তোমার কথা যদি সবাইকে বলো তা হলে তোমায় ভূতে পেয়েচে ধরে নিয়ে রোজা এনে মারপিট করে ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করবে। এটা দিল্লী সহর হলেও ওদেশের মত ভূত প্রেতের ব্যাপার আছে সবই। শুনে হলধর বলে, এঁ্যা। এটা দিল্লী, রাজধানী, —আমি ভেবেছিনু কলকাতা হবে। আমি এখানে এনু কি করে?

উপাধ্যায় বললেন সে যাই হোক, যে ব্যাপার ঘটচে, তাতে দিল্লীই বা কি আর কলকতাই বা কি? তোমার পক্ষে এখন চুপচাপ থাকাই দরকার। খাও দাও আর মনে মনে ভগবানকে কেবল ডাকো, প্রভু! এ তোমার কি খেলা, আমি কি অপরাধ করেছি যাতে এই অবস্থা হয়েছে;—তিনিই যা করবার করবেন। যা বুঝেছি, তোমাদের দুজনকে নিয়েই খেলাটা চলছে।

হলধর বলে—দুজন আবার কে হলো, ঠাকুর?

তুমি একজন আর যার দেহের মধ্যে তুমি এখন রয়েচ। তিনি হয়তো সেখানে তোমার দেহ আশ্রয় করেছেন। মনে রেখো, এসব উপরওয়ালারই খেলা, কারো কিছু করবার নেই। চুপ চাপ থাকো, দেখনা কি হয়। মজা আছে। শেষ অবধি, চেয়ে চেয়ে দেখো— আর থাকো।

যখন শুনলেন যে হলধর সকাল থেকে ওঠেনি—মুখ হাত ধোয়নি তখন তিনি পাশের দরজা খুলে ঘরের পাশে যেখানে সব

কল প্রভৃতি আছে দেখিয়ে দিলেন,—সে সব দেখে হলধর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। উপাধ্যায় যাবার সময় বলে গেলেন—আমি কাল আবার আসবো। এখন হলধর অনেকটাই সহজ হতে পারলে,—ভাগ্যে উনি এসেছিলেন।

খানিক পরে চাপকান পরা মাথায় পাগড়ি খানসামা চা, জলখাবার সব নিয়ে এলো। এই ম্লেচ্ছ সাহেবী খানা খাওয়ার ব্যাপার, হলধর ছুঁলোনা, ও সব কিছুই খেলেনা। যখন সব কিছু, সেই খানসামার পো উঠিয়ে নিয়ে গেল তখন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক পেট জল খেয়ে এসে আবার শুয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলে, এ যেন তার একটা অসুখের পালাই চলেছে। ভিতরে তার যথেষ্ট ভয় ছিল এই ভয়ঙ্কর ওলট পালটের জন্যে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার জীবনে কেউ দেখেছে, না শুনেছে। রাতারাতি, কোথা বাঙ্গলা মুলুকের অজ পাড়া গাঁ থেকে কোথা এই রাজধানী দিল্লী সহরে, এমন এক বাগানবাড়ির ভিতরে সাহেবীয়ানায় সাজানো ঘরে সে এলো কি করে আর একজনের শরীরের মধ্যে? ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব আমরা কি করেই বা বুঝবো, মুখ্যু সুখ্যু লোক একজন পাড়াগাঁয়ের চাষা। এই সব নানা রকম ভাবনায় সে দিনটা কাটলো। এক একবার দেশ ঘরে কি কাণ্ড হচ্চে ভাবতে থাকে, কিন্তু কিছুই পায়না ভেবে।

এইভাবে সারাদিন বিছানায় কাটলো শুয়ে বসেই। দিনের মধ্যে কত লোক এলো তাকে দেখতে; কত কত ইংরাজী বাং—কত রকমের সম্ভাষণ শুনলে। তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে দেখলে—সবাই সায়েবী পোষাক পরা। বাঙ্গালী কেবল ঐ উপাধ্যায়, অপুবাবুর মত যাকে দেখতে, সেই-ই ধুতি, পিরান চাদর গায়ে এসেছিল। এ এক রকমের মেলা—এই সব বন্ধু লোকের মুখ দেখতে, কথা শুনতে শুনতেই তার কাটলো।

রাত্রেও আর একবার পেট ভবে জল

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাব যেন ক্রমে অসহ্য হয়ে এসেছে, আর যেন সে পাবে না। রাত্রে ঘবেতে বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো, কলকতায় সব বাবুলোকের বাড়ি যেমন জ্বলে। এখানেও আছে, সেই দেয়ালে বোতাম টিপেই আলো জ্বালানো। এইভাবে কত কি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। এক ঘুমেই বাত কাবাব কবে যখন সে জাগলো;—তাদের সেই দেশেব ঘবে, বিছানায় সেই গন্ধই লাগলো। ভয় সে চক্ষু বুজেই বইলো, পাছে যদি আবার স্বপনেব দিল্লীর ঘর বিছানা দেখতে হয়।

চোখ বুজে শ্রীহবি, শ্রীশ্রীহবি। জপ কবতে লাগলো।—হে হরি, এ কোন্ কর্মের ফল। ক্রমে দরদর ধাবা তাব চক্ষু দিয়ে গড়াতে লাগলো; চক্ষেব জলে এখন তাব প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। এবার সে চোখ চাইলে। ঐ যে নিস্তার, তার ছোট মেয়েটিকে আগলে শুয়ে আছে. পাছে শিশু খাট থেকে প'ড় যায। শ্রীহবি বোলে সে উঠে বসলো হাতখানা বাড়িয়ে নিস্তাবেব গায়ে বাখলে। নিস্তার চেয়ে দেখলে, বললে—ওমা, মবণের ঘুম আমাব হয়েচে, এতটা আলো হয়েচে আমায় ডেকে দাওনি? কাঁদছিলে নাকি?

এখন তার ধড়ে প্রাণ এলো। এই পর্যন্তই—হলধবেব কথা।

এখন শেষের কথাটুকুও হয়ে যাক:—দিল্লীব সাজাহান বোডে মিঃ ডাটের সেই বিচিত্র বাংলোতে। সেখানে আজ প্রভাতে আমি মিঃ ডাট্, গভর্মেণ্ট অফিসাররূপেই জেগে উঠেছি মেযেব সঙ্গে কথা হচ্ছিল,—সেই উপাধ্যায় দেখা কবতে এসেছেন। আগ্রহ ভবেই আমি তাঁকে নিয়ে আসতে বললাম।

উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়েই বইলো। শেষে বললে, কি ব্যাপাব! আজ কেমন আছেন? আমি বললাম, যদি বলি ভালো আছি তাহলে কি বুঝবেন? একটু হেসে উপাধ্যায়

বললে, তাহলে বুঝবো এখন বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করেই নিজস্থানে এসে গিয়েছেন ; আর সে বেচারাও—

মেয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনচে দেখে আমায় বাধা দিলেন মিঃ ভাট্। তিনি মেয়েকে বললেন, চায়ের ব্যবস্থা করো তো মা, এঁর জন্যে।

মেয়ে বললে, তোমার জন্যেও আনতে বলি? আজ পর্যন্ত মুখে কিছুই দাওনি। তাই বলো,—বোলে মেয়েকে সরিয়ে দিলাম—তার পর উপাধ্যায়কে সুধালেম—এ কী রহস্য বলুন তো আপনি যেন জানেন মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি আপনার চেয়ে বেশী কিছুই জানিনা। শুনেই আমি বিছানা থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম ;— আপনি চক্ষু খুলে দিয়েছেন—আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোনো মালিন্য নেই, আমি এখন ঠিকই বুঝচি,—

বাধা দিয়ে উপাধ্যায় বললেন,—কিছুই বোঝেন নি,—এ সব সাধারণের বোধগম্য হবার কথাও নয়, আপনি বুঝবেন কি করে? এসকল ব্যাপার কি শিক্ষিত অহং সর্বস্ব ব্যক্তি, আধিপত্য-প্রিয়, সম্ভ্রান্ত নগরবাসীরা বুঝতে পারে? এ একটা খেলা,— তাঁরই খেলা। তিনিই বোঝেন, আমাদের সাধ্য নেই এর মধ্যে প্রবেশ করি। তবে তিনি করুণা পরবশ হয়ে যদি কাকেও বুঝিয়ে দেন কেবল সেই-ই বুঝতে পারবে। নিজবুদ্ধিতে' কেউ কিছুতেই পারবে না ; তখন আমি বললাম, আপনি কি বুঝেচেন বলুন না ; —তাইতে তিনি যা বললেন, আমি বুঝলাম।

আপনাকে ও হলধরকে নিয়েই খেলাটা হলো। এতে হয়তো দুজনেরই একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হবে। দুটি জীবন নিয়ে খেলা, আপনার শরীর-মধ্যে হলধরের জীবন, প্রাণ, চৈতন্য যাই বলুন আর হলধরের শরীর-মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে

নিয়েই এক দিন-রাত খেলা হলো ; তারই মধ্য দিয়ে পরমাত্মার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো সে গুহ্য আর কারো জানবার কথা নয়।

আমি বলিলাম, আপনি তো বেশ সহজেই এটা বোলে গেলেন কিন্তু আমি ভাবচি এ কি করেই বা সম্ভব, বিশ্বাস হয় না।

কি করে বিশ্বাস হবে? আপনার নিজের অধিকৃত জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের অহংকার, সেই গতানুগতিক ধারায় ভাবাই অভ্যাস, এই গভীর, বিচিত্র-রহস্যময় ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করবেন কি করে? এ তো সাহেবেরা কেউ বলেনি,—কি করে বিশ্বাসই বা হবে? এখন যে কাজটা হয়ে গেল—আমরা তার কিছুই জানিনা। তবে এ নিয়ে বন্ধু-সমাজে আলোচনা যেন কদাচ করবেন না, কেউ বিশ্বাসই করবে না। এ সব ব্যাপার মানুষের স্বার্থ চিন্তায় মসগুল বুদ্ধি দিয়ে ধরা যাবে না।

সে কথা যাই হোক. এখন আমি যে বাকুলে চাঁদপুর গ্রামে কালকে সকাল থেকে যে সব কীর্তি করে এসেছি তা আগাগোড়া সব কিছুই নিখুঁত বললাম। শুনে উপাধ্যায় চমকে উঠলেন, বললেন,—

এ সবই তাঁর ইচ্ছায় ঘটেছে, খেলাটা এখনও শেষ হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। এখন ঐ বেচারা হলধরকে আপনাকেই বাঁচাতে হবে। দরোয়ানের কাছে চোটার সুদে আশী-নব্বই টাকা ধার করা মানে এ জীবনে হলধরকে তা শোধ করতে হবেনা। এখন উপায়?

সে উপায়ও ভগবানের কৃপাতে সহজেই হয়ে যাবে, দত্ত বললে।

—এখন উপাধ্যায় বলে চললো—এমন খেলা একজনের মহা-ভাগ্যেই দেখা যায়। তাঁর অপরূপ—

বাধা দিয়ে বললাম, এতে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো—বুঝেছেন কিছু?

তাঁর যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো তা যথার্থ বুঝেচেন আপনারা দুজনেই, যাদের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি খেলেছেন। আপনি কি বুঝতে পারেননি এতে আপনার কি উপকার হলো? তেমনি সেই হলধর মোড়লও ঠিক বুঝতে পারবে তার কি হলো। তবে আমি এইটুকুই দেখছি, বিধাতাব ইচ্ছায় হলধরের দুর্ভোগটা আপনার উপর দিয়েই হয়ে গেল।

কথাটা শুনেই আমাব প্রাণের ভিতরটা এমনভাবে তোলপাড় করতে লাগলো যেন বাষ্প হয়ে চোখ ঠেলে বেবোতে চায়। আমাব দম্ভ, অহঙ্কাব, পদগর্ব চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা কাকেও তো বলবার নয়। বেচারা হলধর, তার কি হলো -

শিল্পী জিজ্ঞাসা কবলে কি ভাবছেন?

বললাম, ভাবচি হলধরকে উদ্ধাবের কথা;--তাকে ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত করাই এখন আমার প্রধান কাজ আর সেই ব্যবস্থাই করবো আমি এখনই,

কি করবেন?

বললাম, সে ভেবেছি, আগে দেবেব টাকাটা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ কবব।

তারপর?--

তারপর তাকে এখানে আনিয়ে দিনকতক তাতে-আমাতে থাকবো, দুজনে আমরা আত্মীয় হয়ে গিয়েছি যে।

সে যদি না আসতে চায়?

তাকে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, এই সব তীর্থ দর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলেই সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে রাজী হবে। সুশৃঙ্খলায় তার ঘর-সংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে—এই রকমই একটা প্রেরণা অনুভব করছি।

আর আমার ব্যবস্থাটা কি হলো?

আপনি তো আমাদের এখানে এসেই যাচ্ছেন। নিজের কাজ করবেন আর অবসর হলে আমাদের দুজনের মাঝে থাকবেন—আপনার তো জানাই আছে সব, কেবল আর কাকেও বলবেন না এইটুকুই অনুরোধ।

দত্ত সাহেব ব্যবস্থা করলেন চমৎকার। কলকাতায় তাঁর ভাইকে পর্যাপ্ত টাকা পাঠিয়ে সব ব্যবস্থাই করতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না; শিল্পীকে ধরলেন,—আপনাকেই যেতে হবে। দোবের দেনাটা প্রথমেই চুপি চুপি শোধ করে, হলধরের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে তার সংসারের সকল ব্যবস্থাই করতে হবে। চুপি-চুপি তার গৃহিণীর হাতে কর্‌করে দুশো টাকার অধুলি, সিকি, দুয়ানি দিয়ে হলধরকে দু'-মাসের মত ছুটি করে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

আর কারো দ্বারা সহজে এ-কাজ হতেই পারবে না।

যাত্রাকালে বলে দিলেন;—গ্রাম ত্যাগ করে এখানে আসবার পথে কলকাতা থেকে,—ধুতি চাদর কামিজ পাদুকা প্রভৃতি সভ্য-জাতীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করতে যেন না ভুল হয়।

শিল্পী জিজ্ঞাসা করলেন; সবচেয়ে সুবিধা হবে, এখানে হরিসভা আছে। হলধরের ভরাট গলা, দোয়ার ভালো; আর খোলে সিদ্ধহস্ত। এমন খোল-বাজনা প্রায় শোনা যায় না।

* * * *

হলধর এখন দিল্লীতে।

বিধাতার বিধানেই পরামর্শ মত সব কিছুই সুসিদ্ধ হয়ে গেল।

হলধর আর সেই গ্রাম্য কৃষক নয়, বাহুল্যতা বর্জিত ভদ্র বেশে এই দত্ত সাহেবের সাজাহান রোডের বাংলোতে গেষ্ট-রুমে স্থান পেয়েচে এবং যথারীতি টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। এমন কি এটাও সে বুঝেচে, দত্ত সাহেবের সংসারে টেবিলে খেলেও আর হিন্দু বাবুর্চি রান্না-বান্না করলেও অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া হয় না।

সাহেবি পোষাকে থাকলেও দত্ত সাহেব ধার্মিক হিন্দু, হরিসভার প্রধান কর্তা, সভাপতি, তাছাড়া কালীবাড়িরও একজন কর্তা ব্যক্তি। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনেরও একজন মুরুব্বি। দত্ত সাহেবের সঙ্গে সে ইতিমধ্যে এখানকার নানা স্থান দেখে এসেছে। এখন দত্ত সাহেব ছুটির দরখাস্ত করেছেন, বৃন্দাবন মথুরা প্রয়াগ কাশী হরিদ্বার তীর্থ হলধরকে ঘুরিয়ে আনবেন। বেশ একটা স্নেহের সম্পর্ক জমে গিয়েছে হলধরের সঙ্গে। শিল্পীও অনেক সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকেন, বেড়ান। হলধর শিল্পীকে অপুবাবু বলেই ডাকে, যেহেতু মামার বাড়ির নাম তাঁর ঐটাই।

দত্ত সাহেবের যত ঘনিষ্ঠ-বন্ধু,—বড় বড় অফিসার,—বর্তমানে তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নেই। প্রফেসার গুপ্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঠিকই আছে, হলধরের সঙ্গেও তাঁর বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দত্ত সাহেব এখনও সেই সত্তা-বিনিময়ের কথা ভুলতে পারননি। একদিন হলধরের অগোচরেই বাড়ির কম্পাউণ্ডে বাগানেই শিল্পীকে ধরে বসলেন,—

আচ্ছা, কি করে কি হলো,—বলুন তো? দুজনেরই দেহ রইলো যথাস্থানে, বাকী সব কিছুই বদল, এমন অবিশ্বাস্য,—বলতে গেলে 'অসম্ভব ব্যাপারই বা ঘটলো কি করে? এখনকার বিজ্ঞানে এর কোন ইতি—

বাধা দিয়ে শিল্পী বললে, এখনকার এই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, এটা জড় বিজ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্য সত্ত্বা,—Spirit ছাড়া যা কিছু পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে তাই নিয়েই এর কারবার। কিন্তু এদেশেতে বিজ্ঞান যাকে বলে তার মহিমাই আলাদা, তার যা কিছু তত্ত্ব-অনুসন্ধান তা চৈতন্য নিয়েই। এ ছাড়া যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ, তা বিজ্ঞানীরা নাকচ করে দিয়েছেন অর্থাৎ তাই নিয়ে ভারতের জ্ঞানমার্গের পণ্ডিত এবং আত্মতত্ত্ব পিপাসুদের মাথা

ঘামাবার দরকার নেই, কারণ তার মধ্য দিয়ে আত্মিক কল্যাণের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আপনি বলেন কি? এই জড় বিজ্ঞানেই আজ কত উন্নতি। রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ বা রেডিও বেতারের কথা তো এখন পুরানো হয়ে গিয়েচে, কিন্তু এয়ার-প্লেন, হেলিকপ্‌টার, এটম-বম্ব রকেট ইত্যাদি ইত্যাদি—এ সবই তো বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি। দুদিন বাদে চাঁদে পৌঁছাবার কথা; এ সব কি কিছুই নয়?

আহা, অনন্ত আকাশে কতক দূর গতাগতি যন্ত্রশক্তিতে না হয় হলো। অনেক দূর, হাজার হাজার মাইল গতিবেগ, অতি দ্রুত, অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত—এসব তো বাহ্য বা ব্যবহারিক উন্নতি, সভ্যতার উৎকর্ষ বলা যায়। অথবা বহু সহস্র টাকা খরচ করে একটা বোমাই তৈরী হল, প্রকাণ্ড নগর বা জনপদ না হয় ঐ বোমা ফেলে পুড়িয়ে, ধ্বংস করে দেবার শক্তি লাভই হলো কিন্তু তাইতে যথার্থ কল্যাণ যাকে বলে তা কতটুকু হলো? কটা লোকেরই বা কল্যাণ হয়েছে বলুন এ সব কাজে। ধন উপার্জনের ক্ষেত্রে, অথবা ভ্রমণ বিলাসী কিংবা ব্যবসায়ী শ্রেণীর না হয় খানিক আনন্দের খোরাক যোগানো হয়েচে; কিন্তু রোগ শোক দুঃখ-দারিদ্র্যের সমাধান কি হয়েছে কোনো সমাজের? যারা আবিষ্কার করেছে তাদের নিজ নিজ অহঙ্কার যতটা বেড়েছে যতটা কি তার আত্মিক উন্নতি হতে পেরেছে? ব্যক্তিগত প্রবল অহঙ্কার বা জাতিগত অহঙ্কার ছাড়া,—আমাদের জাতির শক্তি বেশী, আমরাই ওদের কাবু করবো, প্রভুত্ব করবো। এখন এই আগ্রহই তো জাতির গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছে, একে কল্যাণ বলেন? তা যদি বলেন তাহলে বলতেই হবে আপনার কল্যাণ-বুদ্ধির গোড়ায় গলদ।

দত্ত বলেন, তাহলে এটাই বোলতে হয় যে আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক কিছু মীমাংসা একেবারেই অসম্ভব।

আচ্ছা। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলচি,—আমাদের সত্বাকে এক শরীর থেকে আর এক শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত বা এই অদল বদল ঘটানোতে কিছু প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান আছে তো?

যেহেতু একটি এটমিক বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে কত প্রক্রিয়া, কত এনজিনীয়ারিং দরকার। একটা মানুষের আরোগ্যের জন্যে আর একজনের শরীরে রক্ত সঞ্চার করতে কত প্রক্রিয়া দরকার হয়;—একজনের হার্ট বা লিভার কেটে আর এক-জনের নষ্ট হার্ট বা লিভার জুড়ে দেওয়া কত প্রক্রিয়ার দরকার,—সেই হিসাবে একটা দেহের ভিতর থেকে তার আসল ব্যক্তিটি বার করে দূরস্থ এক দেহের সঙ্গে বিনিময়ের একটা প্রসেস থাকবে; হয়তো আছেও, কিন্তু সেটা ধরা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আপনার আমার মত সামান্য একজন জীবের বুদ্ধিতে ধারণা করবার মত বিষয়ও এটা নয়। যাঁর সত্তায় এই সারা সৃষ্টিটা জর্জরিত—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত ব্যাপক যে মহাসত্বা, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কোনো প্রক্রিয়া বা কর্মানুষ্ঠানের দরকার আছে নাকি? ইচ্ছামাত্রেই তো সেটি সম্পন্ন হয়ে যায়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই তো পর্যাপ্ত প্রক্রিয়া, মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এর ইতি করতে পারবে কি করে! তিনি যে এই জীব কোটির সঙ্গে নিত্য যুক্ত এই যে পরম সত্যতত্ত্ব—এইটিই ঠিক ধারণা। কোটি কোটি সংসারী ছোটবড় জীবদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। তাঁর ইচ্ছায় কোনো বিষয় সম্ভব-অসম্ভব বোলে কিছু আছে নাকি?

এবার দত্ত বললে;—বুঝেচি,—এটা ধারণা করাই অসম্ভব, কোন বিচার চলে না। কিন্তু তা সত্বেও চমৎকার লাগে ভাবতে।

আত্মশক্তি কতটা প্রবল হলে,—সন্দেহ বা বিচার বুদ্ধির রাজ্য পেরিয়ে বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। আচ্ছা, এটাও কি আপনার আশ্চর্য লাগে না, আজ দু'দিন আগের কথা, রাত্রে

বিছানায় শুতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আপনি কী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আপনার অহম সত্তা কী ধাতুতে গড়া ছিল, আর আজ আপনার কী অবস্থা হয়েছে? আপনাব মধ্যে কি একটা অনুভূতি হয়নি? তারই উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলোই পরন্তু দুই জনেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো যার ফলে আপনার মনের পরিবর্তন আর হলধরের উদ্বেগজনক নিরুপায় অবস্থার পরিবর্তন।

এবার দত্ত সাহেব বললেন, দেখুন, একটা কথা আমি স্বীকার করবোই, পরমেশ্বর বা তাঁব লীলায় বিশ্বাস না হলেও—এই যে ব্যাপাবটা ঘটে গেল, এটা যদি নিছক স্বপ্নই হয়, অথবা ভৌতিক কিছু হয় তা হলেও এটা ঠিক যে এর সবটাই শুভ এবং কল্যাণময় ফলই প্রসব করেছে। এইটে ভেবে সত্যই আনন্দ হচ্চে, বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা করে,—কিন্তু আমার এই মনের পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ বিশ্বাস, পরমেশ্বরেব মহিমায় মনকে স্থির করতেই পাচ্চিনা। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপাব লক্ষ্য করছেন; আমার যতটা শিক্ষা, প্রতিষ্ঠা, সমাজে কমী বোলে একটা সম্ভ্রম, নিজেকে সাধারণের তুলনায় কতটা উচ্চস্তরের মানব বলেই মনে করি,—কিন্তু ঐ হলধর, যে লোকটার শিক্ষাদীক্ষা মর্যাদা নিশ্চয়ই আমার মত নয়, তত্রাচ আমার সঙ্গে কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বৈষম্য আছে যা দিয়ে বিচার করছেন। ওটা ক্ষুদ্র জীবগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাইতেই হলধরের সঙ্গে আপনার সচ্ছল অবস্থা ও সংস্কৃতির এতটাই পার্থক্যের দিকেই লক্ষ্য পড়েচে—কিন্তু এটা দেখতেই পাননি, আপনার মত ধন ও বিদ্যার ঐশ্বর্য না থাকলেও হলধর শিল্পী—কীর্তন গান ও বাজনায় তার দক্ষতা—নির্মল অন্তঃকরণ আর ঈশ্বর-ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলেই তাঁর কৃপালাভ—তাঁর এই লীলার এমনই একটি পাত্র নির্বাচিত হয়েছিল। তাই এক হিসাবে সে আপনার

তুলনায় উচ্চস্তরের জীব। দেখুন না, এতটা বিপন্ন অবস্থায় কোনো রকমে তার টাকার কোনো সন্ধান না করতে পেরে শ্রীহরি স্মরণ করেই শুয়ে পড়লো রাত্রে হরিসভা থেকে এসে। পরদিন শ্রীহরি যা করবার তা করে দিলেন। আপনাকে দিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। হলধরের মত মহৎ প্রাণ মানুষ কি অবস্থায় থাকে তা দেখেই না হলধরের মত একজনের সঙ্গে আপনার প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ ঘটলো; ফলে আপনার সঞ্চিত ধনেরও কিছু সদ্ব্যয় হলো, সার্থক হলো সঞ্চয় আপনার।

সত্যই এ সকল আমি বুঝি কিন্তু আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন এমন কি হাতের যন্ত্র, এ বিশ্বাস কিছুতেই আনতে পারচি না। এতটাই আমাদের অহঙ্কারের জড়তা। তিনিই তো আমার এই অবস্থা করে মাথাটি বিগড়ে দিয়েছেন—

বিগড়ে দিয়েছেন যেমন তেমনি সরল বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়েও দিয়েছেন, যথাকালে বিশ্বাস আসবেই—না হলে এমনটাই বা আপনাদের ঘটবে কেন?

যদি হয়, সেটা আপনার জন্যই বোলতে হবে।

আমাকেই বা আপনার সঙ্গে জড়ানোর উদ্দেশ্য কি? তাঁরই ইচ্ছায় তো সবকিছু যোগাযোগ, মূলেই তিনি। এটাও তো দেখতে হয়। যাক্ সে কথা, এখন আমাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই, আসলে আপনি চুপচাপ থাকুন, ভাব ভিতরে ভিতরে পেকে আসুক, তারপর আপনার নিজ বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব ধরতে পারবেন; বিশ্বাসও আসবে যথাকালে। আমার মনে হয় এই হলধরই যে আপনাকে ভক্তিমান করে তুলবে না কে বলতে পারে?

এই পর্যন্তই সত্তা বিনিময়ের কথা।



তখন হিমালয়ের মধ্যস্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলাম। মধ্য মহেশ্ববেব পথে যে ভয়ঙ্কব বন এবং জঙ্গল, তাহা আগে জানিতাম না। সে প্রকার ভীষণ জঙ্গল শিবালিক শ্রেণীব মধ্যে নাই। হিমালয়ের প্রথম স্তরেই শিবালিক,—ঐ শিবালিক শ্রেণীর সর্বত্রই প্রায় বন উপবনে পরিপূর্ণ, কিন্তু এমন ভীষণ জঙ্গল সেখানে কম। ঐ শ্রেণীব মধ্যে যে সকল বড় বড় জঙ্গল আছে, সূর্যরশ্মি সেখানে বৃক্ষ লতা-পল্লব ভেদ করিয়া এক একটি উজ্জ্বল সোনাব পাতের মত এখানে ওখানে চক্ষে পড়ে। কিন্তু এই মধ্যস্তরের হিমালয়ের যে জঙ্গলের কথা বলিতেছি সেখানে এক বিন্দু সূর্যকিরণও প্রবেশ করিতে পাবে না। এখানকার তুলনায় শিবালিক শ্রেণীর বনজঙ্গল বম্য উপবনের মতই মনে হয়। যদিও হিংস্র জীবজন্তু ওখানেও আছে, এখানেও আছে; এখানে বরং বেশী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই মধ্য মহেশ্বরের পথে জঙ্গলে শুনিয়াছি বাঘ ভালুক তো আছেই, সাপ আর বিচ্ছুও বড় কম নাই। সে বিচ্ছু আকারে দীর্ঘ যতটা না হোক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ যেন কষ্টিপাথরে তৈরী। এই জঙ্গলে যেসব ভীষণ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কথা শুনা যায় তাহার মধ্যে একপ্রকার সিংহ আছে তাহাকে ঘোড়ামুখো সিংহ বলে।

অবশ্য আমি এক ভালুক ব্যতীত আর কোন জন্তু দেখি নাই, আর, তাহাও ক্ষণেকের জন্য। সিংহের কথাটা শোনা, আবার ইহাও শুনিয়াছি কোন সময়ে ঐ ধরনের সিংহ হিমালয়ে প্রচুর ছিল, এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। তবে গুজরাটের কথিয়াবাড়ের জঙ্গলে ঘোড়ামুখো সিংহ নাকি এখনও কিছু কিছু আছে এবং তাহাদের বংশ নাকি লুপ্তপ্রায়।

যাহা হউক, এখন দ্বিতীয় কেদার, মধ্য মহেশ্বর যাইতে এই গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা প্রকাণ্ড চড়াই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। যখন মধ্যপথে পৌঁছিলাম তখন প্রায় দ্বিপ্রহর ঘেঁসিয়াছে। আমি একা নয়, সাথী আমার বাহক একজন, যে ব্যক্তি আমার বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং আমার সকল অসুবিধা দূর করিতেছিল।

এখন চলিতে চলিতে এমনই এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম যেখানে সূর্যকিরণ ভূমি স্পর্শ করে না, প্রায় অন্ধকার বনভূমি। --বড়, মাঝারী ও ছোট ছোট গাছ তাহাতে অসংখ্য প্রকারের লতা ও বিচিত্র পাতায় ভরা। বাহক বাবাজী পায়ে পায়ে, পিঠ জোড়া বোঝা কপালের সঙ্গে মোটা পশমের ফিতায বাঁধা, আগে আগে চলিতেছেন। পনেরো বিশ হাত পিছনে আমি, হাতে লম্বা খোঁচাওয়ালা পাহাড়ে লাঠি লইয়া, শুধু পায়ে চলিতেছি। অন্তরে একটা আনন্দও যেমন, একটু ভয়ও আছে, কি জানি কোন্ হিংস্র-মহাত্মার সঙ্গে দেখাই বা হইয়া যায়। এদিক ওদিকে একটু দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেছি, এই আশ্চর্য, গম্ভীর, প্রায়ান্ধকার পরিবেশের মধ্যে বিস্ময় মিশ্রিত একটা কৌতূহল অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া আমায় এক বিচিত্র ভাবেই নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিয়াছে।

আরও চমৎকার এটা পাকডাণ্ডি পথ—পথের রেখা অস্পষ্টই,

যেটুকু দেখিবার বা বুঝিবার তাহা আমার ঐ বাহক বান্ধবই বুঝিতেছেন,—আমি কেবলমাত্র তাঁহার অনুসরণই করিতেছি।



মধ্যে মধ্যে একপ্রকার পাখীর আওয়াজ কানে আসিতেছে। সেই ভূমির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন ঐ অদ্ভুত স্বর বায়ু-

মণ্ডলে ভাসিয়া আসিতেছে—শুনিলে কেমন ভয় আসে,। কর্কশ প্যাঁচার আওয়াজ যেমন মাঝ রাত্রে কানে আসিয়া আমাদের চমকিত করে,—অনেকটা সেই রকম হইলেও তাহার উপরে যায়। তারপর আবার আর এক রকমের আওয়াজ, কিন্তু এটা যে প্যাঁচার ডাক নয় তাহা বুঝা যায়; না জানি আজ আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, বিধাতাই জানেন।

এইভাবে তরুচ্ছায়াঘন প্রায় অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে আমার অগ্রবর্তী বাহক বাবাজী,—হঠাৎ আমার নজর পড়িল যেন, —অকস্মাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তারপর নিঃশব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া হঠাৎ তাহার কপালেব পট্টি খুলিয়া দুই হাত মুক্ত করিয়া বোঝাটা ঝট্‌তি পিছনে ফেলিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। উহা দেখিয়া আমি ভাবিলাম বুঝিবা ইহা তাহার কোনো রকম শারীবক বা মানসিক ব্যাধির ফল। অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে পৌঁছিয়া বাহু অবলম্বনে তাহাকে ধরিলাম। সে যেন চমকিয়া উঠিল, বলিল,- বো দেখো নাগরাজ। এখন সে আসিয়া সবল দুই বাহুর জোবে তাহার বোঝাটা তুলিয়া সরাইয়া পার্শ্বে রাখিয় বলিল,—দেখো তো। তখনই দেখা গেল নাগবাজেব লেজের দিকট নড়িতেছে কিন্তু মাথা হইতে গলা পর্যন্ত খানিকটা শরীর থেঁৎলাই গিয়াছে –ঐ পর্যন্ত অসাড়। সাপটা বোধ হয় কুণ্ডলী পাকাইয়াছিল মাথাটি বাহিরে রাখিয়া শিকারের জন্যই ওৎ পাতিয়াছিল। ইপাশে একটা বেশ বড গর্ত।

ইসিকে, আভি জ্বালানা চাইয়ে—বলিয়া বাবাজী ঐখানেই কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আনিল। এক অদ্ভুত রকমের চিত্রিত সাপটির চেহারা, লম্বা প্রায় ছয় হাত, বেশ মোটা, চক্র ছিল না। মুখটি তার বেশ চওড়া। পাহাড়ী বোড়ার জাত মনে হইল। এইভাবে নাগরাজের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বাহক আবার মোট

তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল। এ কী একটা হইয়া গেল—ভাবিতে ভাবিতে আমিও তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম।

ক্রমে ক্রমে প্রবল তৃষ্ণার ফলে আমায় মরীচিকায় পাইয়া বসিল। সাপের কথা যখন মনে হয় তখন তৃষ্ণার কথা মনে থাকে না, আবার যখন তৃষ্ণার জ্বালা ধরে তখন সাপের কথা মনে থাকে না। কেবল কুলু কুলু, ঝর ঝর, ঝম ঝম, ঠিক যেন অদূরে একটি ঝরণা আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল আমার, ঠিক যেন এক অজ্ঞাত শক্তিশালী কেহ আমায় লইয়া খেলা কবিতেছে।

বাহক-বন্ধু তাঁর মুখ নীচের দিকে করিয়া সমানেই সরু পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। তাঁহাব মধ্যে কি হইতেছে কে জানে। তৃষ্ণায় তাহারও ছাতি ফাটিতেছিল নিশ্চয়ই আমি জানিতাম, কিন্তু আমাব মত তাহাব দিগ্‌ভ্রম অথবা মরীচিকার খেলা চলিতেছিল কিনা জানি না। মনে মনে খানিক ভগবান ভগবান কবিয়া কাটাইয়া দিলাম। বনে জঙ্গলে তৃষ্ণার কি দুঃখ। আশেপাশে গাছের সীমা নাই;—কিন্তু একটাও কি পরিচিত ফলেব গাছ হইতে নাই,—না আম, না আমড়া, না আঙ্গুর, না আপেল, না ন্যাসপাতি। দেখিতে দেখিতে এক ঝাঁক আমলকী গাছ, এক একটা আঁসফলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ধরিয়াছে, অসংখ্য। তাহাই বেশ গোটাকতক তুলিয়া মুখে পুরিলাম—না রস না স্বাদ,—কেমন অদ্ভুত তিক্ত ও কষায় রস। দাঁতে চিবাইয়া মুখে নাড়িয়া চাড়িয়া তৃষ্ণা খানিকটা কমিল।

প্রায় আধ মাইল চলিবার পর ক্রমে আমাদের পথ অল্প একটু যেন পরিষ্কার হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও অনেকটাই কমিয়া আসিল, তত আঁধার আর রহিল না। পথের একধারে বড় বড় গাছ আর ঝোপ জঙ্গল, অপর দিকে বিরল পাইন বৃক্ষ-

শ্রেণী আর খড়, একপ্রকার তীক্ষ্ণাগ্র ঘাস নামিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, কোথায় একটু জল পাওয়া যায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা চলিয়াছি। এই মধ্য-মহেশ্বরের পথে এখনও পর্যন্ত একটিও ঝরণা মিলিল না। এ পথ যে এমন ভয়ানক কঠোর হইবে তাহা কে জানিত? তবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল করিতেছিল তৃষ্ণায়।

শুনিয়াছিলাম, মাঝপথে ভীলদের একটা আস্তানা আছে। নিশ্চয়ই সেথায় জল পাওয়া যাইবে, মানুষ জল বিনা বাস করিতে পারিবে কি করিয়া—কাজেই প্রাণের কামনা হইল, ভীলদের বস্তিটা পাওয়া যায় না -হে ভগবান,—কোথায় মাঝপথে ভীল-বস্তি, এতটা আসিলাম, মাঝপথ কি এখনো হয় নাই? আর এই জঙ্গলই বা শেষ হইবে কোথা! এখন যদিও অরণ্য অনেকটা হাল্কা হইয়াছে তবে মাঝে মাঝে সেই অজগরের ভয়ের স্থান আছে, একেবারেই অদৃশ্য হয় নাই। এখন সেই ভীলদের আস্তানা গুহায়, কিম্বা পৃথক নির্মিত কুটিরমধ্যে তাহারা থাকে কিনা, এ অঞ্চলে তো এখনও বাসস্থান কোথাও দেখিলাম না। একবার বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবাজী, ভীললোককা গাঁও কাহা, মালুম?

সে বলে,—আজ সন্ধ্যাকো উঁহা পৌঁছা যায়েগা। রাতকো উহাই রহনেকো চাইয়ে— ফিরে কাল সুবকো চলেগা, দু'পহর কো কেদার-নাথ পৌঁছা যায়েগা' -

সাধারণ ভদ্র পর্যটক, তাঁদের সঙ্গে জলপাত্র ভরা জল থাকে। কোনোকালেই আমার তাহা ছিল না। পথের আয়োজন বলিতে কিছু জীবনে কখনই শিখিলাম না, যদিও বাল্যে ও যৌবনে অনেক কালই পথে পথেই কাটিয়াছে। চিরদিনই পথকে গণ্য করিতে পারি নাই, গন্তব্যই মুখ্য হইয়া আছে আমার জীবনে। পথের দুঃখও কম পাই নাই। এখন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, ভালই বুঝিয়াছি

যে, পথের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার নাম পাথেয়, তাহার কোনোটুকুই উপেক্ষণীয় নয়।

বাহক বন্ধুর তৃষ্ণাও কম নয়; কিন্তু তিনি বড় গম্ভীর ও সংযত প্রকৃতির ব্যক্তি। সহজে নিজ অন্তরের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার মানুষ নয়, কাজেই ঘাড় গুঁজিয়াই চলিতেছেন।

বো দেখো, কৌন লোগ আ-রহা হৈ। সত্যই যেন অন্ধকার-ঘন বনতরুচ্ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছে তিন চার জন লোক। দেখিতেছি বিশাল শরীর তাহাদের মুখমণ্ডলও ভয়ঙ্কর দেখিতে। ক্রমে উহাদের গলায় প্রবালের সঙ্গে বড় বড় পুঁতির মালাও দেখা গেল। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, তীক্ষ্ণাগ্র লৌহফলা তাহার, অব্যর্থ মারণাস্ত্র। সামনে দুই মূর্তি,—পিছনে একটি নারী, তাহার এক হাতে একটি থলি, অপর হাতে একটি দণ্ডে ঝুলানো ভাঁড়। তিনজনেরই পরনে লাল কাপড়।

বাহকের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে,—তৃষ্ণায় কিম্বা আতঙ্কে ঠিক বুঝিলাম না। তাহার গতিও শ্লথ হইয়া আসিতেছে;—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অদূরে আগমনশীল মূর্তি কয়েকজনের উপরে,—সে দৃষ্টি নড়িতেছে না। একটা কথা এখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল;—ভীললোগ্ উপরসে আতা হোগা, অর্থাৎ বোধহয় উপর হইতে ভীলেরা আসিতেছে।

আমার আর ভয় রহিল না, যখনই শুনিলাম উহারা উপরের অধিবাসী ভীল

ক্রমে তাহারা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—এ রাস্তেমে জল মিলেগা কি নহি? হমলোককো বহোত তিয়াস।

পুরুষ দুই জন একবার আমার আবার বাহকের দিকে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি তাহার উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া

হাসিল, তারপর বলিল,—ইঁহা জল কঁহা মিলি, ই রাস্তেমে জল নহি, বো পুরানা ঝরনা শুখ গই।

ইহার পর পুরুষদের একজন বলিল,—অব্ চঢ়ো, চঢ়ো, বো সীধে চলা যাও, জব জঙ্গল খতম হোয়েগা, সন্ত মহারাজ ফিরঙ্গ-বাবাকো আশ্রম মিলেগা। উঁহাই সব কুছ মিলেগা, ঝরনা ভি হৈ, বৈঠনেকি জাগা মিলেগা।

তাহারা আর দাঁড়াইল না, সেজা চলিয়া গেল। আমাদেরও শান্তি—বাহকের ভয় ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল; বলিল,—ই লোগ শিকার কা পিছে যা রহা। আমরাও গতি না কমাইয়া চলিতে লাগিলাম;—কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে নিলাম,—কৌনসে শিকার ইহাঁ মিলে গা?

বাহক বলিল,—হরণ, ব্রেডের, মোরগ বনকী,—ঔর ক্যা মিল শকতা হৈ, ইধার।

গভীর জঙ্গলের শোভা, একটা আশ্চর্য রূপ আছে;—যার ভয় লাগে তার পক্ষে আর এ বন্য সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে না।

এ পথে কোনও কালে একটা ঝরনা ছিল, বহুকাল সে-ধারা বন্ধ হইয়াছে। কাজেই আমাদের অদৃষ্টে সে পুণ্যতীর্থ যখন আর নাই, তখন ছাতিফাটা তৃষ্ণা লইয়াই চলিতে হইবে। পাহাড়-পথে তৃষ্ণা এড়াইতে, আমার বাহক বন্ধু, দেরাদুন হইতে যাত্রার পূর্বে কয়েকটি বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেঁতুল, মিস্রি, মুন-আমলা প্রভৃতি,—তাহাই মুখে নাড়িতে চাড়িতে চলিয়াছি,—কিন্তু তাহাতেই কি জলের তৃষ্ণা মিটিবার? শীতল জল ব্যতীত এ তৃষ্ণার শান্তি নাই। এখন পথ চলিতেও কষ্ট হইতেছে, শরীরও অবসন্ন। তৃষ্ণায় যে এতটা কাহিল করে এ অভিজ্ঞতা পূর্বে ছিল না।

কষ্টের শেষ আছে, ক্রমে বনপথে আলো আসিতে লাগিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকিরণ দেখিয়া প্রাণ প্রফুল্ল এবং আশার

সঞ্চার হইল। বাহক বাবাজী বলিলেন, এইবার কাছেই আমরা জল পাইব। আরও কতক উঠিয়া যখন গাছপালা দূরে দূরে ছড়াইয়াছে তখন সম্মুখেই একটা পর্বত গুহা আমাদের আকৃষ্ট করিল। গুহার দৃশ্য নয়নগোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, মুহূর্তের মধ্যে যেন সকল কষ্টের অবসান হইল। বলা কওয়া নাই সবকিছু ভুলিয়া ঐ গুহার দিকেই পা চালাইতেছিলাম, দেখিবামাত্রই বাহক-বন্ধু বাদ সাধিলেন—

উঁহুঁ উঁহুঁ, উধার নেহি,—যিস্ তরফ ঝরনা হোগা পহলা হাম্ যায়েগা, আপ থোড়া ইহাঁ ঠার যাইয়ে। বলিয়া সে তাহার বোঝা একটা বড় পাথরের উপর রাখিয়া ঐ গুহার দিকে একটা বনপথ ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি মাল পাহারা দিতে রহিলাম। বসিয়া বসিয়া,—যেন দূরস্থ ঝরনার শব্দও পাইলাম। অল্পক্ষণেই বাহক ফিরিয়া আসিল,—আপ্ যাইয়ে, থোড়ি দূর। জল পী লেনা, লেকেন বো গুফামে মৎ ঘুসো।

কাহে নেহি ঘুসেগা, যব্ দিল চাতে ?

উহাঁ শের রহতা, সাপ, বিচ্ছু সব কুছ রহ সকতে।

তাহার কথা শুনিতে বাধ্য। দেখিলাম বড় সাবধানী মানুষ, এ অঞ্চলেরই লোক সে। সুতরাং ঝরনায় গিয়া আকণ্ঠ জল পান করিলাম। ফিরিয়া গুহার কাছে আসিয়া মনে হইল গুহায় কি আছে একবার দেখিতে দোষ কি ?—এখানে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, কৌতূহল লইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছি : হঠাৎ পিছন হইতে আমার কাঁধে একখানি হাত আসিয়া পড়িল। চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি, চমৎকার। অপরূপ এক সাধুমূর্তি, যেন সাক্ষাৎ শিব স্বয়ং আমার সম্মুখে ইনিই ফিরঙ্গ-বাবা।

তীরথ কা যাত্রী ? বলিয়া আমার, দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

জী মহারাজ, বলিয়া প্রণাম করিতে গেলাম। ঐসা নহি, ঐসা নহি, এ্যায়সা,—বলিরা সবলে আমায় তুলিয়া আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। বিশুদ্ধ হিন্দীতেই কথা।

অল্পক্ষণ আমার মুখেব পানে চাহিয়া জিজ্ঞসা করিলেন,—কৌন দেশ কি মূর্ত্তি?



বাঙ্গালী! শুনিয়াই আনন্দে আমাব হাতখানি ধরিয়া গুহার দিকে লইয়া চলিলেন।

সাচ্চাবৎ শুনোগে, আপনে দেখতেই মুঝে সমঝা থা যে আপ কি বাঙ্গালা শরীব।

এখন আর হিন্দী নয়, ভাষায় বলিব।

তারপর সস্নেহে বলিলেন,—আজ তুমি আমার অতিথি। আমি বলিলাম, সঙ্গে আমার বাহক আছে যে। তিনি বলিলেন,

সেও আমার অতিথি। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এখানে কিছুরই অভাব নেই।

গায়ের রং, মাথায় চুলের রং এবং গাঢ় নীল চক্ষু-তারকা দেখিয়া আমার মনে যাহা উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম,—আপনার শরীরটি উরোপের কোন্ অংশের জানতে ইচ্ছা হয়। কয়েকটি বৈচিত্র্যে দেখেই জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয়েছি,—ক্ষমা করবেন।

মৃদু হাস্যে তিনি বলিলেন,—I was once an European, a Hungarian of jewish descent, but now an Indian Sadhu, Pure and simple. এই যে সাধুর Pure and simple কথাটি যে মর্মে-মর্মেই সত্য সে পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সাধুর হিন্দী বুলি খুব ভাল, ইংরাজী বলিতে যেন একটু ঠেকে। যাই হোক এখন গুহার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে,— বাহিরে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছিল। গুহার দ্বার ছোট, প্রায় সাড়ে তিন ফুটের মত, হেঁট হইয়াই ঢুকিতে হয়। ভিতরে দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব কিছুই। দেখা গেল, এক প্রান্তে সাধুর আসন বিস্তৃত, তাহাতে শয়ন ও উপবেশন দুই চলে। তুলার গদি, তাহার উপর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম বিস্তৃত। ভিতরের ছাদ উচ্চে, মধ্যস্থলে সাড়ে চার ফুটের বেশী হইবে না, শেষ দিকটায় আরও কম, সেই দিকেই সাধুর আসন। আশেপাশে অনেক বই খাতা-পত্র আছে। গুহার মধ্যে দাঁড়াইতে পারা যায় না;—দাঁড়াইতে হইলে বাহিরে আসিতে হইবে। ভিতবে পাঁচ-ছয় জন পাশাপাশি বসিতে পারে এমন স্থান আছে।

আমরা গুহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিবার পূর্বে, আশ্রয়দাতা, বাহক বাবাজীকে ডাকিয়া আমার কম্বলাদি কিছু আনাইয়া গুহার মধ্যে আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারপর তাহাকে অন্যান্য জিনিসপত্র সহ কোথায় রাত্রি যাপন

করিতে হইবে, কোথায় খাদ্য পাক করিতে হইবে, কোথায় তাঁহার ভাণ্ডার—প্রয়োজনীয় সকল কিছু পাওয়া যাইবে ইত্যাদি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। অতীব তৎপরতার সহিত সব কিছু শেষ করিয়া বলিলেন,—এইবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আলাপ করিব।

তাঁহার সব কাজই মেথডিক্যাল,—এই থরোনেস্ই তাঁহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য। ইহাপেক্ষা আর একটি ব্যবহার আমায় আকৃষ্ট করিয়াছিল,—সেটি তাঁর সরলতা। আমার সঙ্গে প্রথম হইতেই এই যে ব্যবহার, ইহার মধ্যেই উরোপীয়ানদের বিশেষতঃ ব্রিটিশ প্রভুদের শ্রেষ্ঠত্বের গরিমাহেতু যে একটা দূরত্ব—যাহাতে আমরা চির-অভ্যস্ত সেটির নামগন্ধও নাই। অবশ্য ইহাও বুঝিলাম এই উৎকর্ষের মূলে তাঁহার ধর্ম বা অধ্যাত্ম-চেতনা—যাহাতে তাঁহার পাশ্চাত্ত্যের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

এই সকল বিবরণ যে কথা প্রসঙ্গে আসিয়াছিল—এখন সেই কথাই বলিব। সাধু বেশ রসিক,—ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর বলিলেন,—তুমি তো ভারতবাসী, এটা জানাই আছে যে অতিথি এলে আগে কিছু খাওয়ানো দরকার। আমার ঘরে যা আছে তাই দিচ্ছি, আর আমিও তাই খাব। দেখিলাম, ঝক্‌ঝকে মাজা পাত্রে জল, এক পাত্র ভাজা আটা বা ছাতু, কৌটার মাখন, চিনি, একটি লোটায় গরম জল। ছাতুতে খানিকটা মাখন ও চিনি এক পাত্র আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এটা গরম জলের সঙ্গে নরম করে নিয়ে গলাধঃকরণ কর, আমিও তাই করি। শেষে সুপক্ক পেয়ারা দুটো আছে, দুজনে খাওযা যাবে। রাত্রে যা জুটবে দেখা যাবে। এই ভাবে আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ হইল। দেখিলাম, পেট ভার হইল না অথচ বেশ তৃপ্তিকর ভোজন হইল।

এইবার পরিচয়ের পালা। উভয়েই এক এক টুকরা হরিতকী মুখে দিয়া বসিবার পর তিনি আরম্ভ করিলেন,—তোমার মনোগত কৌতূহল এই যে, আমি কোন্ সূত্রে ভারতে এসে এইভাবে সাধু-জীবন যাপন করছি এই কথা তো? সংক্ষেপে তার প্রথম কথা এই যে, দেশে বিদ্যাধিকারে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম এবং অধ্যাপকের আগ্রহে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করে-ছিলাম। আমার অধ্যাপকের কাছেই শুনেছিলাম, ভারতের আর্যেরা সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠ দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন শঙ্করের ভক্ত, বেদান্তই মানব জ্ঞানের চরম আবিষ্কার, একথা বিশ্বাস করতেন। আমি তাঁর কাছেই অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বের কথা শুনেছিলাম। তিনি আমায় বুঝিয়েছিলেন যে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই অপার্থিব বস্তু, মানব জ্ঞানের সার। এই ধারণা নিয়েই তখন আমি প্রাণের টানে দেশ ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়ি। বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ হয়ে ছাব্বিশ বৎসর আরম্ভ হয়েছে। তখন সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনই আমার একমাত্র কাম্য ছিল। আর আগেই শুনেছিলাম, ভারতের সব প্রাচীন সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রই হলো কাশী। কাশী লক্ষ্য ছিল, তাই দ্রুতগতি বোম্বাই থেকে একেবারে কাশীতে এসে পড়লাম। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নাম, অদ্বৈত বৈদান্তিক বলে প্রসিদ্ধি আগেই শুনেছিলাম। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বেদানন্দ। তাঁরই আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে আমার জীবন-কথা জানালাম, কিন্তু বেদানন্দ আমায় গ্রহণ করলেন না। পরমানন্দও একজন বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য। তখন দণ্ডী স্বামী পরমানন্দেরই শরণাপন্ন হলাম।

এমন কি, তাঁকেই আমার গুরু বরণ করে জীবন সার্থক করব, আমার এই সংকল্পের কথা বললাম। তিনি বললেন—ব্রাহ্মণ-সন্তান না হলে আমি দীক্ষা দিই না, এইটাই এখানকার নিয়ম।

তবে তোমার অধ্যয়নের সহায়তা নিশ্চয়ই আমি করব, যদি তুমি শুদ্ধাচারে এখানে জীব-যাপন করতে পার।

আমি তাই স্বীকার করলাম।

প্রথম দুই বৎসর এইভাবে আমার কাশীতেই কেটেছিল। কঠিন নিয়মের মধ্যে কাশীর পাঠ সাঙ্গ হলে পর ওখান থেকে আমি চলে আসি।

বিদায়বেলা তিনি বললেন,—এবার তুমি ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন কর! ঐ সুযোগে তোমাব দেহমন পবিত্র হবে, ফলে গুরু-লাভও ঘটতে পারে। তখন আমারও প্রাণ আর কাশীর কোলাহলের মধ্যে থাকতে চাইছিল না—কেবল অধ্যয়নেব আকর্ষণেই ওখানে দুই বৎসর কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। সংস্কৃত ভাষায় আমার অনুরাগ দেখেই স্বামীজী স্বয়ং এবং ওখানকার সবাই আমার প্রতি একটা স্নেহের ভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বিদায়বেলা যখন স্বামীজীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে গেলাম তিনি আমার স্পর্শ নিলেন না, পা সরিয়ে নিলেন। বোধ হয়—ইউরোপীয়ান, ম্লেচ্ছ, আচারহীন বলেই তাঁর মত একজন দণ্ডীস্বামী পূজ্যপাদ পণ্ডিতের মধ্যেও একটা দ্বেষ এবং ঘৃণা বেশ ভাল ভাবেই জমা আছে দেখলাম, তা থেকে পরিত্রাণ নেই, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও।

এই ব্যাপারে আপনি হয়তো প্রাণে একটু আঘাত পেয়েছিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তা হয়তো একটু পেয়েছিলাম, তবে বুদ্ধি বিচারে তার মীমাংসাও করে নিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, সেটি কি রকম, বলুন তো? তিনি নিঃসংকোচেই বলিলেন,—পূর্ণভাবে আত্মসাক্ষাৎকার বা সমাধি না হলে, অর্থাৎ যাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান, তা না হওয়া পর্যন্ত, জাতি ও ধর্মগত সংস্কারগুলি এমন ভাবে মন বুদ্ধিকে আঁকড়ে থাকে, তা

থেকে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন এক জিনিস—আর অদ্বৈত তত্ত্ব সাক্ষাৎকাব অন্য - তাইতেই সর্বার্থসিদ্ধি, সর্বাত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ – জন্ম, জীবন ও জীবত্ব সার্থক। সেটা বিদ্বান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়দেব ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না।

আমার প্রশ্নের উত্তর এতটা সরল এবং এতটাই সত্য যে আর কথা বাহির হইল না আমাব মুখে। যাহা হউক, তাবপর তিনি বলিয়া চলিলেন—এখন থেকে গুরুলাভ ও দীক্ষার জন্য পাগলের মতই তীর্থভ্রমণ আরম্ভ করে দিলাম। কেমন কবে অদ্বৈত তত্ত্বানুভূতি আমার জীবনে সম্ভব হবে এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই—কাশী থেকে প্রয়াগ, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য, হবিদ্বার, কুরুক্ষেত্রে কিছু দিন কাটিয়েছিলাম। সর্বত্রই সাধু-সন্ন্যাসীতে পবিপূর্ণ,—কিন্তু কোথায় আমার গুরু? কাবো কাছে জিজ্ঞাসা করলেও কোন সদুত্তব পাই নি। একজন বললেন, মথুবা বৃন্দাবন যথার্থ ই ভগবানের স্থান। মথুবা গেলাম, তারপরই বৃন্দাবন। অনেক অনেক সাধু আছেন, কেবল আমার গুরু নেই। তারপর জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ কবলাম। সেখানে নাথ সম্প্রদায়ী সাধুব আড্ডা গলতায় দীর্ঘকাল বাস করেছি। অতঃপর মধ্য প্রদেশের নাসিক তীর্থে কুম্ভ মেলায় এবং তন্ন তন্ন করে সাধু সন্ত দেখলাম। কি ভয়ানক ভিড় সাধুর। তাবপর পুনা হয়ে বোম্বাই গেলাম।

এখন থেকেই দ্বারকা যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এতটাই প্রবল হলো দ্বারকা তীর্থে যাবার আকাঙ্ক্ষা, কে যেন প্রবলবেগে আমায় ঠেলে দিলে ঐ দিকে। জাহাজে যখন দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম এক সাধুও ছিলেন ঐ জাহাজে,—দ্বারকা-যাত্রী। প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হলাম তাঁর মূর্তি দেখে। কান ফোঁড়া ঘড়িওয়ালা সাধু। ঘড়ি অর্থাৎ মোটা মোটা রিং দুই কানে দুটো ঝুলছে; নাম তাঁর মঙ্গলনাথ বাবা। চমৎকার সংস্কৃত ভাষায় কথা বললেন।

আমার ধারণা হয়েছিল তিনি জ্ঞানী আর সেই জন্যই একটা কেমন গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

দ্বারকা পৌঁছবার পর থেকে আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি। দুই-একদিন পর যখন সুযোগ পেলাম, সোজা একেবারে আমার দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় নিবেদন করলাম। আমার প্রতি কৃপা করে তিনি নিঃসঙ্কোচেই রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দুজন শিষ্য বা সেবক ছিল তারা বেঁকে দাঁড়ালো। তারা বললে, বিজাতীয় বিধর্মীকে দীক্ষা দেওয়া হতেই পারে না—আমাদের গুরু মোহান্ত শুনলে অনর্থ ঘটবে। বাবা মঙ্গলনাথ কিন্তু তাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাদের বললেন,—যে ব্যক্তি এমন দেবভাষার অধিকারী, তপঃপরায়ণ,—জ্ঞান-মার্গের মানুষ,—সে এই ধরিত্রীর যে অংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। অন্তরে যখন ধর্মসাধনেব ঐকান্তিক আগ্রহ জেগেছে তখনই ওর অধিকার হয়েছে।

দ্বারকাতেই আমার দীক্ষা হয়ে গেল। সত্যই আমার জন্মান্তর হলো—ধন্য হলাম। আমাব গুরুদত্ত নাম হলো—কল্পনাথ। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত ও নামে কোথাও পরিচিত হইনি। পূর্বাশ্রমের ধন-সম্পত্তি, বেশ-ভূষা, নাম, সংস্কার প্রভৃতি যা-কিছু—এমন কি শিক্ষা-সূত্র পর্যন্ত সব কিছুই যেমন ত্যাগের বস্তু,—এ নামটিও তেমনি পরিত্যাজ্য বলেই আমার ধারণা। সাধুর আবার একটা নাম কেন? নামের সঙ্গে মোহ আছে।

গুরু আমায় মন্ত্র এবং জপাদি সাধন দিয়েছিলেন। জপের প্রণালী সুন্দর ভাবেই বুঝিয়ে, আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ কেমন করে স্বয়ংক্রিয় হয় দেখিয়ে, এমন কি আয়ত্ত করিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। ঠিক সেই নিয়মেই জপে মগ্ন হয়ে থাকতাম। ফলে সহজেই আমার ধ্যানের অবস্থা এল;

আনন্দে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে প্রায় বৎসরাধিক কাল কাটিয়ে তখন আমি প্রভাস তীর্থে এলাম।

প্রভাসের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন রকমের। এখানে বৈষ্ণবভক্ত আর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানই বেশী। চমৎকার, আনন্দময় ভাবে-ভঙ্গীতে ভজন সাধন করে চলেছে, এরা সবাই যেন এক দেবরাজ্যেরই অধিবাসী। প্রভাস থেকে ডাকোরজী দর্শনে গেলাম। দ্বারকার আসল বিগ্রহ এখন এই ডাকোব তীর্থেই রয়েছেন—ঠিক যেমন বৃন্দাবনের আসল বিগ্রহ গোবিন্দজী জয়পুরের প্রাসাদস্থ উদ্যানের মধ্যেই বর্তমান। পরে আমি মধ্যভাবত হয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করলাম।

এদিকে প্রত্যেক জনপদেব নাগরিকরা এমন শান্ত প্রকৃতির নর নাবী যে নির্বিচারেই বল্‌চি, প্রাচীন ভারতের প্রতিরূপ দক্ষিণ ভারতেই বর্তমান। এদের মাঝে এসে একদিনের জন্যও আমি মনে করতে পারিনি যে আমি ভিন্ন দেশের লোক, যদিও ভাষা জানতাম না। অনেক পণ্ডিত, গ্রামে এবং নগরে—তাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছি, দেখেছি, তারা সবাই আপন করে নিয়েছেন আমাকে তাঁদের সরল এবং উদার আচরণে। ঐ দেব-ভাষার প্রভাবেই আমি তাদেব আপনজন হতে পেরেছিলাম। তবে অধিবাসীরা সাধারণ গরীব, সবরকমেই বিলাস-বর্জিত আব তাইতেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

ঘুবতে ঘুবতে আমি মাদুরায় গেলাম। মাদুরাই যেন দক্ষিণ ভারতের প্রাণ মনে হলো। তবে সর্বত্রই ফোঁটা তিলকের ঘটা ঠিকই আছে কোথাও ব্যতিক্রম নেই। এমন কি গৃহস্থাশ্রমী ভদ্র গ্রাম বা নগরবাসীরাও ফোঁটা তিলক ছাপ মারাই পছন্দ করেন।

আমার ভাগ্যক্রমে সাধু সন্ন্যাসীদের কারো সঙ্গে নয়, সত্যনারায়ণ শর্মা নামে এক প্রৌঢ় গৃহস্থের সঙ্গেই একটু গভীর

ভাবে আলাপ হয়ে গেল। তিনি এম-এ পাশ। প্রথমেই আমি তাঁর মূর্তি দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কারণ তাঁর মধ্যে এমনই একটি স্বাধীন ও শক্তিমান ভাবের প্রকাশ ছিল, যা আমার পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। এতদিনের মধ্যে যত লোকের সঙ্গে মিলেছি, তাঁর মধ্যে যে নিঃসংকোচ স্বভাবটি দেখেছিলাম এমনটি কারো মধ্যেই দেখিনি। যাঁকে মুক্ত পুরুষ বলা যায় ইনি তাই।

আরও বিশেষত্ব ছিল, কোথাও তাঁর শরীরের মধ্যে ফোঁটা তিলকের কোনো চিহ্নই ছিল না। এমন কি শিখা ও সূত্র যা ব্রাহ্মণদের দেহের সঙ্গে আমরণ যুক্ত—সর্বত্র দেখে এসেছি তাও ছিল না। তিনিই প্রথমে আমার সঙ্গে উপযাচক হয়েই কথা কইলেন। আমার পরিচয় নিলেন, আহ্বান করে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেবা-যত্ন এমনই আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হয় যেন বহুকালেরই প্রীতির সম্বন্ধ ছিল আমাদের মধ্যে, তিনি যেন আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। প্রথম প্রথম আমার একটু সংকোচ ছিল, তাঁর সেটা তিলমাত্র ছিল না। যাই হোক ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার মাঝে একদিন,—তিনি দীক্ষিত অর্থাৎ তাঁর গুরুলাভ হয়েছে কিনা, এই কথাই জিজ্ঞাসা করে বসলাম তাঁকে।

উত্তরে তিনি যা বললেন আমার পরমাশ্চর্য বলেই ধারণা হলো। আরও বেশী আমি আকৃষ্ট হলাম, এমন কি মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তা শুনে। তিনি বললেন,—গুরু-লাভ বা মন্ত্র-দীক্ষার কথা বলছেন? গুরু এবং ইষ্ট,—আমার দুইই লাভ হয়েছে ঐ একই সত্তার মধ্যে। পরমেশ্বর,—আমাদের যিনি সর্বজীবেরই ইষ্ট, সর্বব্যাপী সৎ, তাঁর মূর্তি কোথা? কাজেই যাঁর ভিতর দিয়ে আমার মধ্যে ইষ্ট স্ফূর্তি হলো সেই মূর্তিই আমার ইষ্টমূর্তি;—আর কি চাই? সবই পেয়ে গিয়েছি ঐ গুরুর মধ্যে, অথচ তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে

যে দীক্ষা হোম যাগ যজ্ঞ ওসব অনুষ্ঠানের কোনো দরকারই হয়নি। এখন আমার জীবনে শান্তি আনন্দ প্রাণের স্ফূর্তি, যা নিয়ে এ সংসারে আত্মশক্তির খেলা, তা প্রচুর। আমার আর চাইবার কিছুই নেই ;—সবই পেয়ে গিয়েছি।

এমন কথা আমার জীবনে কোথাও, কখনো কারো মুখেই শুনি নি। আমার যেন বাকরোধ হয়ে গেল। ধন্য জীবন,—ভারতে এসে এই একটি জীবন প্রত্যক্ষ হলো। আমার আদর্শ যেন সামনেই দেখতে পেলাম। এখন চরম কৌতূহলের চাপে সর্ব সংকোচ কাটিয়ে যখন মনোগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে যাব তখন শর্মা আবার বললেন,—গুরু আমার প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী ; প্রচ্ছন্ন থাকেন সত্য কিন্তু তা বলে আমার অথবা আমারই মত কারো উপস্থিতি উপেক্ষা করতে পারেন না। যখনই প্রাণ চায় দেখতে, কিম্বা সঙ্গ করতে ইচ্ছা হয়, অবাধেই চলে যাই,—বিশ মাইল মাত্র দূরে থাকেন, কয়েকটা স্টেশন পরেই তাঁর স্থান। অপূর্ব তীর্থ,—অরুণাচলম।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, দুর্নিবার লোভে পেয়ে বসল। এইবার নিঃসংকোচেই বলে ফেললাম হাত জোড় করে—আমার কি সে ভাগ্য হবে,—একবার তাঁকে দেখার সাধ কি পূর্ণ হবে না ?

আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আর বিলম্ব অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তিনিও আমার মন বুঝলেন। পরদিন প্রভাতেই যাত্রা।

ঐ অরুণাচলম্ পর্বতমালা ; স্টেশন থেকে হেঁটে পৌঁছে গেলাম। অল্পক্ষণেই পরমতীর্থ মহর্ষি রমণের কুটির-মণ্ডপে। প্রথম দর্শন গৃহদ্বার থেকেই—একবার মাত্র ঐ চক্ষের দৃষ্টি।

ঐ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সব্ কিছুই আমার মধ্যে পেয়ে গেলাম। আজ আমি তোমায় যা বলছি, আমার জীবনে আজ

আট বৎসর জীবন্ত অভিজ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে আছে - মহর্ষির ঐ প্রথম দৃষ্টি আমার উপর। ঐ এক দৃষ্টিপাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক প্রীতিময় একাত্ম সম্বন্ধের জন্ম। আশ্চর্য নয় কি? এর চেয়ে পরমাশ্চর্য আর কি হতে পারে এই বিজ্ঞানের যুগে?

আমি কথা বলি নাই, চুপচাপ তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিতেছিলাম। কতক্ষণ স্থির থাকিয়া সাধু বলিলেন;—যৌবন-কালে রূপেগুণে মুগ্ধ নরনারীর আকর্ষণ বুঝতে পারি;– কিন্তু প্রৌঢ় বয়স্ক, অতি সাধারণ এক মূর্তি ভারতের মাটিতে এইভাবে আমার মত একজন ইউরোপীয় পরিণত যুবাকে, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এভাবে আকর্ষণ, এমন কি দৃষ্টিপাতেই আত্মস্থ করে নেওয়া, বিজ্ঞানময় জগতে এর বড় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এবার তিনি নিস্তব্ধ হলেন। তাঁর এই দিব্যোচ্ছ্বাস আমার মধ্যে খানিক সংক্রামিত হইয়াছিল, তবুও খানিকক্ষণ সংযতই ছিলাম, কিছুই বলিতে পারি নাই। এখন আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম -দেখুন আমার মধ্যেও এক প্রবল আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। এক সময় বছরের পর বছর আমি দক্ষিণ ভারতে কাটিয়েছি,– বিশেষ তামিল দেশে অনেকবারই যাতায়াত করেছি কন্যাকুমারী পর্যন্ত - তখন মহর্ষির নাম পর্যন্ত আমার কানে যায়নি; --সেইজন্য তাঁকে আমি যেভাবে হারিয়েছি, মনে হয় আমার এ দুঃখের কখনও শান্তি হবে না।

সাধু শুনিলেন,—কিছুই বলিলেন না।

দেখিলাম, আনন্দে ভরপুর হইয়া আছেন। বুঝিলাম, এখন আর কোনো কথাই চলিবে না।

কতক্ষণ পর, যখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সূর্যদেব অস্তে

গিয়াছেন, ঐ সময়ে তিনি উঠিয়া বাহিবে আসিলেন। আমাকেও অনুসবণ করিতে বলিলেন।

সাধু বলিলেন :

এখন এসো, একটু বাহিবে। এখানে আমি কি নিয়ে থাকি, কিভাবে দিনপাত করি, ঘুবে ফিরে দেখবে শুনবে,—সন্ধ্যাব পরেই বাত্রেব খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক, তারপব তো সারারাত আছে।

দেখিলাম ইতিমধ্যেই আমি অপবিচিতেব ব্যবধান ছাডাইয়া মহাত্মাব বড়ই নিকটে আসিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যা হইযা আসিতেছে, সময়টা গোধূলী, এখনও অন্ধকার হয় নাই।

এসো বন্ধু, আমার অন্তঃপুব দেখবে এসো।

আমরা গুহা হইতে বাহিব হইয়া চলিতে চলিতে পায়ে পায়ে নিকটেই অপর এক গুহাদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটেই একটি অতিবৃদ্ধ পাকুড গাছ; তাহাব তলাটি দেখি আলগা পাথবে বাঁধানো, বেশ কয়েকজন বসিতে পারে। তাহাব পাশেই আমার বাহক-বন্ধু পাক করিতেছে, লোটায ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন রুটি সেঁকিতেছে। চাপাটি হাতে চাপডাইয়া যে-ভাবে রুটি এদিকে বোজ বানাই ও খাই আমায দেখিয়া সে বলিল, সন্ত মায়ীসে সব কুছ সিধা মিল গিয়া, অব বনাতা হুঁ। শুনিযা সাধু বলিলেন - তোমার বাহককে বলিলাম, আজ আব তোমায় পাকাতে হবে না, আমরা সবাই একসঙ্গেই বাত্রে খাবো। কিন্তু সে বাজী নয়, বলিল—হাম আপনা পাকায় খাবেগা,—সিধা লেউঙ্গা। কাজেই সিধা নিয়ে ইচ্ছামত তৈরী কবে নিচ্চে।

আমি বলিলাম, ভারতের এইটিই হলো বিশেষত্ব। খাওয়াব ব্যাপারে পবিত্রতা বক্ষাই ধর্ম। সাধু বলিলেন—এর মূল কারণটা আমার মনে হয় আমীষ ও নিরামিষের ব্যবধান—যাবা নিরামিষাশি তাবা আমিষাহারীদের ঘৃণা করে। বহুকালের

প্রচলিত প্রথা বলিয়া সাধু গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই গুহার দ্বার অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দেখা গেল—ভিতরে একটি নারীমূর্তি, কর্মরত অবস্থায়। বেশভূষা এই গাড়োয়ালের মেয়েদের মতই। ঘাগরা কাঁচলী, বাহিরে আসিলে একটা দোপাট্টা



বা ওড়ানা। উজ্জ্বল গোরী চাহনীতে আমার মনে হইল যেন একটু ট্যারা, কিন্তু সুন্দর মুখশ্রী—কপালে কালো টিপ্। নিঃসঙ্কোচ ভাব, তিনি আমাদের এমনভাবে দেখিলেন যেন ইহাতে তিনি চির অভ্যস্ত। তাহার হাতের কাজে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিল না নিঃসঙ্কোচ ভাবটি বড় ভাল লাগিল অথচ একটি আত্ম-সম্ভ্রম পূর্ণমাত্রায় ঐ সন্তনীর মুখে প্রকট।

একটু অগ্রসর হইয়া দ্বার হইতে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—যমুনা মায়ী, ভোজন সব কুছ বন গেয়া না? উত্তর আসিল, জী হাঁ,—আপলোগ মু হাত ধোকর আইয়ে না। সবহি তৈয়ার।

আমায় বলিলেন—চলো, আমরা ঝরণা থেকে আসি। বলিয়া একখানা আংগোছা লইয়া চলিলেন, আমি পশ্চাতেই আছি।

ঝরণায় আমরা কতক্ষণ ছিলাম, হাতমুখ ধোয়া হইলে ফিরিয়া দেখিলাম গুহায় বেশ বড় বাতি জ্বলিতেছে; আর দ্বারদেশে একটি ভিজ লণ্ঠন বেশ উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করিতেছে। বাহকও পাকুড় তলায় খাইতে বসিয়াছে।

গুহার মধ্যে তিনখানি ঠাঁই হইয়াছে। দুইখানি সামনা সামনি আব একখানি একটু দূবে একধাবে, বসিলে আমাদেব দিকেই মুখ থাকিবে। আমাদের ভোজন-পাত্র চমৎকার; পাতাগুলি বড় বড় চক্রাকার। ছোট ছোট পাতা সরু কাঠি দিযা গাঁথা,—যেমন দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে ব্যবহার আছে। পাতায় পাট করা দুইখানি কবিয়া রুটি বা পবোটা, গোলাকার এবং বড়ো আব এক-দিকে সূক্ষ্ম বাঁশমতি চাউলেব অন্ন সাজানো চূড়া করিয়া;—তাহাতে খানিক মাখন দেওয়া। যমুনা মায়ীব পাতায় একখানা রুটি, অন্নও আছে। আমাদের পাতাব উপরে ঝিঞা ও আলু বেগুনের পৃথক ভাজি। ছোট বাটিতে মুগের ডাল, পুদিনার চাটনী;—শুকনা মূলার চমৎকার তরকাবা, তাহাতে পেঁয়াজ রসুন দেওয়া;—একটু আচার কাঁচা আমের;—পাথরের বাটিতে দধি ও দুটি ক্ষীরের পেঁড়া শেষে। পেট বেশ ভরিয়া গেল।

ভোজন শেষে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মাংস পাওয়া যায় কিনা। অকপটেই সাধু বলিলেন—সপ্তাহে একদিন অথবা দুই দিন মৃগমাংস এবং বনমোরগ কখন কখনও পাওয়া যায়; আমি খাই, যমুনা মায়ী নিরামিষাশি,—তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রাঁধিয়া খাওয়ান,—ঘৃণা করেন না। বলিলেন—উপরে ভীলেরা থাকে;—তাদেরি একটি জোয়ান, যমুনা মায়ীর পুত্র সে, আমাদের জন্য শাক-সবজি, মাংস প্রয়োজন মত যোগায়;—যেদিন যা পায় নিয়ে আসে। জল তুলে কাঠ

কেটে সব কিছুই যোগাড় করিয়া দিয়া যায়। এইভাবে আমরা এখানে আছি।

কয়েক মাস আগে একজন অতিথি এসেছিলেন এদিকে। দুই দিন ছিলেন, আর আজ আপনাদের পাওয়া গেল। এখানে দু-চার দিন থাকিলে ক্ষতি কি? আসল কথাটা বলিলাম, অর্থাৎ আমার বাহকই প্রভু, সে যদি রাজি হয়তো মহা আনন্দেই থাকিব। সাধু ফিরঙ্গ-বাবা বলিলেন—আচ্ছা, তাহাকে রাজী করিবার ভার আমার। কি জানো, অতিথি আমাদের কত প্রিয়, বিশেষ মানুষ মানুষের কত প্রিয়, এই বিজন পার্বত্য জঙ্গলে থাকি তাই বুঝিতে পারি। মানুষের মধ্যে যে আমার ইষ্টরূপী মহাসত্ত্বার প্রকাশ তা এই অবস্থায় অনুভূত হয়।

এমন সরল প্রাণে—সত্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা কোথাও পূর্বে শুনি নাই। সাধুর সবটাই খোলা।

যতক্ষণ যমুনা মা'র সামনে আমরা কথা কহিতেছিলাম ভাষা হিন্দি, দুই একটা ইংরাজীও তাহার মধ্যে ছিল। ফিরঙ্গ-বাবা ইংরাজী বলেন তবে এক ধাবায় বলিতে গেলে তাহার যেন একটু বাধো বাধো ঠেকে। দেখিলাম এখন তাঁহার জীবন ভারতের জল ও হাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়া তাহাকে ঠিক ভারতেরই একজন করিয়াছে—বিশেষতঃ হিন্দি ভাষণে, কে বলিবে উনি উরোপীয়।

আহারের পর আমরা তিনজনেই বসিয়া খানিক কথাবার্তায় ছিলাম। সাধুর উদ্দেশ্য যমুনাব সঙ্গে আমার একটু পরিচয়। প্রথমে যমনা মায়ী আমাদের সঙ্গে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন,—পরে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপ্ সাধুবাবাকে সাথ মিল কৈসে? উত্তরে আমি বলিলাম, হমলোগ মাধ-মাহেশ্বরকো যাত্রী। এ রাস্তেমে কৈঁ জল মিলি নহি, তিয়াস কে মারে জল শোচতে ইহাঁ আগেয়া, জলভি মিলি ফির সন্ত মহারাজ মিলি।

এবার যমুনা মা আমায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার ধাক্কায় আমি নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিলাম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন;—আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি কিনা? - আমি উত্তরে বলিলাম—সংসার ত্যাগ আমি বিশ্বাস করি না;—তবে হিমালয় ভ্রমণ আমার ভাল লাগে আর সাধুসঙ্গই আমার কাম্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমানে ঘুরিতেছি। তখন আবার প্রশ্ন;—এখন বলো তোমার সাধন-পথ কি? কিভাবে সাধন করো? শুনিয়া আমি বলিলাম—একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন, ঠিক কি জানিতে চান। তাহাতে তিনি বলিলেন—ভগবান চাও তো? যদি চাও তাহলে তাঁকে লাভ করবার জন্য কি কর? একেবারে সোজা উলঙ্গ প্রশ্ন—এমন ভয়ানক কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিলমাত্র কপটতা ইহার সঙ্গে চলিবে না; এ বড় কঠিন পরীক্ষা অথচ যমুনা মায়ীর সঙ্গে সকল কিছুই খুলিয়া বলিবার মত এমন ঘনিষ্ঠতা নাই অথবা জন্মায় নাই; তাই একটু চাতুরী করিয়া বলিলাম; এ সকল ব্যক্তিগত ভাব এবং সাধনার কথা, সব সময়ে সকলকে খুলিয়া বলা যায় না।

শুনিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলাম—আপনি হাসলেন যে? তিনি বলিলেন—তোমার সংকোচ দেখে; আত্মগোপনের চেষ্টা দেখেই তো হাসলাম। এটিও নগ্ন সরলতা।

বুঝিলাম, ইনি সাধারণ নন। তা ছাড়া আরও স্পষ্টই বোধ হইল, আমি এঁর কাছে ছেলেমানুষ। অথচ এইটি অনুভব করিতে আমার মনে কোনো প্রকার গ্লানি বা অপমান বোধ হইল না। তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিতই রহিলেন, মধ্যে আমি যেন ছোট হইয়া গেলাম; কথা বাহির হইল না।

এইবার সাধু আমায় এই অবস্থা হইতে বাঁচাইলেন,—তিনি যমুনা মায়ীকে বলিলেন—এখন এঁকে ছেড়ে দাও, আমরা এবার

ওখানে যাই ; তুমি তো নিজের জায়গায় রয়েচ। যমুনা মায়ী বলিলেন, বেশ তো, এরপর দেখা হবে, কথা হতে পারবে। বলিয়া জোড়হাতে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। আমিও নমস্কারান্তে চলিয়া আসিলাম।

ঝকৃঝ:ক মাজা একটি বড় লোটায় জল লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং বাঁ হাতে লণ্ঠনটি লইয়া আমায় বলিলেন, এসো। এবার আমবা ক্ষুদ্রদ্বাব সেই প্রথম গুহাতেই এসে গেলাম। এখানে সাধুর আসন তো আগেই পাতা ছিল তার পাশেই আমারও শয্যা রচিত হয়েছিল। বাহক গুহাদ্বারে বসিয়া ঢুলিতেছিল। তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা উভয়েই আসনে বসিলাম। এখানে বাতিদানে বাতি জ্বালা হইল।

গুহাতলে তিন চার জন আরও শুইতে পারে এতটা স্থান আছে। ভিতরের ছাদ সাড়ে চার ফুটের বেশী নয়। সাধু বাতি জ্বালিয়া ছিলেন, লণ্ঠনটা গুহার বাহিরেই রহিল। গুহার মধ্যে আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। কোণের দিকে একটি ছোট টুলের উপর একটি ছোট টাইমপিস, তাহাতে দেখা গেল এখনও নয়টা বাজে নাই। শয়নের দেরী আছে—তা ছাড়া আজ আমাদের পরিচয়ের দিন, কথা কখন শেষ হইবে কে জানে। ঘড়ি দেখিয়া সাধু বলিলেন, এই ঘড়ি আমার এক বন্ধুর উপহার। তিনি দেখতে এসেছিলেন এখানে আমি কি ভাবে আছি। ইনি মাঝে মাঝে আসেন।

সাধুর বিছানার আশেপাশে এক গাদা খাতা-পত্র, পাশেই অনেকগুলি গুহা। ঐ খানেই ঘড়ির কাছে একটি আধারে পীতবর্ণ পেন্সিল, কালো এবং খয়েরী রং-এর তুটি ফাউন্টেন পেন। কাগজ-পত্রও কিছু কম নাই। এই সব দেখাইয়া সাধু নিজেই বলিলেন, চিঠিপত্র লিখতে হয়। আবার কখনও কখনও পাওয়াও যায়।

জার্মানীতে সহপাঠি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গেই যা কিছু পত্রাদি ব্যবহার চলে। আমার যা কিছু এখানকার অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার ঝোঁকটা তাঁরই বেশী, তাই যা কিছু লেখা সব তাঁর কাছেই পাঠাই। তিনি গত বৎসর এখানে এসেছিলেন, —কিছুদিন ছিলেনও, দেখে শুনে গেলেন। এখন তো যুদ্ধ চলছে তাঁর আর আসবার যো নেই।

সাধু যথার্থ মিতাচারী মানুষ।

যেটুকু আপনা থেকে বলবার তা প্রথম পরিচয় হিসাবে বলা হলে পর তিনি বললেন—আচ্ছা, আর আমাদের আলো দরকার কি, নিবিয়ে দি? আমার সম্মতি লইয়া তখনই বাতিটা নিভাইয়া দিলেন। আমি একটু যুত করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,— এখন বলো—

আমি বলিলাম—আপনিই বলবেন, আমি খুব ভাগ শ্রোতা। সাধু বলিলেন—আচ্ছা, যমুনা মায়ীর কাছে এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন?

বলিলাম—এখনও অপরিচিতির বাধা কাটাতে পারিনি। বিশেষতঃ একজন অতটা উচ্চাবস্থার জ্ঞানী নারী, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমান তো জানা ছিল না। তারপর বলিয়া বসিলাম,—

এখন আমার একটা প্রশ্ন জেগেছে, যদি অনুমতি দেন তো বলতে পারি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বলো না বিলম্ব কেন?

আপনার সঙ্গে যমুনামায়ীর সম্বন্ধটা কি, জানতে কৌতূহল হয়।

সাধু বাবা বলিলেন—বুঝেচি,—এখন দেখচি তোমার সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, বেশ বেশ, সুখী হলাম। এখন বলো তো —তোমার কি মনে হয়?

আমার মধ্যে সংযম-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণই আত্মগত করে দিয়েছিল। কিন্তু এখনও সিদ্ধি সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পারবো না যে আমি সংযমে সিদ্ধ হয়েছি। কারণ ওটি গর্ব করবার বিষয় নয়; ঐ গর্বটাও অসংযমের পরিচয়—তাইতে আমার ভয় আছে।

এর পর আর কথা চলেনা—অকপট এই স্বীকারোক্তিই আমার মনের সন্দেহ মলিনতা নিঃশেষে দূর করে দিয়েছিল। তারপর ইন্দ্রিয় সংযমে অধিকারের কথা কোনো অবস্থায়ই গর্বের বস্তু নয় এ কথা ঠাকুর যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন এমন আর কে দিতে পারে? সত্য সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য,—এই সব ভাবছিলাম।

সাধু এবার নিজে থেকেই বলতে আরম্ভ করলেন;—এখন যমুনা-মায়ীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথাটা সোজাসুজিই বলতে হবে, কেমন? সেটা ছয় সাত বৎসর আগেকার কথা। দীর্ঘকাল একাসনে কাটাবার পর হিমালয়ের তীর্থগুলি পর্যটন করবার সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সমতল ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমের প্রধান কোনো তীর্থই বাকী ছিল না,—হিমালয় ছাড়া। তাই এবার হিমালয়ের উদ্দেশ্যেই চলেছিলাম।

হরিদ্বার থেকেই আরম্ভ করে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত এসে প্রথমে যমুনোত্তরী যাবার জন্য গঙ্গার তীরে তীরে টীরি রাজ্য, তারপর সেখান দিয়ে ধরাসু গ্রামে এসে গেলাম। দেবপ্রয়াগ ছাড়বার পর এমন সৌন্দর্য কোনে স্থানে দেখিনি। গঙ্গার উপরেই ধরাসু। এই ধরাসুই আমায় আটকে ফেললে। ঐ গ্রামের এক প্রধান ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ বেণীমাধব শুক্ল। ভদ্রলোক গঙ্গাতীর থেকে আমায় ভিক্ষার্থে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন; এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারেই প্রতিশ্রুতি নিলেন, যে কয়দিন ইচ্ছা তাঁর ঘরেই যেন ভিক্ষা করি, অন্যত্র না যাই। সেখানেই কয়েক দিন ছিলাম।

এই যমুনা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বাল-বিধবা। তখন তার বয়স

বত্রিশের খুব বেশী হবে না, আমারই সমবয়সী। ও অঞ্চলে পর্দা প্রথা বোধ হয় ছিল না। প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতিই প্রবল ; তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য বিলাসব্যসন অথবা সামাজিকতা ওদিকে তখন প্রবেশ করেনি। নিঃসঙ্কোচেই যমুনা আমার কাছে আসতো, বসতো ; মনের কথা প্রকাশ করতো। আমার সেবার ভার তার উপরেই ছিল। ক্রমেই পরিচয় পাওয়া গেল যে, যমুনা তার পিতার কাছে গোড়া থেকেই সংস্কৃত পড়েছে, কাব্য পুরাণ, বিশেষ দর্শন শাস্ত্রের সাংখ্য ও বেদান্ত ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছে। বড় গম্ভীর প্রকৃতি তার। প্রথমে কিছু জানা যায় নি—ক্রমে ক্রমে যখন তার অধিকারের পরিচয় পেলাম, ভারতের নারী যে কতটা মহান ও সংযত চরিত্র, তখনই আমার ধারণা হলো। তিলমাত্র বিদ্যার অভিমান নেই। ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তারও আভাস পাওয়া গেল। তার মনের কথা এই যে, অর্ধেক জীবন তো সংসারে কেটে গেল, বাকী যেটুকু আছে তা আর এইভাবে নষ্ট হতে দেবো না। প্রসঙ্গক্রমে সে আমায় সব কথাই বলেছিল। তার ইচ্ছা, সে আর এভাবে সংসারে আবদ্ধ থাকবে না, -স্বাধীন পুরুষেরা যেভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করে অন্তরে তার সেই প্রবৃত্তিই তখন প্রবলভাবে কাজ করচে ; বিশেষতঃ তীর্থপ্রধান ভারতের সকল তীর্থই ও ঘুরতে চায়, দেখতে চায়, কিছুতেই আর ঘরের মধ্যে থাকবে না। আসলে সে নারী, তাই একলা বার হতে সাহস হয় না, সহায় চাই তার। শেষে আমায় ধরলে, নিঃসঙ্কোচেই বললে ; আমাকে শিষ্যা করে নিয়ে চলুন, আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানেই যাবো, সেবা করবো।

আমার পক্ষে এটা গভীর চিন্তার বিষয় তো। সহজে হল না দেখে যমুনা তার পিতাকে নিয়ে এলো আমার কাছে। তিনি তো জানতেন তাঁর সন্তানের কথা। গুরুজী বললেন, ওকে দীক্ষা দিন

এবং সঙ্গে নিয়ে যান। তীর্থ ভ্রমণের জন্য ও উন্মাদিনীর পর্যায়ে এসে পড়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই ও জীবন সার্থক করতে চায়, এখন আর কোন বাধাই চলবে না, ও আর বালিকা নয় তো। নিজ ধর্ম রক্ষা করবার শক্তি ওর আছে। আমার বিশ্বাস, ওর নিজ ধর্ম-বোধই ওকে রক্ষা করবে।

পিতা ওর শুধু স্নেহ-প্রবণ নন যথার্থই দূরদর্শী। তিনি বলে দিলেন, মন্ত্র ওর কাছেই আছে,—ওর দীক্ষা আমিই দিয়েছিলাম, এখন সেটা জেনে নিয়ে আর একবার ওর কানে শুনিয়ে দেবেন, যথাকালে তার কাজ ঠিকই হবে।

যা ভাবিনি, কখনো কল্পনাও করিনি তাই হয়ে গেল। যমুনার ঐকান্তিক আগ্রহে তার সকল কর্মই মনোমত হলে পর ;—পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী, ঘনিষ্ঠ নিকটতম প্রতিবেশী সবার কাছে বিদায় নিয়ে মহা আনন্দে যমুনা, পুরুষ বেশে পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে প্রথমেই যমুনোত্তরী ঘুরতে বেরুল। বললে—পথে পুরুষ বেশই ভালো। পথে তার সাহস দেখে আমি অবাক। তার উৎসাহ আর শ্রমশীলতা এবং তিতিক্ষা দেখে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, কোন বলিষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা কম নয় ওর শক্তি। পথে ও বিশ্রাম পর্যন্ত চায়নি। বোধ হয় সাত দিনেই আমরা তীর্থ শেষ করে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে মহা আনন্দে কয়েক দিন পিত্রালয়ে বাস করলে, তারপ আমরা গঙ্গোত্তরী যাত্রা করি। ওর প্রাণ এখন তীর্থই চাইছিল। দেখলাম, ওর পিতা খুবই আনন্দিত। এ যাত্রায় ওর পিতা কিছু ধন ওর কাছেই দিয়েছিলেন প্রয়োজন মত খরচ করতে। টাকার পরিমাণ আমি জানতাম না।

ওর মূর্তিই বদলে গিয়েছিল। মাথায় পাগড়ি দিয়ে ও পুরুষ-বেশে বেরিয়েছিল নিঃসঙ্কোচে ; হাতে পাহাড়ি লাঠি, ঠিক যেন এক

কুমার ব্রহ্মচারী। ওর চড়াই উৎরাই দেখলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে —এমন হাল্কা শরীর ছিল ওর। এবারে গোমুখ পর্যন্ত গেলাম। পরে গঙ্গোত্তরী থেকে উত্তর কাশী হয়ে আমরা ত্রিযুগী নারায়ণেই ছিলাম কয়েকদিন—তারপর গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ হয়ে আমবা ফিরে এলাম। অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম করে আমরা মধ্যে নলচটি হয়ে কালিকা তীর্থে যাত্রা করি এবং সেখান থেকেই মধ্য মহেশ্বর যাই। পথে এ গুহা ওরই আবিস্কার। ঐ সময়েই যমুনা এই গুহাতে একরাত্র বিশ্রাম করেছিল। ফিরে এসে ওঁর সঙ্কল্প হলো এইখানেই আসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাছে ঝরণা দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল। আশ্রম করবার পরও আমরা দুবার বেরিয়েছি,— মধ্য ভারতে একবার আর দক্ষিণ ভারতে একবার কয়েকমাস কাটিয়ে এসেছি আমরা।

এইখানে স্থায়ী হবার পর ওর শিক্ষাও হয়েছে অনেক। সাধনের যা কিছু আমার অধিকার সবেতেই ওর সিদ্ধি হয়েছে। মহর্ষি রমণের কৃপাও ও পেয়েছে,—শেষবার যখন আমরা দক্ষিণের তীর্থ দর্শনে যাই,—অরুণাচলে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। তখন থেকেই ওর সাধনে সিদ্ধি এসেছে। তারপর আর আমরা কোথাও যাই নি।

বুঝলাম সহজেই এখন ওর উচ্চ অবস্থা!

মেয়ে মানুষ, স্নেহপ্রবণ মন, এখানে এক ভীলের ছেলে ওকে মা বলে, ও তাকে ঠিক নিজ সন্তানের মতই স্নেহ করে। উপরে কয়েকজন ভীল আছে এ পথে, তারা সবাই ওকে মায়ের মত দেখে, বেশ একটা স্নেহের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে যমুনা মায়ীকে নিয়ে।

এই পর্যন্ত যমুনা মায়ের কথা। এরপর আর কথা চলে না। আমি তখন কিংবক্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চুপচাপ ছিলাম। তিনি বলিলেন—আজ এই পর্যন্ত কেমন? এবার শুয়ে পড়া যাক।

চিন্তা ছিল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ। বিদেশীয় একজন সাধুর মধ্যে এমন সরলতা দেখিনি।

প্রভাতে উঠেই আমি প্রথমে বাহকের গুহায় গিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়েই বললাম—আজও এখানে হয়তো আমাদের থাকতে হবে। সে তৎক্ষণাৎ বললে, হাঁ জী; সাধু মহারাজ ভি বোলা ইহাঁ দু এক রোজ ও'র ঠা'রনাই পড়ে গা। মায়ী জী ভি কাল রাতকো বোলিথি।

ক্যা বোলা?—জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল, উনো নে ভি বোলা যে,—অব ইহাঁসে জলদি যানেকো কোসিস মত করো; দু-এক রোজ ওর রহ যাবেগা তো ক্যা হৈ। হামনে বোলা ঐসাহি হোয়েগা। তখন আমি বলিলাম, দু এক রোজ ঠারনেসে তুমহারা ক্যা নুকসান? শুনিয়া সে বলিল নুক্‌সান হামারা নহি, আপিকো —হামারা ক্যা। অর্থাৎ দৈনিক চার আনা করিয়া খোরাকি দিতে হবে। আর তারও ঘরে ফিরতে বিলম্ব হবে।

ভোরেই উঠিয়া ছিলাম। সাধুও ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়াছিলেন। আসনের কাজ শেষ হইলে তখন প্রভাতে আমরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকটাই দেখিলাম। চারিদিকেই দূরে দূরে তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গগুলি;—তাহার উপর রৌদ্র ঝলমল করিতেছে, যেন স্তব্ধ স্রোত। তার মধ্যে সূর্যের সোনালি কিরণদীপ্ত একটি শৃঙ্গ দেখাইয়া সাধু বলিলেন—এটি মধ্যমহেশ্বর শৃঙ্গ।

এখানে আমরা চা পাই নাই, আমাদের এক বাটি দুধ খাওয়াই হইল, আর কিছু ভিজা ছোলা, তাও ভালো। তারপর পাকুড় তলায় বাঁধানো জায়গাটায় বসিয়াছিলাম। সাধু বলিলেন,—

ভাবছো কি, বন্ধু!

আদর্শ জীবন আপনাদের;—ঠিক তন্ত্রমতে সিদ্ধ ভৈরব ও ভৈরবীর মতই আছেন, দেখে আনন্দ হয়—তাই ভাবছি।

স্বামীজী বলিলেন—এই বা কি কথা, সদ্ভাবের উপর নরনারীর একত্র জীবন যাপন করতে গেলেই তন্ত্রমতকে আদর্শ করতে হবে।

ওটা আমিই বলছিলাম এ বিষয়ে তন্ত্রধর্ম উদার বোলে। সাধু বলিলেন—তন্ত্রধর্মের যে ভাবের প্রতিপত্তি এখানে হয়েছিল অবশ্য তাও উদারতার জন্যই বুঝতে হবে;—তাতেই সর্বভারতীয় ধর্ম হওয়াই উচিত ছিল, তা হতে পারলে না কেন? অথচ তন্ত্র-ধর্মের মত মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুগত আর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্রশক্তিব প্রয়োগ, অভিচার এসেই এবং নানা প্রকারে ঐ ধর্মের মধ্যে ব্যভিচার ঢুকেই তন্ত্রকে একেবারে ভেঙ্গে দিলে। তারপব বৈষ্ণব ধর্ম এলো;—অবতার তথা মহাপুরুষদের আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্মেব প্রচাব ও প্রতিষ্ঠা ঐ ভাবেব উদারতা নিয়ে এলো,—তারপর দুশো বৎসবেব মধ্যে বিকৃত হয়ে কতো রকম ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিতেজ হয়ে গেল। বৈদিক তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্মের তীর্থগুলি এখনও বয়েচে—ঘুবে এলেই বুঝা যাবে ধর্মের কি অবস্থা হয়েছে। ইংরাজের আমলে খৃস্ট ধমও যযাতে কম চেষ্টা কবেনি, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম জেগে উঠলো—কৃশ্চান ধর্ম থেকে ঠেকিয়ে বাখলে ভারতকে ঐ ভাবে। এখন রামকৃষ্ণ দেবের আমলই চলছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই তখন সাধু বলিলেন—ওগো নিরাশ্রয়ের আশ্রয়;—এত দিনের প্রাচীন ভারতের ধর্ম-সমাজে পথ একটা না একটা অবলম্বন হিসাবে আছেই। যে ভাবের জীবন এবং আশ্রয় তুমি চাওনা কেন, তাই আছে হিন্দু অধিকারে। আসল কথাটা এই যে—আদিম, ধর্মহীন সহজ সম্বন্ধ নিয়ে এখানে জীবন যাপন চলবেই না,—একটা ধর্মের আওতায় তাকে আসতেই হবে। এইটিই আসলে ধর্মের দিক থেকে ভারত-সভ্যতার ইতিহাস।

ধর্মের আশ্রয় না থাকলে মানুষ তো পশু হয়েই রয়ে গেল। আসলে মানুষ তো যথার্থই পশু নয় ;—আমি বলিলাম।

একটু খুলে বলো বন্ধু! না হলে সহজে মর্মকথাটা মাথায় আসছে না।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সামান্য মেতৎ পশুভিঃ নরানাম্।

আপনি তো জানেন—ধর্মোহি তেষাং দ্রবিণং বিশেষো, ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা।

শুনিয়া সন্তজী বলিলেন, চমৎকার এই মানব-ধর্ম সূত্রটি ; কিন্তু আমাদের সন্ন্যাস জীবনে তো ওর ভিতর যেতে হবেনা। এটা হলো মানব সমাজের আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম ; আমাদের তো সমাজের বাইরে স্থান,—আমরা তো বাইরে পড়ে আছি। নরনারী তো সৃষ্টির প্রতীক আর সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা ও দষ্টের সম্বন্ধ যে আমাদের। অবশিষ্ট জীবন প্রারব্ধক্ষয় অর্থাৎ বিবিধ কর্মক্ষয়, তারপর যথাকালে আত্মস্থ হওয়া। সকালে আজ এই পর্যন্ত কথা।

যমনা মা গিন্নি ভালো, আমার বাহকটিকে কাজে লাগিয়েছেন ; সে আমাদের দুধ আর দুটি ছোলা দিয়েছিল। খাওয়া হলে পাত্র নিয়ে গেল। খানিক পরে সে ঝরণার দিকে গেল বেশ কতকগুলি বাসন-কোষণ নিয়ে। আমাদের আড্ডা চললো এইখানে। দেখতে দেখতে যমনামায়ীর ভীল পুত্রটি এসে উপস্থিত ;—সাধুকে প্রণাম করলে। কিছু শাক সবজী আর একটা বনমোরগ এনেছে। এত বড় সাইজের যে মোরগ হয় আগে দেখিনি।

মাথায় চূড়া, দীর্ঘ বাহু, বলবান, ভীল যুবার নাম বাঞ্জু। তার মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ, নিখুঁত বিগ্রহ। এমন সুন্দর মূর্তি আগে দেখিনি। খুব লম্বা নয় ;- কিন্তু শরীরের আড়া, এমনই, ইয়া চওড়া বুকের পাটা আর কালো রং যে কত সুন্দর হয় বাঞ্জুকে না দেখলে ধারণা হবে না। তার সঙ্গেই দেখলাম একটি যুবতী, বেশ ফরসা মেয়ে ;—

সে এগিয়ে এসে সাধুকে প্রণাম করল। তারপর যম্‌না মায়ের গুহার দিকে চলে গেল। এই বাঞ্জু, যম্‌না মায়ের ছেলে,—এই নির্জন হিমালয় গুহাবাসী সন্ন্যাসিনীর কতো বড় সহায় তা এখানকার সবাই জানে। আমার দেখেই আনন্দ, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে!

এই ভীলকুমার বাঞ্জুর রূপে আমায় আকৃষ্ট দেখিয়া সাধু রহস্য-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—যম্‌নার সংসারের কথা আরও একটু আছে। উনি গত বৎসর বাঞ্জুর বিবাহ দিয়েছেন,—সঙ্গে ঐ যে মেয়েটি দেখলে, ওরই বৌ। মেয়েটিও এক ভীল সর্দারের মেয়ে, ওর নাম কাল্‌কা। ভীলেরা কালীভক্ত।

যাহা দেখিলাম, তাহা কল্পনাও করি নাই। ভীল হইলেও কাল্‌কা মেয়েটি মোটেই কষ্টি পাথরের কৃষ্টি নয়,—গৌরী,—কপালে সিঁদুরেব ফোঁটা তাহাকে যেন দেবী মূর্তিতেই চিহ্নিত কবিয়া দিয়াছে। পরনে ঘাগরা কাঁচলী ওড়না। এমনই চমৎকার মানাইয়াছে;—ঠিক যেন গাড়োয়ালী ক্ষত্রিয়ানী। সাধু বলিলেন, -

এদের নিয়ে যম্‌না মায়ীর বেশ সংসার খেলা চলছে। তাঁর জীবনের অতৃপ্ত বাসনা, সংসার সৃষ্টিতে বাধা পেয়েছিল যে প্রবৃত্তি এদের ভিতর দিয়েই তা সার্থক হচ্ছে। মহান এই সৃষ্টির ধারার সঙ্গে একেবারেই কাঁটায় কাঁটায় মিল। ঠিক প্রকৃতির হাতের যন্ত্র হয়েই কাজ করছে যম্‌না।

চমৎকার আনন্দময় পরিবেশ।

গত কাল দ্বিপ্রহরে যেমন ছাতু মাখন চিনি এক বাটি দুধের সঙ্গে ভোগের আয়োজন, আজও তাহাই হইল। আজ বাঞ্জু কলা আনিয়াছিল, শেষে আমরা উহাই খাইলাম। বাহিরে ঠাণ্ডা বাতাস আরম্ভ হইয়াছে, আমরা গুহার ভিতর যুত করিয়া বসিলাম, নিজ নিজ আসনে।

কথার কথা একটা, মনে উঠিল তাই বলিয়া ফেলিলাম ফিরঙ্গ-বাবাকে।

সাঁওতাল বা ভীল, এদের মধ্যে এমন ফরসা গায়ের রং আমি দেখিনি,—কালো বংশে এত ফরসা রং হঠাৎ এলো কি করে?

তিনি বলিলেন—কালোর দলে একটি গৌরবর্ণ এসে গেলো কি করে? এটা প্রাকৃত সৃষ্টির একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য, আমরা কি প্রকৃতির সকল রহস্যই ভেদ করতে পেরেছি, তুমি কি মনে কর? তাঁর কথায় বুঝিলাম তিনি এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবেন না, তাই আমিও সহজ ভাবে বলিলাম—

আপনি যা বুঝেছেন, আমিও সাধারণভাবে তাই বুঝেছি। কাজেই এখানে আপনি যা বলবেন—হয়তো আমিও ঠিক তাইই বলতে পারবো—কিন্তু তাছাড়াও নিশ্চিত কারণরূপ যে একটা প্রকৃতির গুহ্য রহস্য আছে কেবল সেইটিই বলতে পারবো না। সৃষ্টি-তত্ত্বের কতটুকুই বা মানুষের আয়ত্ত? জীব-সৃষ্টির যে সহজ সনাতন পদ্ধতি—তা সকল জীবের একই, এটা স্বভাবসিদ্ধ, কখন কাকেও শেখাবার দরকার হয় না, তারই ফলাফল আমরা কতটা জানি।

সাধু বলিলেন,—এসব বায়োলজীর ব্যাপার। বিজ্ঞানের বড় বিভাগ, সারা জীবন দিয়ে সাধনা করবার বিষয়। তবে শুনেছি হিন্দু শাস্ত্রে বাৎসায়ণ কামসূত্রে এর মৌলিক বিশ্লেষণ আছে, ওসব আমাদের বিষয় নয় বোলেই আমি ওদিকে যাইনি। শুনিয়া আমি বলিলাম—

তন্ত্রধর্মের বামাচারের মধ্যে দেখেছি, ওর অনেক রকম বিচার-বিশ্লেষণ, নারী গ্রহণের নিয়ম, হিসাব অনেক কিছুই আছে।

সাধু একটু উপেক্ষার ভাবেই বলিলেন,—

অনেক কিছুই আছে তো তন্ত্রধর্মের বিরাট পরিধির মধ্যে; কিন্তু ও সব নিয়ে কি হবে? আমরা আমাদের সহজ জ্ঞানে নারী

নিয়ে ঘর করি, অথচ নারী-প্রকৃতি বুঝতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার বুঝা যায় যে, প্রকৃতি রহস্যময়ী,—নারীকে পুরুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আড়ালেই রেখে দিয়েছেন। নারী কখনও পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবে না। কেবল জীব সৃষ্টির বেলা আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় একই গন্তব্যের পথিক হিসাবে যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু। আসলে পুরুষের কাছে রহস্য হয়েই থাকুক নারীর সব কিছু।

শুনিয়া আমি বলিলাম—নারী-প্রকৃতির গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এমন লোকও দেখেছি। অবশ্য তিনি জ্ঞান মার্গেরই মানুষ, এটা সত্য। শুনিয়া সাধু বাবা বলিলেন—তাঁর অদৃষ্টে সময়ের অনেকটাই অপব্যবহার আর শেষে অক্ষমতার জন্যে অনুতাপ আছেই। তবে এটা ঠিক, পুরুষকে সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতেই নারীর যা কিছু রূপ গুণ সব। তবে আমার একটি আবিষ্কার আছে—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলচি ;—হেথা বান্ধবী হিসাবে পুরুষের পক্ষে নারীর মত কেউ নেই ;—সর্বোৎকৃষ্ট বান্ধবী এক নারীই হতে পারে। এর ফল কখনও খারাপ হয় না। তবে এখানে ইন্দ্রিয়জ কোনো সম্বন্ধ থাকলে হবে না ও সম্বন্ধ থাকলেই বিকৃত হবে। এখানে পবিত্র ও মুক্ত ভাবের কথাই বলছি।

আমার মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল ;—যেমন আপনাদের এখানকার সম্বন্ধ !

তা বললে মিথ্যা বলা হবে না ; বললেন সাধু—এখন এর মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের একটু পরিচয় দিতে হবে। আগেই বলেছিলাম, এতদিন ব্যবহার করেও নারী-প্রকৃতি আমি বুঝতেই পারিনি। এখন তার আগে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাই বলে নেবো। কারণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার ছাড়া নারী-প্রকৃতির মধ্যে

এমনই একটি আশ্চর্য গুণ দেখেছি তাকে নারীধর্মও বলা যায়। সেটি হল তার সেবাধর্ম, এটি তাদের প্রকৃতিতে প্রবাহের মতই স্রোতস্বতী ; তারই চরিতার্থতায় তাদের জীবন পূর্ণ হয়। ও সুযোগ না পেলে যেন নারী-জীবনটাই বিফল হলো, এটি তাদের মনের কথা। দুজন ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছাকাছি এসে পড়লে দুজনেই দুজনের অন্তরের পরিচয় পেয়ে যায় ; আরও এটি লক্ষ্য করেছি,—আপন বোলে একজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে তাদের জীবন যেন বৃথা হয়ে পড়ে। কাজেই, একটি প্রীতির অবলম্বন তার চাই-ই। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ একজন সহজেই একটা গভীর বিষয় নিয়ে ডুবতে পারে তার কাছে সেইটাই সবার উপর,- কিন্তু নারীর কথাই আলাদা। একটুক্ষণ স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন,—

আশ্চর্য এই ভারতের নারী-প্রকৃতি! যমুনার সঙ্গে আজ আমার ছয় সাত বৎসর হল সম্বন্ধ চলেছে। সত্য বলতে কি, প্রথমে আমার খুবই ভয় হয়েছিল, হয়তো আমার পতনই হবে যমুনার সঙ্গে —আমার সংযম যথার্থ সংযম কিনা এইটিই হলো পরীক্ষার বিষয়। ঐ যমুনাই আমায় বাঁচিয়েছে পতন থেকে। কারণ বয়স আমাদেব একই প্রায়, তার উপর নারী থেকে তফাতে থাকার ফলে আমার অধিকার বুঝতেই পারিনি। যমুনাই নিজের দিক থেকে তার নিজ সহজ সংযমের প্রভাবেই আমায় ঐ ব্যাপারে সচেতন করে দিলে। সেও যে বেঁচে গেল তাও একটা কমপ্লেক্সের জন্যে। সেই কথাই বলবার বিষয়, এখন তোমায় বলতে পারি।

তিনি বলছেন, আমি নীরব শ্রোতা,—শুনেই যাচ্ছি তাঁদের সম্পর্কের কথা।

তাকে সঙ্গে নিয়ে কতো তীর্থস্থানে ঘুরেছি,—এইজন্যে আমার

প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এসব বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উরোপীয় এবং খৃস্টান জাতি, বোধ হয় এই ধারণায় আমার উপর, যেমন হিন্দু মেয়েদের মুসলমানের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা থাকে, ঠিক সেই জাতীয় একটা ঘৃণাও আছে ; তাব পরিচয় পাই মধ্যে মধ্যে। এই অদ্ভুত ভাব দেখে আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মেয়েদের সঙ্গে ভারতের মেয়েদের তুলনাই হয় না, সত্যই এঁরা বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি।

বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত ; আমার মুখ হইতে হঠাৎ বাহিব হইল, ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার তো। এমন একটা কমপ্লেক্স, যম্না মাব মত নারীর থাকতে পারে এটা ভাবতেই পারা যায় না।

আব আমার বিশ্বাস এই কমপ্লেক্সের জন্যই ও নিজেও বেঁচে গেল, সহজ পুরুষের আকর্ষণ থেকে। অথচ জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের উভয়েরই মিলনে কোন বাধাই ছিল না। যদি ওর মধ্যে ঐ ঘৃণাটি না থাকতো, তাহলে আমার যে কি হতো ঈশ্বরই জানেন। আমার ধারণা এই জন্যই আমাদের এই যোগাযোগ বিধাতাব অভিপ্রেত। আমি ভেবে দেখেছি,—তখন অন্তরে অন্তরে আমি মনোমত একটি সৎ সঙ্গীই চেয়েছিলাম। কিন্তু নারী-সঙ্গীর কল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু ঘটলো অচিন্তিতপূর্ব ব্যাপারে। তবে আমি অনেক গভীর এবং বিশদভাবে ভেবে দেখেছি ওঁর ঐ বিজাতীয় ঘৃণার উপযুক্ত কারণও হয়তো আছে—যা আমি অস্বীকাব করতেই পারবো না।

আমি বলিলাম,—সেকথা পরে হবে, এখন একটি কথা বলবেন আমায় ?

কি ? আচ্ছা, ঐ যে ঘৃণার কথা বলছেন, আপনি কি তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পেয়েছেন ?—শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই ; তা না হলে বলবো কেন ? প্রথম থেকেই দেখেছি, এতটা ঘনিষ্ঠ

সহযোগ, প্রীতির সম্বন্ধ আমার সঙ্গে, কিন্তু ওর খাবার বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোনো একটি জিনিস আমি স্পর্শ করলে সেটা আর স্পর্শ ই করবেন না। আমার অভ্যাস গুণে, হাতে গড়া রুটি পরোটা বেশ আসে, তরকারী বা ভাজি বেশ ভালই তৈরী করতে পারি। একদিন একটু আনন্দ করে নিজ হাতে প্রস্তুত করে দুজনে একসঙ্গে খাবো এ প্রস্তব করেছিলাম ;—কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। স্পষ্টই বললেন—ওসব দরকার কি ? একবার জ্বর হয়েছিল, এই কিছুদিন আগের কথা—আমি দুধ নিয়ে গেলাম, কিছুতেই খেলেন না, কিন্তু ঐ ভীল বাঞ্জু তার বৌ এসে দুধ গরম করে দিলে, বেশ খেলেন। এইবার তিনি চুপ করিলেন। তারপর কতক্ষণ পরে বলিলেন—একদিকে আমি ওঁর গুরুস্থানীয়, ঐ সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠার পরই সহজভাবেই আমার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হয়ে নিঃসঙ্কোচেই বেরোতে পেরেছিলেন। জানি, সেজন্য শ্রদ্ধার সীমা নেই। এমন কি গোপনে ওঁর পিতা সহস্রাধিক টাকা দিয়েছিলেন ওঁর হাতে ; তাও আমার কাছে গোপন করেননি, বরং আমায় ওটা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতেই চাইলেন। আমি কিছুতেই নিতে চাইলাম না—তখন নিজের কাছেই রেখে দিলেন। অসাধারণ মিতব্যয়ী।

আশ্চর্য এই নারী-প্রকৃতি,—বিশেষতঃ এই যমুনা আমি এর সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম না। এদিকে সকল দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যাতে আমাকে হেথা কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয়। কোন কাজেই খুঁৎ নাই। আমায় শ্রদ্ধা ও যত্নেরও সীমা নেই, কিন্তু প্রণাম করেন দূর থেকে মাটিতে মাথাটি ঠেকিয়ে ভক্তিভরে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর উঠে জোড় হাত কপাপে ঠেকিয়ে,—কখনও পা ছুঁয়ে প্রণাম নয়। প্রণাম করে উঠবার পর তার চক্ষের ভাব দেখলে মুগ্ধ না-হয়ে থাকা যায় না। অথচ ঐ বিজাতীয় ঘৃণা একটা ঠিক ভিতরে পুষে রেখেছেন, মনে হয় আমার।

এখন আমি এই কথায় যে সত্যটি উপলব্ধি করিলাম সেইটি সোজা বলিলাম,—

দেখুন, ভারতের হিন্দু মেয়েদের, বিশেষতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বিধবাদের দেহমনের পবিত্রতা এবং সংযম অটুট রাখবার ঐ এক বিচিত্র রীতি আমি বাল্যকাল থেকেই দেখে আসচি;—তাঁরা আপন পর নির্বিচারে কারো ছোঁয়া দ্রব্য ব্যবহার তো দূরের কথা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। খাওয়ার বিচার আরও ভয়ানক, নিজের হাতে পাক করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ; তাও, সকল রকম ডাল কড়াই শাক সবজি খাওয়ার বিচার আছে। এক অদ্ভুত পবিত্রতাবোধ। আমার বিশ্বাস তাঁদের ব্রহ্মচর্য রক্ষার সহায় ঐ নিয়মকে আমরা বলি শুচিবায়।

সাধু বলিলেন—ঠিক ঐভাবেই তো যমুনার ভোজন ব্যাপার দেখেছি, যখন থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়েচেন।

আমি বলিলাম—উনি বরাবরই নিজের বৈধব্যের কথা ভুলতেই পারেননি, আর নিজ আচারের ভিতর দিয়েই তা পালন করেই আসচেন। সমাজের চক্ষে উনি হিন্দু বিধবা, - যতদিন ঘরে ছিলেন সে নিয়ম ও আচার পালন করেছেন; বাইরেও তো ঠিক তাই পালন করবার কথা। এটা বাহ্য জীবনের কথা, হোন না উনি সিদ্ধ, অধ্যাত্ম মার্গে ওঁর যত উন্নতিই হোক, পার্থিব ব্যবহারে তিনি ঐভাবে চলতেই দৃঢ় সংকল্প,—এক্ষেত্রে এইটুকুই বুঝলাম। ঐ সংযমের জন্যই এখানকার সবারই শ্রদ্ধাও পেয়েছেন। কোনো একটু গলদ থাকলে কিছুতেই তা ঘটতো না।

তিনি বলিলেন—এর মধ্যে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েচে।

বললাম—বিধাতার ইচ্ছা বুঝা শক্ত, আমি তা বলতে পারবো না।

কেন? বলিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াই আমায় দেখিলেন।

এদেশে চোর ডাকাতেরাও কর্ম-সিদ্ধির জন্য ভগবানের

পূজা দিয়ে, প্রার্থনা করে যাত্রা করে ;—কর্মসিদ্ধি হলেও পূজা দেয়।

এখন একটা কথা আমার মনে এলো, আবার জিজ্ঞাসাও করিলাম—এখানে এসে আপনার অধ্যাত্ম পথের অপর কোন সঙ্গী কেউ জুটেছিল কি ?

এ পথটা এমনই ভিতরের দিকে, গভীর জঙ্গলে ঘেরা এদিকে সাধারণ হিমালয় তীর্থযাত্রীই আসে না। বোধ হয় গত ছয় মাসের মধ্যে আমাদের সঙ্গে কোন তীর্থযাত্রীর দেখা হয়নি, কেবল একদল উরোপীয়—নরওয়ের জোয়ান শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখানে যম্‌না মায়ী আর উপরের দু-চারজন ভীলই আমাকে ঠিক মানুষ হিসাবে ধাতস্থ রেখেছে, মানুষ-সঙ্গীর অভাব মিটিয়েছে।

আমার যেন যম্‌না মায়ীর সম্বন্ধে কৌতূহলের সীমা নাই। এখন তাঁহার সম্বন্ধে মূল ধারণাটা জিজ্ঞাসার ভাবেই বলিলাম,—যম্‌না মায়ী বোধ হয় পূর্বেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন,—আমার ধারণায় তিনি অসাধারণ।

উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, এমন প্রকৃতির নারীর কথা পূর্বে শুনি নাই।

সাধু বলিলেন ;—ওঁর যা কিছু দেখেচেন বা বুঝেচেন তা তপস্যা করে লাভ বা সিদ্ধির ফল নয়, যেমন আমাদের হয়েচে। যখন এইটি প্রথমে আমার লক্ষ্যের বিষয় হলো তখনই আমায় অবাক করেছিল আর ভারতীয় নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এমনই সচেতন করেছিল যে সেকথা জীবনে ভোলবার নয়। ওঁর সহজ জ্ঞান এমনই অদ্ভূত আর সত্যকেন্দ্রিক তা দেখে লজ্জা হয় আমাদের পুরুষাভিমান এবং শক্তিমত্তা বা গৌরবের কথা ভাবতে। তপস্যার উপর নির্ভর করেই আমরা শক্তিলাভ করি কিন্তু সিদ্ধি বা ইষ্টলাভ শুধুই তপস্যার ফলে লাভ করা যায় না, এটা যমুনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ

করেচি। একথা স্বীকার করতে এখন কোন সঙ্কোচ নেই যে আমরা কঠোর তপস্যা করে কেবল আত্মাভিমানকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখি, এটা সহজেই ওঁদের মত একজনের চক্ষে ধরা পড়ে যায়। যমুনার সঙ্গে যোগাযোগের পরেও আমি দীর্ঘকাল আসনে বসতাম; মন্ত্রজপের মাত্রা বাড়িয়ে ধ্যানাবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার সাধনা করেছিলাম। এটা লক্ষ্য করে একদিন বললেন,—ধ্যানে স্থিতিলাভের ওর চেয়ে আরও সহজ উপায় আছে, ওটা গৌণ। ফলে আমার যথার্থই লাভ হয়েছিল।

কিছুকাল পরেই আমরা দুজনে দক্ষিণ ভারত তীর্থভ্রমণে যাই। শেষদিকে ফেরবার সময় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যাবার আগে একটা সঙ্কোচ, নারী সঙ্গে মহর্ষি আশ্রমে যাওয়া ঠিক হবে কিনা এ কমপ্লেক্স ছিল; আশ্রমে নারী তো দেখিনি, তবে শুনেছিলাম ওঁর মা আছেন। যমুনা বললেন, চলো না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে, মহর্ষির মহর্ষিত্বের ভাল পরিচয়ই পাবে। ওঁর নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমাদের দুইজনকে দেখে কি আনন্দ মহর্ষির;—বললেন, রেয়ার এমঙ্গষ্ট্ আস্ তোমাদের দুজনের যোগাযোগ বিধাতার অভিপ্রেত, না হলে এমনটা হতেই পারতো না। তোমাদের পবিত্রতা আমায় আকৃষ্ট করেচে।

কতক্ষণ আমরা নির্বাক, নিস্তরঙ্গ একটি ভাবপ্রবাহেই ভেসে চলেছিলাম,—তারপর মনে এক প্রতিক্রিয়া সুরু হোলো,—একটা প্রশ্ন উঠলো কিন্তু বলতে সঙ্কোচ—সেটা তিনি মুখ দেখেই বুঝে ফেললেন, তখন বললেন—সঙ্কোচ ঠিক নয়—খুলেই বলা ভালো—

আমার মনে এই কথাটাই তোলপাড় চলছিল যে, আপনারা যে ভাবে আছেন—সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে এই ভাবের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বাস করা যায় কিনা?

আঃ, তুমি সেকস্ থেকে মনকে কিছুতেই তফাৎ করতে পারছো না দেখছি। যাই হোক,—এই বলে তিনি দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করে একটু ভেবে নিলেন, তারপর বললেন,—

ওটা অসম্ভব নয়, নারী যদি পুরুষের সহায় হয়। শিশুকাল থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই হয়। কিন্তু এখানে সংসার চাই যে। আচ্ছা, এটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ,—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা যৌবনে এক রকম, প্রৌঢ়ে একরকম, বৃদ্ধাবস্থায় আর এক রকম। এটা পুরুষ পক্ষে গেল,—পুরুষ পক্ষে আরও একটি মৌলিক ভাব এই যে—আসলে সৃষ্টি প্রেরণাতেই পুরুষের মনোমত নারীসঙ্গের প্রবৃত্তি। সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, গৃহস্থ হোক বা সন্ন্যাসী হোক, বয়সের ধর্ম ঠিকই থাকে। তবে সংযমের দৃঢ়তা আর মনের বলই বাঁচিয়ে দেয়। সবার বড় কার্যকারী হলো প্রবৃত্তির অভাব, এটি দেখেছি যমুনার মধ্যে ;—যেন সেই শিশুকাল থেকেই একেবারেই নিশ্চিহ্ন ওর অন্তরক্ষেত্র, এমনই প্রকৃতি। আমার বিশ্বাস, নারী স্রষ্টার কাছ থেকে পৃথকভাবেই এক বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছে—সেটা ইন্দ্রিয় সুখে উপেক্ষা,—যা পুরুষের কল্পনারও অতীত।

কেন? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন—বৃদ্ধ হলেও পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তির তাড়না সময় ও সুযোগে সারা জীবনকাল অন্ততঃ প্রচ্ছন্ন থাকবেই। প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বলে, প্রাণত্যাগের সঙ্গেই ঐ সংস্কার ত্যক্ত হয় একেবারে।

ধরুন, যৌবনের প্রভাবোত্তীর্ণ হ'য়ে বা তপস্যার ফলে যে সংযম আসে, তা স্থায়ী বলেই মনে হয়,—তা থেকেও কি পতন হয়? ধরুন আপনার মত কেউ—

কিছুই অসম্ভব নয়। বললাম না, পুরুষ শরীরে সৃষ্টি প্রবৃত্তি প্রাণের সঙ্গেই যুক্ত। ঐ প্রাণ থেকেই সৃষ্ট জীবেরও প্রাণ সঞ্চার। প্রাণের ধারা থেকেই বাসনার বেগ, শরীর ইন্দ্রিয় মিলে সৃষ্টির

খেলা, আর—বেগ ধারণের জন্য নারীও প্রস্তুত, তবেই না জীব-সৃষ্টি সম্ভব হয়! কিন্তু নারীর পক্ষে তা নয়।—নারী পুরুষকে ভ্রষ্ট করতে পারে কিন্তু পুরুষ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভ্রষ্ট করতে পারে না। পুরুষ আমরা, আমাদের সব কিছু প্রবৃত্তিঘটিত দোষ গুণ সহজেই বিচার করে বুঝে নিতে পারি। কিন্তু অপর পক্ষে আমরা যেন তাদের কোলের শিশু মাত্র। কখনই তাদের প্রকৃতির ইতি করতে পারবো না। এই যম্না মায়ী আমার জীবন-ব্যাপী অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এ নারী চরিত্র এই দেশেই সম্ভব।

আমি বললাম, রামকৃষ্ণ দেবও ঠিক ঐরকমই বলেছেন নিজ বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে।

কি, বলুন না ক্ষেত্রফল মিলিয়ে নেওয়া যাক্।

তিনি বলেছেন, মেয়েরা সাধারণতঃ দুরকম প্রকৃতি। এক হল বিদ্যাশক্তি অপর হলো অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি হলো সংসারে সকলের কল্যাণকামী এবং তাঁর সঙ্গে আপন স্বামী এবং আপনার ঈশ্বরানুরক্তি তাইতেই আনন্দ,—সব সময়েই প্রফুল্ল,—আর সবার সঙ্গেই প্রীতি থাকে তাদের,—আর অবিদ্যা শক্তি হলো নিজ ভোগ-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তার একান্ত ঝোঁক বহির্মুখী প্রবৃত্তি পার্থিব সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য কামনাময় জীবন তার।

পরমহংসদেবই নিজ স্ত্রীর সম্বন্ধে বলেছেন, সে যদি বিদ্যাশক্তি না হোতে, বহির্মুখী সংসারমনা নারী হতেন তাহলে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য রাখা অসম্ভব হতো। এমনও বলেচেন,—সংসার প্রবৃত্তি নিয়ে সে যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, কোথায় থাকতো এই সংযম, অটুট ব্রহ্মচর্য। সাধু বললেন—একথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা আমার জীবন দিয়েই অনুভব করেচি।

একটু থেমে আবার বললেন,—এখন হয়তো সংযম আমার প্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েচে, বয়সও তো হয়েছে, তাই—কিন্তু সেটা ঐ

যমুনার প্রভাবেই। তন্ত্রের সাধনার সিদ্ধির সহায়রূপিণী যে উত্তর-সাধিকার কথা আছে ইনি সেই উত্তরসাধিকার কাজ করেচেন এক মুহূর্তে আমার জীবনে আবির্ভূত হয়ে। আমি আশ্চর্য হয়েই ভাবি, বিধাতার বিধান কি বিচিত্র,—কোথাকার আমি উরোপের এক প্রান্তের অধিবাসী বিভিন্নধর্মী এক জার্মান, আর যমুনা ভারতের সুদূর হিমালয়ের এক শান্ত পল্লীবাসিনী। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যোগাযোগ ঘটলো ;—যেন বিধাতা নিজ হাতেই ঘটিয়ে দিলেন। হিন্দু ঘরের বাল্য বিধবারা যে কারণে, সাধারণতঃ যে বয়সে ঘরের বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁর মধ্যে সে-সকল কারণের কোনোটাই ছিল না। আমার কাছে নিজেই একথা যমুনাই বলেছেন যে যদি বিধাতার এমনই উদ্দেশ্য হতো যে, স্বামী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করব, তাহলে আমায় বাল্যবিধবা করলেন কেন? আমার যে প্রকৃতি, তাইতেই বুঝেছি আমার বৈধব্যই বিধাতার অভিপ্রেত ;—এইজন্যই সংসার চাইনি, কায়মনোবাক্যেই চাইনি।

তারপরও হিন্দু ঘরের নারী-জীবনে কোনও বিশেষ সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও একজন মনোমত সহায় দরকার—ঠিক ঐ জন্যই উনি আমায় আশ্রয় করেছিলেন। কোনো স্থূল ভোগের দিকে ওঁর মন কখনও ছিল না। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী পুরুষ যা করে, তীর্থ ভ্রমণ ও ভগবান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে যা কিছু ভাবে তাইতেই তাঁরও প্রবৃত্তি। ঘরে বসে তা হবার নয়, তাই ওঁর গৃহত্যাগ, ওঁর উদ্দেশ্যের কথা ওঁর জীবনেই ঢাকা থাক, কিন্তু যমুনার সঙ্গে থেকে মনে হয় আমিই বেশী উপকৃত

কিসে একটু ভেঙ্গেই বলুন না!

বিশ্ব সৃষ্টি,—নরনারীর সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধ—কেমন ভাবে তাঁরই ইচ্ছাশক্তি সংসারে নর ও নারী-জীবনে কাজ করছে, এই সকল

অনুভূতি ওঁর সঙ্গ গুণেই আমি পেয়েছি। কামগন্ধহীনা চরিত্রই এতটা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী হতে পারেন; এই সৃষ্টিতত্ত্বেই যে সকল রহস্য ওঁর সঙ্গের প্রভাবে পেয়েছি সারা জীবন দিয়েই তা আলোচনার বস্তু।

আরও একটু বলুন না, এ যোগাযোগ কি আর হবে?

আচ্ছা, আমরা সাধারণতঃ এটা তো সহজেই নারী প্রকৃতিতে দেখতে পাই, বুঝতেও পারি, যে মনের মত কাকেও পেলে তারই সেবায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে; কিন্তু সৃষ্টি বা গর্ভধারণের বিষয়ে তার প্রকৃতি অন্য ভাবে কাজ করে। সৃষ্টির ব্যাপারে তাব স্বার্থপরতার শেষ নেই. সেটি বিশ্বজননীর সৃষ্টির নিয়মের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। এখানে সে শরীরকে বিলিয়ে দিতে পারে না। নারীর মনস্তত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ধরা শক্ত। সময় সময় স্থান কিম্বা অবস্থা বিশেষে নানা দিকে লুব্ধ পুরুষকে সে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়ে,—আমিও ওঁর সেই আক্রোশ থেকে বাদ যাই নি।

তিনি আরও বললেন, সৃষ্টিমুখী হয়ে কোন পুরুষের উত্তেজিত হওয়াটা যত সহজ, নারী-প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত। তার নিজের প্রবৃত্তি না থাকলে কোনো প্রকারে তাকে ছোঁয়াও যাবে না। ঐ সময়ে, অর্থাৎ গর্ভ ধারণের প্রবৃত্তির বেলায় সে যেমন পরমা-প্রকৃতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুগামী, তাঁর সঙ্কেত বুঝে চলে, পুরুষ তা ধরতেও পারে না। ঐখানে পুরুষ অহং সর্বস্ব হয়ে আত্ম-গরিমায় সব মাটি করে নিজেকে পশুতে পরিণত করতেও তার সঙ্কোচ নেই তুচ্ছ একটু সুখের বশে। এর সার কথা এটুকু যে,—জীব-সৃষ্টির বেলা বিধাতার ইচ্ছাই নারী-ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে।

সংযত ইন্দ্রিয় পুরুষ হলেও নারীসঙ্গে অসংযত হওয়া বরং সম্ভব হতে পারে; কিন্তু সংযত নারী পুরুষ সঙ্গে থাকলেও কখনও অসংযত হবেই না,—বিচিত্র কৌশলেই সে এড়িয়ে যাবে। সৃষ্টির মূল

প্রেরণাটাই হলো নারীর; পুরুষ ঠিক যন্ত্রের মতই তার প্রভাবে কাজ করে যায়। এখানে নারী-প্রাধান্যের কারণ একটি সৃষ্টি, তাকে সে ধারণ করতে যাচ্ছে। পুরুষের বীজ আছে সত্য কিন্তু নারীর সে বীজকে বিফল করবার শক্তি আছে। সেইজন্য সৃষ্টির ব্যাপারে নারীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রবৃত্তি দরকার। নারীর প্রতি বিধাতার এই জন্যই পক্ষপাত। এখানে তারই স্বাধীনতা বেশী লক্ষ্য করার বিষয়। তবে সেটা প্রচ্ছন্ন। মনে করি আমরাও তো ভালো মতেই জানি, কিন্তু সত্যই জানিনা কেবল কি উদ্দেশ্যে আমরা নারীকে চাই। তার একটা কেবল সম্ভোগের জন্য—তার উদ্দেশ্যে শরীরে স্ফূর্তির চরিতার্থতা, তার নাম সম্ভোগের নেশা, অপরটি হলো সৃষ্টির নেশা, সে একটা পৃথক ভাবের উন্মাদনা, তার ফল জীব সৃষ্টি,—এইটির সঙ্গেই ঈশ্বরেচ্ছার যোগ থাকে। আগেই সে কথা বলেছি।

ভারতের জীবনে আমি সত্যই আর একটি জ্ঞান নারী সম্বন্ধে পেয়েছি,—সৃষ্টিধারণ ছাড়া, কল্যাণ, অকল্যাণ, সকল কর্মেই পুরুষের সহায় করেই বিধাতা নারী সৃটি করেছেন। পুরুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই দুর্দ্ধর্ষ হোক, নারী-প্রকৃতিই এমন যে সে দুরন্ত পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, পুরুষের শত অত্যাচার সহ্য করেও। কিন্তু স্বাধীনচেতা শক্তিশালী নারীর সঙ্গে তাল রেখে পুরুষের চলা সহজ হয় না। শক্তিশালী পুরুষ, উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী হলে তার জীবনে নারীর বন্ধুত্ব নিতান্তই প্রয়োজন। নারী-সঙ্গই তার জীবনকে সহজ গতি, শান্তিময় কর্মে প্রবৃত্তি দিতে পারে। আমার স্থির অভিজ্ঞতা যে পুরুষের উপযুক্ত বন্ধু, নারী ছাড়া আর কেহই নয়, বিশেষতঃ অধ্যাত্মমার্গের মানুষ যাঁরা, সংযমে যাঁরা যথার্থই দৃঢ় হয়েচেন তাদের নারী সঙ্গিনীই প্রয়োজন। এই নারীসঙ্গ লাভ যথাকালে হলে পুরুষের বৈরাগ্য

সাধনের জন্য সংসারের বাইরে যাবার অথবা শেষ সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন হয় না।

সাধুর এই কথার সমর্থনে—আমায় একটু বলিতেই হইল যে, আমাদের দেশেই এভাবের চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে নর-নারীর জীবন সম্পর্কে। দেখতে ঠিক সাধারণ গৃহস্থ,- সন্তান সন্ততি নিয়ে ঘর করেচেন অথচ অধ্যাত্ম শক্তিতে স্বামী স্ত্রী কেউ কারো গতিপথে বাধা স্বৃষ্টি করেন নি, নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে গিয়েচেন—আবার গুরুরূপে বহু সংসারীকে পথ দেখিয়ে অধ্যাত্ম-মার্গে পরিচালিত করেচেন। আমাদের দেখা সেই সব মহাত্মার প্রভাব আমাদের জীবনেও বর্তমান। তাঁরা না থাকলে আজ আমার মত একজনের অস্তিত্ব সম্ভবই হতো না। কাশীতে শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাই, শশীভূষণ সান্ন্যাল মশাই; প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পাগলা হরনাথ, ওঁকারনাথ, তারানাথ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এঁরা তো সিদ্ধ মহাপুরুষ।- আবার মহীয়সী নারী সিদ্ধযোগিনী আমাদের সামনেই রয়েছেন;—সারদা মা, গৌরী মা, আনন্দময়ী মা, যথার্থই আনন্দময়ী—এঁদের সঙ্গ মহাপুরুষ-সঙ্গের তুল্যই ফলপ্রদ। এই সব মহান আদর্শের পিছনেই আমরা জীবন সার্থক করতে এগিয়ে চলেছি।

এই কথার পরও বলিয়া ফেলিলাম,—দেখুন, এত বড় বড় অধ্যাত্ম মার্গের বড় বড় মানুষ দেখলেও এখানে আপনাদের এইভাবে নারী-সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহও করেচি।

আহা, সাধারণ মানুষের চক্ষে তো এভাবে একটি সাধুর সঙ্গে কোনো নারী রাখা স্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ উরোপীয় একজন, হৃষ্টপুষ্ট বলবান, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ব্যাপারে তো উপেক্ষণীয় নয়। আরও ওদেশে নারী সম্পর্কে জার্মানদের একটা সুনাম তো জানেন। তাই হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন উঠে থাকবে যে যমুনা

মায়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুদ্ধ কি না! তবে একথা ঠিক, আপনার দেশের মেয়ে বলেই এটা আমার পক্ষে পরম লাভের বিষয় ঘটে গিয়েছে। আপনি চেনেন তো ভারতের মেয়েদের,—সুপার ফিসিয়ালি চেনার কথা নয়, আপনার তো গভীরভাবেই জানবার কথা।

আমি—দেখুন, সেদিকে আমি ভাগ্যবান, অদৃষ্ট আমার নিতান্তই ভালো। কারণ আমারও গার্হস্থ্য জীবনে এক বিদ্যাশক্তি সরলা স্ত্রীর সঙ্গেই বিবাহ হয়েছিল, তাছাড়া যমুনা মায়ীর মত কাম-গন্ধহীন উচ্চস্তরের নারী আগেও দেখেচি। অনেক বৎসর আগের কথা, তখন আমি বীরভূমে ;—এক পাশমুক্ত সিদ্ধ যোগী তাঁরই সঙ্গে ছিলেন -এখানে সেই স্তরের আর একটি দেখবো সেটি এমনই অপ্রত্যাশিত—বিশেষতঃ, আপনার ইনি আপনাকে ধরেই গৃহ আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এসেচেন। পরে এখন জানলাম যে কী অপূর্ব সংযমের ফলে আপনাকেও তুচ্ছ ঐ ইন্দ্রিয় বিকার মুক্তও করেচেন। এর চেয়ে আশ্চর্য আর আমি হইনি। এ যোগাযোগ উভয়ত মহৎ। আবার তার উপর,—আমি আপনাদের দুজনকেই চক্ষের সামনেই দেখলাম, আপনাদের কথা শুনলাম, নিশ্চয়ই মহা ভাগ্যই বলতে হবে। আরও একটা প্রমাণ হল, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুই একটি ইন্দ্রিয়-প্রভাব-মুক্ত নরনারী জন্মান যাঁরা নিজ দৃষ্টান্তে অপরকেও প্রভাবিত করতে পারেন।

আমাদের শাস্ত্রে জীবমাত্রেই আহার নিদ্রাদির কথা তো আগেই বলেচি—সাধারণ নিম্ন বা মধ্যস্তরের মানুষ প্রায় পশু, তবে সভ্য পশু বলা যায়। আজ বিকালে এইভাবেই আমাদের কথা আরম্ভ হইল—এটা অবশ্য বর্তমান নগরবাসী সাধারণের প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির শেষ কথা।

শুনিয়া সাধু একটু তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন; তারপর বলিলেন ;—

মানব জীবনের সার্থকতার সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, ঐ পশুভাবের দৃষ্টান্তই কি তার ঠিক উপমা ?

নয় কেন, দেখুন না, পশুরা সারাদিন যেমন আহার সংগ্রহের চেষ্টায় চারদিকেই ঘুরে বেড়ায়, সাধারণ মানবও তেমনি ছোট বড় নগর বা পল্লীর প্রায় সর্বত্রই উদরান্নের জন্যে ঘুরচে। কেউ বা বসে, কেউ ঘুরে ঘুরে, কেউ টুলে, কেউ চেয়ারে, কেউ মোট নিয়ে, কেউ কোন যানবাহনযুক্ত গাড়িতে ঘুরে ঘুরে সারাদিন কাজ করে। তারপর উদরপূর্তি, শরীর সতেজ হলে তখন স্ফূর্তি, তারপর শান্তিময় নিদ্রায় প্রভাত। চাঙ্গা শরীর নিয়ে আবার সকাল থেকে দৈনন্দিন কর্মের ধারা চলতে রইল।

অবশ্য অহমিকার পূর্ণ প্রভাব আছে। সম্ভ্রম, মর্যাদার উপযুক্ত পোযাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে বাইরে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে ভদ্র বেশে উপস্থিত হওয়ার কথাও আছে। এইটাই পার্থক্য পশুর সঙ্গে সাধারণ নরনারীর, নইলে রুচি অরুচি পশু জীবনেও আছে।

গতানুগতিক জীবনে বিতৃষ্ণা এলেই না উচ্চ ভাবের দিকে মানুষের গতি হয়। সৃষ্টি প্রবৃত্তি যখনই ধর্মমুখী হয় মানুষের তখনই মনুষ্যত্বের প্রসার,—তখনই পশুভাব থেকে মুক্তি।

লজ্জাটা পশুদের নেই মানুষের আছে। তাই থেকেই সভ্যতা ও আচ্ছাদনের উৎপত্তি, আর ফ্যাসান বা অলঙ্কারের শোভা সেটা তো বিলাসিতার মধ্যেই গেল আর প্রয়োজনবোধের কাল্পনিক বিস্তার, রুচির বিকার তার সঙ্গে। আর সুবর্ণ মণিরত্নাদি ব্যবহার বিলাস মাত্র, নারীপক্ষে আকর্ষণ বাড়াবার জন্য আত্মাভিমান, অধিকার, গর্ব, শক্তি জাহির করার নেশা। এইভাবেই কত জন্ম জন্মান্তর ঘটে যায় তবেই না বাহ্য বিষয়গুলি তুচ্ছ হয় আর তখনই ধর্মরাজ্যে

প্রবেশ কথা। একটু দেখলেই বুঝা যায় যে সাধারণ মানুষ সমাজের শিশু বালক যুবা প্রৌঢ়, বৃদ্ধের দল, পশুভাবের প্রভাব থেকে কতটা উন্নত হয়েচে বা হতে পেরেচে।

সাধু বলিলেন,—সাধারণ মানুষের মধ্যেও তো ধর্মের প্রেরণা, বিবেকবুদ্ধির প্রভাব আছে; একেবারে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন সাধারণ মানুষ কি সম্ভব?

ধর্মের উৎপত্তি বুদ্ধি বা চৈতন্যের প্রভাবে, মানুষ সাধারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে আছেই, বুদ্ধিপূর্বক কত রকমের কত কর্মই না করতে হয়। চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ প্রস্তৃত কর্মে, বুদ্ধিপূর্বক হিংসার পরিচয়ও আছে—আবার ধনোপার্জনও তো ঐ বুদ্ধি সম্বল করেই চরিতার্থ হচ্চে। মানবের ঐসব স্তর থেকে অধ্যাত্ম স্তরে অবস্থান্তরিত হতে সময় লাগবে তো? এধারে ভোগতৃষ্ণা, ইচ্ছাময় মনের প্রবল তৃষ্ণা মেটাতেও বড় কম জন্মও যায় না,—তবেই না মানব চৈতন্যমুখী হয়। তারপর স্তর পেরিয়ে মুমুক্ষত্ব এলে তবেই না মুক্তি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য ছটফটানি আসে।

এই আলোচনাটা এবার এলো মানুষের প্রাথমিক আকর্ষণ রূপকে নিয়ে। ঐ রূপ থেকেই সকল কিছু ভোগের প্রবৃত্তি। মানুষের মূর্তি স্থূল হলেও প্রধানতঃ শরীর নিয়ে তারই সঙ্গে নিজ অস্তিত্ব অর্থাৎ দেহাত্মবোধ জাগায়, এই দেহ আশ্রয় করেই আমি আছি এই বোধই সহজ। তার সঙ্গে একটি নাম প্রথম পারিবারিক, তারপর সামাজিক পরিচয়ের কথাও আছে ঐ নাম আর রূপকে ধরেই। মানুষকে কি স্বাভাবিক অবস্থায় রেখেচে তার পরিবেশ? সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান মানুষকে কত রকমেই না বেঁধেছে; আর্য রীতি-নীতি ও নিয়মের নাগপাশে জন্ম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত, মৃত্যু হলেও যেন তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। আজ যদি মানুষ বনে

জঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে থাকতো তাহলে কত সহজেই তার সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকশিত হতে পারতো আর যথাকালে একটি জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনে তার সৃষ্টির সঙ্গে স্থিতি ও লয়ের সকল রহস্যই স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে যথানিয়মেই ভেদ হয়ে যেতো, জীবরূপে তার উৎপত্তি সার্থক হতো। তা না হয়ে,—এখন সহরবাসী হয়ে কত দিকে কত অভাব, কত রকম অভিযোগের কত রকমের শাস্তিভোগ থেকে যেন নিষ্কৃতি নেই।

কিন্তু সে জীবন তো হবার নয়। হলেও মানুষ বনেই নগর গড়তো, যেমন আগে গড়েচে। এখন প্রাণের গতি,—সর্ববিধ কর্মে প্রত্যেকে চলা বলা কলা সৃষ্টি সবই দ্রুত লয়েই ঘটতে বাধ্য করেচে। প্রবল প্রাণশক্তি তার বাঁচার জন্য কতো দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। কাজেই বিচিত্র এই গতির জটিলতা কাটিয়ে তার সহজ আত্ম-জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কত কম। কাবণ সে স্থির হবে কি করে? এখন, মানব সন্তানেব কথাই বলচি,—যৌবনের সহজ উন্মেষের সহজ গতি কোথায়? নির্জন অবস্থায় যেগুলি উন্মেষের সুযোগ, সময়ে সময়ে কৃত্রিম ভাবে তার উন্মেষ ঘটাচ্চে এ হট্টগোলের মধ্যে। তার প্রিয়তম বন্ধুরূপী সেই নিঃসঙ্গতা কোথায়? অবশ্য আশেপাশে টেনে টুনে যে নির্জনতাটুকু তাই বা অবাধ কোথা? নির্জনতা উপভোগ তো সমস্যা এই নাগরিক জীবনে।

সাধারণতঃ কিশোর কিশোরীরা এ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ সঙ্গী-সঙ্গই চায়; দেখেচি তারা সঙ্গই খোঁজে বেশীর ভাগ সময়ে, সেটি না হলে ঐ অবস্থায় তার নিজেকে বড় একলা ও অসহায় বোধ হয়। অথচ ঘনিষ্ঠতার ফলে যার প্রবৃত্তি কতকটা বিকৃত হয়ে পড়চে, সে সকল সংশোধন করতে তার নির্জন স্থানে, নীরব ক্ষেত্রে তার কতকটা চিন্তার সুযোগ বা অবসর কোথা? সবাই একলা থাকতে চায়না বটে, কিন্তু এক শ্রেণীর সুস্থমনা কিশোর

কিশোরীরাও মাঝে মাঝে নির্জনতাই খোঁজে নিজ কর্তব্য স্থির করতে। সে নিজে গন্তব্যভ্রষ্ট হয়ে কোথায় কোন্ বিপথে চলেছে এটাও তাকে ভেবেচিন্তে নিশ্চিত হতে হবে না? এত ভীড়ে মানুষ তো সহজেই বিপথে যেতে অভ্যস্ত,—কিন্তু এখন কি করে নিজে সৎভাবের ক্ষেত্রে আসতে পারবে? তারও তো একটু খোলা পথ চাই। নিঃসঙ্গতাই তাকে লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারে। তখন সে আপনার মধ্যে আপনাকে ধরতে পারে, নিজেকে ভালভাবে পায়। তারা ঘুম থেকে উঠে ক্রমাগত সঙ্গ-সঙ্গীর গুণে তার আর নিজেকে নিজের মধ্যে পাবাব সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই তার জীবন খানিকটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে নাকি?

এখানে কেউ যে নিজেকে নিজের ভিতর পাচ্ছে না এটা কি আরও বেশী বলবার কথা?

সত্য,—ক্রমান্বয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট অল্প পরিসর কোলাহলমুখব পরিবেশের মধ্যে মনুষ হওয়ার ফলে তাদের মতিগতির কোন স্থিরতা নেই, তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় নির্জনতার অভাবে। অবশ্য সবাই যে এভাবে জ্ঞান বুদ্ধিহীন হয়ে অসংযমের পথে উন্মত্ত হয়ে ছুটেচে ঠিক তা নয়। ওরই মধ্যে এমন অনেক কিশোর বা যুবা নবীনকে দেখা যায় ঐ সহপাঠি বা সহকর্মিদের সঙ্গ থেকে খানিক তফাতে গিয়ে নিজ বুদ্ধির প্রেরণায় খানিক ভাবতে পারে বা চিন্তার সুযোগ চায়। তাদের ভেবে-চিন্তে দেখার প্রবৃত্তি আছে বলে।

সৎ পরিবেশেব অভাবের কথাই হলো আসল, তারই অভাব থেকে যতকিছু অশান্তি ও অভাবের উৎপত্তি। সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তোষের সৃষ্টি, যেন অভাবের প্রবল বন্যায় এ সময়ে বালক ও যুবাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পিতা—যারা নিজ শক্তিহীনতা, অক্ষমতা ও দুরদৃষ্টের ফলে সাধু দেখলেই হ্যাংলোমো,

আমাদের কিসে অভাব ঘোচে। বংশধরদের মধ্যেও অভাব ও অভিযোগের বিষ সঞ্চারিত করে তাদের মধ্যেও সহজবুদ্ধির প্রেরণা-গুলি সংহত হতে দিচ্ছে না।

যৌবনের ধর্মে তারা স্থির হতে না পেরে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে সহজে মেতে উঠতেই চাইচে এখন। উরোপ আমেরিকার কথা, রাষ্ট্রীক, পারিবারিক, সামাজিক অশান্তির বহ্নিতে যেমন তাদের সমাজকে একটা ধ্বংসের ভিতর দিয়ে গড়তে চেষ্টা করচে, এখনও অক্ষম বোলে নিরন্তর অসন্তোষের আগুনেই জ্বলছে। এদেরও তাই করা চাই, না হলে যেন পথই নেই। ভ্রান্ত আদর্শের এই বিজাতীয় প্রভাব কতটা অস্থির করেচে তাদের চিত্ত।

শেষে ফিরঙ্গ-বাবাই এর অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রকাশ করে দিলেন এই বোলে যে, জটিল এই নগরবাসী জীবনই জীবের আত্ম-বিস্মৃতির ফল,—শক্তি সর্বস্ব হবার জন্যই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, শেষে জাতিগত ভাবে কি প্রবল চেষ্টা, কি কঠোর তপস্যা? আর যত শক্তির দিকে গতি, ততই আত্মার চৈতন্য থেকে চ্যুতি—ফলে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই তো দুনিয়ার স্বস্তিহীন অবস্থার রহস্য। কে কাকে বুঝায়? অথচ এ খেলাটি তাঁরই।

রাত্রে আজ আহারাদির পর নিজ নিজ আসনে আসিয়া বসিবার পর ফিরঙ্গ-বাবাই আমাদের দিকে ফিরিয়া বড়ই প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠেই বলিলেন,—কি ভাবচেন? তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—তা তো আপনি জানেন,—প্রথমেই তো বলেছিলাম। শুনিবামাত্রই তিনি বুঝিলেন এবং বলিলেন—ও হো, মহর্ষির কথা! আপনি এখনও ভুলে যাননি। আমি বলিলাম—দেখুন! আমার বড় দুঃখ যে দক্ষিণ ভারতে এতদিন থেকেও আমি বঞ্চিত হয়েছি

এই জন্যই আমার কৌতূহল যতটা, আগ্রহও তার চেয়ে কম নয় ;—আগাগেড়ো তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যবহার—

আমি বুঝেছি সেটা ; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার কেমন একটা বড় অদ্ভুত সঙ্কোচ আসে। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার বড় বেশী কথা হয়নি, তবে যে ব্যবহারটা হয়েছিল তা আমি সহজেই বলতে পারবো। আমাদের উরোপীয় মনে, সকল অবস্থায় একটা বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ বাইরের লোকের কাছে জানাবার ব্যাপার আছে। উরোপে, তুমি জানো রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের যাঁরা সাধু, গুরুস্থানীয় তাঁদেরও বাইরের বেশভূষা, যেখানে থাকেন, সেস্থানের আসবাবপত্র যা কিছু বাইরের লোককে আকৃষ্ট করবার একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন আছে। তাইতে সহজেই বুঝা যায় ইনি সাধারণ থেকে পৃথক, অসাধারণ,—বিশেষ একজন চিহ্নিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর দল বা সম্প্রদায়গত চিহ্ন, উচ্চভাব এবং আদর্শের প্রতীক বা চিহ্ন থাকবেই ; যাতে সাধারণ ব্যক্তি তাঁর মহাত্ম্য অনুভব করতে পারে। এখানে ভারতে অবশ্য সাধারণ সাধুও সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, বেশভূষা, ভেক যাকে বলে, অবলম্বন হিসাবে অনেক কিছু প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এখানকার সরলতা ওদেশে নেই। সবার উপর যেটা আমি বলতে চেয়েছি সেটা এই যে, বিচিত্র এই ভারত-ভূমিতে যাঁরা উচ্চতম অবস্থায় পোঁছেচেন, এখানকার শাস্ত্রীয় নির্দেশমত যাঁরা জগৎগুরু স্থানীয়, এখানকার সিদ্ধ, পরমহংস স্তরেব যাঁরা, তাঁরা এতটা প্রচ্ছন্ন এতটাই সহজ, সাধারণ জীবের সঙ্গে মেশানো যে তাঁদের আবিস্কার করাও কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কার অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিস্কারের তুলনায় কম গভীর নয়। এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আমার ঐ রমণ ঋষির সান্নিধ্যে ঘটেছিল।

আমি রামকৃষ্ণকে দেখিনি। এখানে এসেই স্থানে স্থানে তাঁর কথা শুনেছি বাঙ্গলায়ও শুনেছি,—দক্ষিণে মাদ্রাসে, ব্যাঙ্গালোরে এমন কি কন্যাকুমারীতেও শুনেছি। শিষ্যশ্রেণীর দুই একজনের সঙ্গ করে জেনেচি। ফটো দেখেছি, খুব ভাল করেই দেখেছি,—ফটো তাঁর যতই খারাপ হোক তাঁর যে চক্ষু দেখেছি তাইতেই আমাকে স্তম্ভিত করেচে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ ফটোতে যা দেখা যায় কিম্বা সেই জীবিত চামুষটির মুখপানে চাইলেই প্রত্যেক মানুষের চক্ষে জীবনের আলো বলতে একটা আমির প্রকাশ এতই স্পষ্ট যে কাকেও বুঝাবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রামকৃষ্ণের মূর্তিতে যে চক্ষু, তাইতে ঐ আমির এতটা অভাব, অসম্ভব রকমের লুপ্ত, আর কোন জীবিত মানুষের মধ্যে এ পর্যন্ত দেখলাম না। আমাদের মহর্ষি রমণের চক্ষের দৃষ্টিতে এমনই একটা জীবন্ত আমি সময় সময়—বেশী সময়েই দেখা যেতো, সেও চমৎকার। যাকে তিনি দেখেছেন তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন বুঝা যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের তুলনা নাই। সারা উরোপ তো আগেই ঘুরেছি এবং ভারতেরও বোধ হয় অনেক প্রদেশ ও নানা অঞ্চলে কম ভ্রমণ করিনি—কিন্তু এমন সমাধিস্থ মূর্তি আর দেখলাম না। এখন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ;—

মহর্ষির মূর্তি দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল, আগে যে আকর্ষণের কথা বলছিলেন ?

সাধু বললেন—প্রথমে দর্শনে যখন আমি দ্বারপথ অতিক্রম করে, ভিতরের অনেকেই একত্রিত হয়েছেন এমনই সভার এক প্রান্তেই বসলাম ; তাঁর দিকে আবার চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, তিনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠিক যেন পরিচিত অতি প্রিয় ঘনিষ্ঠ একজনের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে যেমন সত্যই হয়—আমার ঠিক সেই রকমই মনে হয়েছিল। আমার ভিতরটা গুরু

শুরু করে সর্ব শরীরে সঞ্চারিত আর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের মধ্যে এক শীতলধারা বয়ে গেল, আর কিছুই বুঝলাম না। তবে সেটা অল্পক্ষণেই শান্ত হয়ে এলো; সহজও হয়ে গেল। তারপর আমায় একেবারেই স্থির করে দিলে;—ভয় ও আনন্দ এই দুই ভাব আমার মধ্যে পৃথক আর রইল না। আশ্চর্য, এমন দুয়ের মেশামেশি আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। এখন আমার মধ্যে আর কোন কথাই উঠল না, জীবন্ত অনুভূতি এখন ঘন হয়ে আমার অস্তিত্বের সবটুকুই গ্রাস করে ফেললে।

আসনে একই অবস্থায় রইলাম কতক্ষণ—শেষে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম ওখানে আর কেউ নেই; রমণ মহর্ষি তখন সবেমাত্র নিজের আসন ছেড়ে উঠেছেন,—তাঁর কাছেই একজন দাঁড়িয়ে।

মহর্ষি অতি মৃদুস্বরে সেই লোকটিকে কিছু বললেন। তখন তিনি আমার কাছে এসে বেশ স্পষ্ট ইংরাজীতেই বললেন—এখন আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি? আমাদের ভোজনের সময় হয়েচে।

আমি শুনলুম তার কথা, কিন্তু প্রথমেই যেন অর্থবোধ হলো না, আমি হাঁ করে তাঁর দিকেই চেয়ে রইলাম। তারপর তিনি মহর্ষির দিকে তাকিয়ে বললেন,—মহর্ষি বলছেন আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আপনি কাল থেকে অভুক্ত।

বলতে গেলে সত্যই আমি গতকাল রাত্র থেকে অভুক্ত একথা তখনই আমার স্মরণ হলো।

বিনা বাক্যে আমি যন্ত্রবৎ উঠলাম এবং তাদের অনুগামী হলাম।

তখন একটা নেশার ঘোর আমার মধ্যে ছিল, একটা ভাবুলতা,—সে আমার নিজেরই মনে হল, এটা আমার পক্ষে

অস্বাভাবিক কিন্তু আনন্দদায়ক। পরে অবশ্যই এর কারণ জেনেছিলাম।

একই সঙ্গে অনেকেই খেতে বসলেন।—তার সঙ্গে মহর্ষিও বসেছেন,—আমাকে ঠিক তাঁর পাশের আসনেই বসতে দিলেন। খেতে বসে, যা খাই অমৃত; এমন অমৃতপূর্ণ খাদ্য কখনও আগে খাইনি। অথচ ভাত ডাল ভাজি এই সবই ছিল সুন্দর, পবিত্র। ঘৃত ছিল প্রত্যেক গ্রাসে। কি খেলাম—আর কি খেলাম না তার কথায় কাজ নেই,—যখন সবাই উঠলো আমিও উঠলাম।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আপন খেয়ালে সামনের জমিতে একটা গাছের কাছেই বসেছি। মহর্ষি তখন একটু এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিলেন। আমি কখনও কখনও তাঁর দিকেই দেখছিলাম, কেমন একটা অপূর্বভাবে বিভোর হয়েই সেই দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি মহর্ষি আমারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি কোন রকম চঞ্চল না হয়ে বসেই রইলাম।

এবার তিনি নিঃশব্দে আমার সামনে বসলেন;—কতক্ষণ নির্বাক, বসেই রইলেন। আমার মনে কোন প্রশ্নই নেই, কোন কিছু জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিও নেই, চাইবার কিছুই নাই; যেন আমার সর্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে। এবার শুনলাম তিনি বলছেন,—

তুমি এখানে (ভারতে) যখন এসেছিলে, একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব লাভ ছাড়া মনে তোমার অন্য কোনও অভিসন্ধি ছিল না; কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন অধ্যয়নের পর,—নানস্থানে ভ্রমণকালে তোমার মধ্যে যোগ সাধনার এখন যমনিয়মাদির সাধন, বিশেষ প্রাণায়ামের উপর ঝোঁক এসে গিয়েছে। আসলে তোমার লক্ষ্য যদি স্থির হয়ে থাকে, ঠিক কোন্‌টা তুমি চাও এটি ধরতে পেরে থাক তা হলে আমি তোমায় সহজেই কিছু সাহায্য করতে পারি।

প্রাণ আমার আনন্দে চঞ্চল যেন বিহ্বল হয়ে উঠলো। আমার

মুখে কতক্ষণ কোন কথাই এলো না। কতক্ষণ পর মনে মনে বেশ গুছিয়ে নিয়ে বললাম,—

এই যে পাতঞ্জলের যম নিয়মাদি এ একটি উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক সাধনের পথ। তারই ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে, সেগুলি নিজে করে দেখবার প্রবল ইচ্ছাই হয়েছিল তাই ওদিকে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখার পর সেদিকে আর মন নেই। যা পেলে সব পাওয়া হয়, যা সর্বাপেক্ষা গুরু আমার তাই চাই, আপনি তো জানেন সেটা কি বস্তু।

অত্যন্ত স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—তাহাই হবে তোমার। ক্ষেত্রটি তোমার তৈরী। তপস্যা অথবা জপ প্রাণায়ামাদি কিছুই ক'রো না—কোন প্রয়োজনই নেই। সহজ জ্ঞান আপনা থেকেই আসবে,—কেবল এইটুকু ক'রো, যেন ঈশ্বর লাভের জন্য কিছু করবার ইচ্ছায় মন টেনে নিয়ে যেতে না পারে।

কোন কাজ করতে মানা করছেন কি ?

না না, শরীর মনের কাজ, যা দরকার মনে হয় তা সবই করবে। কেবল নিজ ইষ্টলাভের উদ্দেশ্যে কাজ, বিশেষ কিছু করতে হবে না। একটু অগ্রসর হলে আপনিই বুঝতে পারবে কোন্ কাজ করতে হবে আর কোন্ কাজ করতে হবে না। এই পর্যন্ত কথা। আমার সঙ্গে তার কথা শেষ হতেই সোজা তিনি চলে গেলেন। ঘরে গেলেন না—ফাঁকায় রইলেন অনেকক্ষণ। যখন সন্ধ্যা হলো, এক-জন আমার একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কুটিরটি ছোট্ট,—একজনের থাকবার মতো একটা খাটিয়াও ছিল, তিনি বললেন আপনি এইখানেই শোবেন। একটা ভিজ লণ্ঠনও রেখে গেলেন। অন্ধকার রাত্রে বিনা আলোয় বার হতে বারণ করলেন, সাপ খোপ আছে, তারা রাত্রেই বেরোয়। দেখলাম আমার সঙ্গে যে বাক্স ও আর সামান্য কিছু একটা থলের মধ্যে ছিল, সঙ্গে আমার বেডিং ইত্যাদি

সযত্নে এখানে রাখা আছে,—মেজেতে একখানা চেটাই বিছানো আছে।

তিন দিন মাত্র ছিলাম। ঐ তিনটি দিন আমার সর্বার্থ সিদ্ধির দিন বললেও চলে। যা কিছু আমার প্রাপ্য ঐ তিনটি দিন ও তিনটি রাতের মধ্যেই হয়ে গেল। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম,—রাত্রে যেমন সকলে খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে ইনি ঘুমান না। বিছানায় বসে থাকেন, কখনও শুয়ে থাকেন, কখনও বা বাইরে বেরিয়ে পড়েন আর ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান। ঐ তিন রাত দিনের মধ্যে একদিন ঘুরতে ঘুরতে গভীর রাত্রে এসে পড়লেন আমার ঘরে। তখন আমি লণ্ঠনের আলোয় আপন অভিজ্ঞতার কথাই খাতায় লিখছিলাম। আমার অনুভূতি যা যা হচ্ছিল লেখবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। তিনি এলেন, দরজা খোলাই ছিল। এসে বসলেন কতক্ষণ, কথাই নেই প্রথমে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ঘুমান নি ?

বললেন হাঁ, ঘুমিয়েছিলাম কিছুক্ষণ ;—সে হয়ে গিয়েছে। এখন একটা কথা শোনো ;—তুমি এসব লিখতে চেষ্টা কোরো না। এখন এই সব অনুভূতি তোমার সম্পূর্ণ নয় ; ও চেষ্টাও এখন নয়।

ভেবে দেখ। আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললেন ;— ঐ প্রবৃত্তিটাই আপন পথে তোমায় সোজা যেতে দেবে না ;—বাধা হবে। এখন ঐ লেখবার,—লিখে এখনকার মনোভাব প্রকাশ করার লোভটা সম্বরণ করো ; ওটা ভাল নয় এখন—তোমার ইষ্ট লাভের অন্তরায় বলেই জানবে।

আমার অন্তরে তখনই তাঁর কথার মর্মার্থ বুঝতে বিলম্ব হলো না ;—বুঝলাম। তিনিও বুঝলেন যে আমি ধরতে পেরেছি তাঁর উপদেশ ;—খুশি হয়েই চলে গেলেন। এমন উদার এবং

যথার্থ গুরু কাকে বলে—এই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম।

যাবার আগে আর একবার দেখা হলো। বললেন, এখন তুমি উত্তরে যাবে সংকল্প করেছ, হিমালয়ে ঘুরবে ;—বেশ ভাল হবে। আর কোন কথাই নয়। আমার ধর্ম সেই থেকে সাধনার বস্তু মাত্র নয়, অনুভূতির বস্তুই হয়ে গিয়েচে। মধ্যে মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়, তখন খানিক ঘুরেই বেড়াই ; আবার এসে আপন আসনে বসি। ভারতে এসে এই সব আমার সম্পূর্ণ লাভের বিষয় ঘটেছে।

কতক্ষণ পরে আপনা আপনিই বলিতেছেন ;—প্রথমে কিছুদিন বিদ্যালাভ, তারপর কিছুদিন পর্যটন,—ঘড়িওয়ালা বাবার সঙ্গ—তারপর বেশ কিছুদিন ধর্ম সাধনের ক্রিয়াকর্ম—তারই উদ্দেশ্যে কিছু তপস্যা,—শেষে মহর্ষির সঙ্গ এবং সাধনের শেষ। চুপচাপ বসে যাও। আনন্দ আনন্দ আনন্দ।

বললাম, চমৎকার,—সত্যই আমার এখানে আসা সার্থক হলো।

তিনি বললেন,—সেটা তোমার কথা ;—আমার কথা এই যে, ঈশ্বর লাভের জন্য কারো কিছু করবার নেই, যথাকালেই ওটা হয়। শুধু অহম্ সত্ত্বার পানে লক্ষ্য রাখাই কাজ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসও এই কথাটি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবেই বলেছেন, তাই সাধারণ মানুষে ধরতে পারেনি। এই কথাটি আমি তখন বললাম।

সাধু বলিলেন ;—সকল আপ্তপুরুষে শেষ কথাটি একই। তবে রামকৃষ্ণদেব ঐ 'আমি' নিয়ে সাধারণকে একটু ধোঁকায় ফেলেচেন।

আপনি কেমন করে জানলেন ?

শান্তিনিকেতনে যখন ছিলাম, ওখানকার পণ্ডিতের কাছে ঐ কথা শুনি। তিনি আমায় বাংলা থেকে তাঁর মুখের ভারবেটিম কথাগুলি শুনিয়ে ইংরাজিতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতেই বুঝেছিলাম যে তিনি আমিকে নিয়ে সাধারণের অহমিকার নির্ঘাৎ কুফল থেকে বাঁচাতেই ঐ ভাবে বুঝিয়েচেন।

কিন্তু তিনি একথাও বলেচেন,—আত্মা-ব্রহ্ম-ভগবান একই।

এই 'আমি' যার নামরূপাদির সঙ্গে এই সংসার ভোগ চলচে, সেই আমিই যে অপরদিকে নামরূপহীন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এটা বিশদভাবে কোথাও বুঝিয়ে দেননি।

কেন দেবেন না;—পাত্র বা আধার হিসাবেই বুঝিয়েছেন। ঐ তো সৎগুরুরই কাজ;—যাকে তাকে অথবা সকল ক্ষেত্রেই একভাবেই বলে দেবার কথা তো নয়, এটা মূলতত্ত্ব কি সবার কাছে খোলা যায়? তাইতে ফল খারাপ হয় যে;—একথা ঠাকুর যেমন চমৎকার বুঝতেন এমন তো আর কাকেও দেখলাম না। কে কোন্ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান নিতে পারবে তার হিসাব আছে তো?

আমার এই কথাটিতে ফিরঙ্গ-বাবা যেন চিন্তিত হলেন;—কতক্ষণ পর বললেন,—সত্য তত্ত্ব একই ভাবে, একই পদ্ধতিতে বলা বা প্রচার করাই উচিত—তা হলে কোথাও কোন গরমিলের আশঙ্কা থাকে না; আমরা তো এই রকমই বুঝি। দেখ, মহর্ষি রমণ কোথাও কারো কাছে দুরকম বলেন নি; যাকে বলেছেন ঐ 'আমি'কে ধরতেই বলেছেন;—অন্য কোন ভাবে অন্য অর্থে ব্যবহার করেন নি, তাইতে তাঁর কাজ সোজাই হতে পেরেচে। সকলকার কাছেই একই রকম।

কিন্তু সকল মানুষের মন বুদ্ধি তো একই রকম নয়; কেউ সোজা বোঝে, কারো সেন্টিমেণ্ট, ভাবধারা অন্যরকম;—কারো রূপে বিশ্বাস, কারো নিরাকার চৈতন্যের উপর লক্ষ্য; এই সব ভিন্ন

ভিন্ন আধারে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করা কি সহজ! কাজেই যার ভাবটি যেমন তাকে তেমনি করেই বলা ভালো। আসলে সবার মধ্যে সেই সত্ত্বা তো একই কিন্তু কেউ ভোগ চায় কেউ চায় ত্যাগ। আনন্দ উপলব্ধিটা সবারই একই বটে কিন্তু কর্ম-প্রকরণ, চিন্তা, জীবনধারা তো সবার এক ভাবেই চলে না।

কিন্তু ঐ আমিকে ধরেই তো সব?

তবুও ঐ আমির প্রকারভেদ আছে তো; সব আমি কি চৈতন্য সত্ত্বামাত্র লক্ষ্য করতে পারে। কোনো আমি প্রভু-ভৃত্য বা সন্তান আমি, এ ভাবটা ধরতে পারে কিন্তু আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এ ভাবতেই পারেনা। কাজেই আমির ব্যাপারটি জটিল বলেই সবাইকেই তিনি আত্মতত্ত্বটি একই ভাবে বুঝাতে চাননি।

আসলে বুঝলাম, ফিরঙ্গ-বাবা—মহর্ষি রমণের টেক্‌নিকটাই ধরেচেন মন-প্রাণ দিয়ে, পরমহংসদেবকে ভাল করে গভীরভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পান নি। ফলে মহর্ষির উপরই তাঁর নিষ্ঠা প্রবল হতে পেরেছে, তাইতে তাঁর লাভও অনেক হয়েছে। জীবিত ভগবানকে পাওয়ার ঐটিই মুখ্য লাভ, প্রত্যক্ষানুভূতি। এখন আমায় একটু ভাবতে দেখেই বললেন; আপনি হয়তো ভাবচেন আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর অবিচার করচি।

আমি বলতে বাধ্য হলাম; ঠিক তা আমি মনে করিনি তবে আমি আসল কারণটা, অর্থাৎ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে আপনার ভাল রকম না জানবার কারণটিই আলোচনা করছিলাম মনে মনে।

কি রকম?—

আপনি রমণ মহর্ষিকে সশরীরে জীবন্ত পেয়েছেন, তাঁর পার্‌শ্রোন্যাল ম্যাগনেটিসম-এর মধ্যে পড়েছেন তাইতে তাঁর প্রভাবের যতটা সম্ভব অনুভব করেচেন; পরমহংসদেবের সম্বন্ধে

কেবল কতকগুলি উপদেশ বা তত্ত্বকথা পড়েছেন এবং শুনেছেন। তার মধ্যে—

এটা সত্য বটে, তা ছাড়াও একটি বিষয়ে তুজনের বহুতর প্রভেদ ছিল সেটাও কম গভীর তত্ত্ব নয়। সেটা কি আপনি বুঝেছেন?

আপনি, তুইজনের জীবন এবং সাধনের তারতম্যের কথা যদি ধরতে পেরে থাকেন,—তা হলে হয়তো আমি বুঝেছি মনে হয়।

ঠিকই এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। তুই মূর্তির সাধনের পার্থক্য,—আর সে পার্থক্য বিষম এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আব আমার বিশ্বাস সেটা আপনি ভাল জানেন এবং বুঝেচেন আমার চেয়ে।

কেন, বলুন তো? তিনি বলিলেন,—প্রথমতঃ আপনি পরমহংসের স্বদেশবাসী বলে; দ্বিতীয়তঃ—আপনি তাঁর প্রতি গভীর ভক্তিমান বলে; তৃতীয়তঃ—আমার বোধহয় আপনি তাঁর সত্বার মধ্যে প্রবেশ করেছেন,—এই আমার বিশ্বাস।

চমৎকার আপনার বিশ্লেষণ; একটা আনন্দের শিহরণ আমার মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেল; তিনি সেটি লক্ষ্য করলেন। বললেন এখন আপনিই বলুন পরমহংসের সাধনের মূল কথাটা।

বললাম; প্রথমতঃ ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নিয়েই তাঁর জীবনারম্ভ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে যারা যতরকমে ঈশ্বর প্রণিধান করেচেন তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করেচেন; যথাকালে যখন তাঁর নিজ প্রবল ব্যাকুলতার ফলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হলো; তার সেই প্রবল ধাক্কা সামলাতে তাঁর কিছুকাল গিয়েছিল। তার পর, ভারতের যতগুলি ধর্মসম্প্রদায়, তাঁদের প্রত্যেকটির সাধন-পদ্ধতি তিনি যথারীতি এবং যথাশাস্ত্র সাধনের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। এই ভাবে প্রায় বারো বৎসর সাধনের পর তিনি সবার আকর্ষণের বস্তু

হয়েছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল ভাবের ঈশ্বর-বিশ্বাসীর গুরু বা উপদেষ্টার আসনে বসবার অধিকারী হয়েছিলেন। এইখানেই মহর্ষি রমণের সঙ্গে তাঁর একটু তফাৎ—তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক সকলেরই সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারতেন, সেইটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাস ছিল। মহর্ষির অধিকারে যাঁরা এসে পড়েছেন তাঁরা পদ্ধতি অধ্যাত্ম অনুভূতি নিয়েই মশগুল; অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলবার প্রবৃত্তিই নেই তাদের। অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে তাঁরা কি চক্ষে দেখেন তা আমি জানিনা।

তিনি বললেন—আচ্ছা, আপনি যেভাবে বললেন, তার মধ্যে যেন একটু দ্বেষভাব না হলেও পক্ষপাতিত্ব রয়েচে মনে হয়। আমি বললাম— কি রকম, একটু খুলে বলুন তো।

—আপনি যেন রামকৃষ্ণকেই বড় এবং শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন।

—তা হলে বলি শুনুন ;—আমার ধারণা মহর্ষির আত্মতত্ত্ব, যা তিনি যথাকালে অনুভব করতে আরম্ভ করলেন, তারপর যতই প্রবলতর প্রেরণা তাঁর মধ্যে এলো তিনিও গৃহত্যাগ করে নিজ আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ একটি স্থান নির্বাচন করে ব্যাকুল প্রাণে ঐখানেই এসে জমে গেলেন। রামকৃষ্ণেরও তাই হয়েছিল। মনোমত বিশেষ একটি স্থান চাই,—এ সব কাজ নিজ সংসারে হবার নয়। তারপর যেসব সিদ্ধ যোগি মহাত্মার সঙ্গে দেখাশুনা হলো তাঁদের ভাব তিনি নিজ অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তার পর সিদ্ধাবস্থা এলে তখন উপদেষ্টারূপে যাদের মধ্যে তত্ত্বানুভূতি লাভের সহায়তা করলেন তারা ঠিক তাঁরই প্রবর্তিত ধারায় চলেছিল। অনেকগুলি ব্যাকুল জ্ঞানান্বেষী ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসুর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ। সব বিষয়ে দুজনে একই ভাবে জীবনের কতকাংশ কাটিয়েচেন। আমি এঁদের কাকেও ছোট

কাকেও বড় করতেই পারি না। কারণ দুজনের প্রকাশ বা প্রচার-প্রণালী বাইরে দেখতে, ক্ষেত্র বিশেষের জন্যই দেশ-কাল-পাত্র পৃথক হলেও তত্ত্বলাভ একই; এবং সার বস্তু নিয়েই। পরমহংস বলেচেন, - যে যেভাবেই ধরুক না কেন সবই ঠিক, কারণ তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু এখানে নেই, আর মহর্ষি বলেচেন আমি-কে ধরলেই সব পাওরা যাবে যাতে মানব জন্ম সার্থক হয়। পরমহংসও বলেচেন—আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম একই বস্তু। তাহলে বলুন, আমি কাকে বড় বা শ্রেষ্ঠ বলবো?

সাধু বললেন—এতক্ষণে পরিষ্কার হোলো তোমার কথাটা, আমি সুখী হয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম - আমিও সেই সুখের ভাগি খানিকটা তো হয়েইচি। আসল কথা, আপনি জীবন্ত পেয়েছেন মহর্ষিকে, জীবন্ত গুরুর কাছ থেকে সকল অনুভূতিঁই জীবন্তভাবেই ধরেছেন, কাজেই আপনার লাভ অনেক বেশী।

তিনি বললেন;—তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার অধিকার তার বেশী তো আমার পাবার কথা নয়; তাই আমার মনে হয় ভারতের একটি সাধারণ মানুষের যতটা জ্ঞান, অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথাই বলচি —আমার জ্ঞান তার চেয়ে অনেক কমই।

আসলে কম বেশীর প্রশ্নই আসে না এখানে। আমার মনে হয় এটা আপনার বিনয়। শুধুই বিনয় ঠিক না হলেও খানিক ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাও থাকতে পারে এর মধ্যে; তাইতেই এতটা বাড়িয়ে বলে থাকবেন। না হলে আপনি এটি নিশ্চিত জানেন, এক জন ভারতের সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেচে বলেই সত্য সত্যই অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন হবার সম্ভাবনা কত কম। শুনেই তিনি বললেন;—এ কথা সমর্থন অথবা প্রতিবাদ করবার কোন চেষ্টা না করেই আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি—বলো তো, ভারতের সাধারণ-

লোক ধর্ম সম্বন্ধে একটা সহজ সংস্কার নিয়ে জন্মায় কিনা? আমাদের দেশে যেমন সাধারণ জাতক, কর্মশক্তি, সুখ, দুঃখ ও দ্বন্দময় জীবনের সংস্কার নিয়ে জন্মায়?

সেদিক থেকে হয়তো আপনার কথাই ঠিক মনে হয়। এক সময় ছিল যখন আপনার বক্তব্য বিষয়টি সত্য মনে করবার কারণ হয়তো ছিল কিন্তু আজ বোধহয় পাঁচ শত বৎসর ধরে প্রবল রাজনীতিক অধঃপতনের ফলে তা আমরা হারিয়ে বসে আছি। এটা সাধারণের কথাই বলছি।

সেইদিন রাত্রে ভোজনের পর আবাব যমুনা মায়ীর সঙ্গে কথা—এবাব প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবলেন বিবাহ করেছি কি না? উত্তরে আমার বিবাহিত জীবনের সেই প্রথম বিবাহ থেকে সকল কথাই বলতে হোলো। তিনি স্থির সমাহিত চিত্তেই শুনিলেন। শেষে বলিলেন,—

এখন তুমি ইচ্ছামত ঘুরেই বেড়াও আর যাই করো না কেন, তোমার মধ্যে জীবসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখচি প্রবলই রয়েচে বলতে হবে। পরমাত্মার ইচ্ছায় আবার ভালো ভাবেই ঘর-সংসার করতে হবে, ছাড়বেনা, জেনে রাখো, নাম, যশ ও সিদ্ধির পথে অনেক কাজই আছে তোমার; তবে এটি প্রত্যক্ষই দেখছি বর্তমানে এখন তোমার উন্নত জীবনের সব লক্ষণই বর্তমান।

ঘরে ফিরে গিয়ে সন্তান-সৃষ্টি আর গৃহস্থাশ্রমে জীবন কাটানোর নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা দেখেও তাকে উন্নত জীবনের লক্ষণ বলচেন আপনি?

তোমার মতে কি গার্হস্থ্যজীবন ছেড়ে বাইরে দূর দূরান্তরে ঘুরে সাধু-সঙ্গ তারপর হিমালয়ে আশ্রয় নির্মাণ করাটাই উন্নত জীবন নাকি? তাইতো তোমার লাভ কতটুকু ভেবে দেখেচ?

আমি বুঝতে পারলাম না স্ত্রী নিয়ে ঘর করা, সন্তান-সৃষ্টি, সংসার প্রতিপালন এটাই বা কি করে উন্নত জীবন হতে পারে। ঐ যদি উন্নত জীবন হয় তাহলে হেয় জীবনটা কি ?

যমুনা মায়ী একটু যেন বিরস বদনেই কতকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, যেন একটু ভাবিলেন, তারপর বলিলেন ;—এখানে জীবমাত্রেই কর্মাধীন, মানো ? কর্মের ফলাফল আছে আর সেটা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়, মানো এসব কর্মতত্ত্ব ?

বললাম, যারা কর্মত্যাগ ক'রে অধ্যাত্ম জীবন নিয়ে চলচে ?

যে কর্মের ফলগুলি এখনও ভোগ হয়নি,—যে কর্মপথ পরিষ্কার না হলে উর্ধ্বগতি আটকায়, এসব বোধ হয় এখনও পর্যন্ত কারো কাছে শোনোনি।

কি করে আটকাবে সেটা বুঝতে পারিনি ; যদি আমি অনন্যমনা হয়েই অধ্যাত্মমার্গে ডুবে যেতে পারি, তাহলে—

হাঁ, অনন্যকর্ম হয়ে ডুবে গেলে হয় তো সব-কিছু সঞ্চিত কর্ম ছাই করে দিতে পারবে ; কিন্তু এমন সব কর্ম আছে যাতে তোমায় অনন্য-মনা হ'তে দেবে না সে খবর রাখো কি ?

সেটা কি রকম, বুঝলাম না।

তুমি তো সন্তান-সৃষ্টি, সংসার-কর্ম এসব হেয় বলে ছাড়তে চাও, কিন্তু কতকগুলি জীবের সঙ্গে তোমার কর্মসূত্র এমন বাঁধা আছে— তাদের এখানে আসতেই হবে তাদের কর্ম ও ধর্ম-জীবনের চক্র সম্পূর্ণ করতে। তাদের সৃষ্টি করবার দায়িত্ব যে তোমার রয়েছে ; তারা, যে তোমার ভালবাসা বা প্রীতির টানে তোমার শক্তিতেই পয়দা হয়ে জীবন আরম্ভ চায়, তাদের এড়িয়ে আত্মতত্ত্বে সমাধিস্থ হয়ে থাকলে চলবে কেন ? ওগুলি শেষ হলে তবেই না তোমার সমাধির পথ সহজ হবে। তখনই তোমার ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ের সঙ্গে এক হতে পারবে।

আপনি এই সব কর্মকাণ্ডের কথা যা বলচেন, সত্যই কি এই নিয়ে একজনের জীবনে অধ্যাত্ম পথে এত বাধা সৃষ্টি করে ?

বাধা বলছো কেন, পথ নির্বিঘ্ন হওয়াটা কি বাধা ?

ধরুন, যদি আমি আবার সংসারে ফিরে না যাই ?

আহা, সংসারে ফিরে না যাই নয়,—সংসারের বাকী বা অবশিষ্ট কর্ম সম্পূর্ণ করতে যাই বলো। তোমায় যেতেই হবে, ঐ সকল কাজ শেষ না হলে তোমায় ছাড়চে কে ? তোমায় নিয়তির বিধানে করতেই হবে।

এ তো বড় ভয়ঙ্কর !

না না, অত ভয়ঙ্কর বলে দেখচো কেন ? তোমার সহজ জীবন-ধারার সঙ্গে সবটাই দেখবে না, মিলিয়ে এক ক'রে নেবে না ?

তা শুনে আমি বললাম—

এই যে আমার দীক্ষা, গুরুলাভ, সাধন, তত্ত্বানুভূতি,—এর এই স্বর্গের আনন্দ ছেড়ে দিয়ে আবার পশু-জীবন সংসারে—

না না, ও ভাবে দেখো না। পশুজীবন নয় তোমার এই স্ফুরণ, আনন্দময় আত্মিক সাধন জীবনের যা-কিছু লাভ—যা-কিছু আকর্ষণ, এ সব তো তোমার সঙ্গেই থাকচে ;—তোমার উপার্জিত যা-কিছু তোমার সঙ্গেই তো রয়েচে ; এ তো তোমার পতন নয়, বরং উন্নত জীবনই বলতে হবে। আর তাইতো আমি বলেছিলাম।

এ এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি,—অদ্ভুত !

আর আমার কথা যোগালো না—মুখটি আমার বন্ধ হয়ে গেল ;—বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো,—ভিতরটা মোচড় দিয়ে চক্ষু দিয়ে ধারা হয়ে নামতে আরম্ভ করলে। আমি সংযত হতেই পারলাম না।

আমার অবস্থা দেখে যমুনা মায়ী বললেন, এ কি পাগল ছেলে ; যদি এসব তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে না নিতে পারো তা হলে

নিছক তোমার অধ্যাত্ম অস্তিত্বটুকু নিয়ে কেমন করে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্ব-আত্মার মধ্যে? সেইজন্ম থেকেই এখানে কর্ম-জীবনের সবটা নিয়েই তো তোমার ধর্ম-জীবন; খানিক বাদ দিলে কি পরমাত্মার লীলা তোমার জীবন ঘুটিতে সম্পূর্ণ ফল দেবে, এ লীলা কি তোমার ব্যক্তিগত? এ যে তাঁরই লীলা, তোমার জৈবিক অস্তিত্ব নিয়েই তাঁর খেলায় কি কোন রকমে কোথাও ফাঁক আছে? বোঝো তো, তারপর ডুবে যাও দিকি। এখান থেকে উঠবার আগে সব কিছু বিজ্ঞান চৈতন্যের অধিকারে মিলিয়ে নাও। আনন্দ সম্পূর্ণ করো। এটা মেনো যতই সমাধিবান পুরুষ হওনা কেন তুমি, তোমার জন্ম থেকে সকল কিছু নিয়েই তোমার তুমি; খানিক বাদ দিয়ে, খানিক ধরে নয়।

পরদিন ভোজনের পর যম্‌না মায়ীর সঙ্গে আবার দেখা।

এখন আর কোন সঙ্কোচই রইল না, আমি অকপটেই প্রাণের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম;—

আপনি কিভাবে দেখচেন জানিনা, আমার তো বর্তমান অবস্থাটা বড়ই কষ্টকর হয়েছে। দীক্ষার পর কয়েক বৎসর মহা-আনন্দেই কাটিয়েছি; কিন্তু আজ কিছুদিন থেকে আমার মধ্যে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আর সেই উদ্দেশ্যেই আমি একটু বেশী সাধু খুঁজতে আরম্ভ করেচি। যখনই কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গ পাই, আশা হয়, এইবার আমার সাধনার পূর্বধারা, যেটা হারিয়েছি আবার ফিরে পাবো এই মহাত্মার কৃপায়;—কিন্তু দিন যায়, সে ভাবই আর আসেনা, সেই সাধুর উপর অশ্রদ্ধা আসে। আবার খুঁজতে আরম্ভ করি—ভাগ্যক্রমে যদি আর কাকেও পাই। পেয়েছিলাম একজনকে সম্প্রতি;—প্রথমে বিশ্বাস হয়েছিল, তারপর

দেখলাম কতকগুলি ফাঁকা কথা বলে তিনি এড়াবার চেষ্টা করলেন, আর বেশী কিছু ভিতরের কথা প্রকাশ করলেন না।

কেন বলতো ?

পাছে তাঁর গুহ্য সাধন রহস্য আমি গ্রহণ করতে না পারি। শুনিয়া যমুনা মায়ী বলিলেন,—তা ঠিক নয়, ওটা আসলে তোমার পথ আলাদা বলেই। আরও একটা গুহ্য কথা এর মধ্যে আছে সে কথা তুমি জানো না এই ঈশ্বর সাধনের পথে।

বলুন, সেটা কি ? উত্তরে বললেন, কেউ কাকেও ঠেলে তুলে দিতে পারে না সিদ্ধির পথে, এটা জনো কি ? সম্পূর্ণই নিজের দায়ীত্বেই যেতে হয়।

তবে গুরুকরণ, দীক্ষালাভ সেই মত সাধনা কেন ?

ওটা যে করে সেটা তার বিশ্বাসের জন্য। নিজ পথ ধরবার জন্য ওটা আরম্ভ। তাঁর উপদেশ তোমার মধ্যে সার্থক হলে,—তুমি যদি তা'তে আত্মসমর্পণ করে স্বীকার করে নাও যে ইনিই তোমার যথার্থই ইষ্টগুরু, নিশ্চিত সহায় ইষ্ট, ভগবান লাভের একমাত্র সহায় তাইতেই তোমার শান্তি আসবে, এ সবই অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে কথা, যথার্থ বিশ্বাসের উপরেই ওটা নির্ভর করে।

গুরুলাভ ভাগ্যের কথা, সেই গুরুর কথাই বলচি—

অর্থাৎ তোমার আত্মসমর্পণের যোগ্য পাত্র, যেহেতু তুমি দুর্বল, নিজ শক্তিতে অ-বিশ্বাসী,—যা পেয়েছ তাই নিয়ে নিজ শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারছো না, তাই আত্মসমর্পণের সাহায্যেই সম্পূর্ণ করতে চাও। তবে আমার মনে হয়েছে তোমার বিষয়ে কথাটা স্বতন্ত্র।

বলুন দেবী, আমায় সবটাই বলুন, বাকী রাখবেন না কিছু।

সাধন পথে মধ্যে মধ্যে ঐ রকম অবস্থা হয়। সকল সাধকেরই ইষ্টলাভের পথে হয়ে থাকে, যে যত শক্তিশালী তার ততই ঐ

অবস্থাটি হয়। মনে হয় তখন খেই হারিয়ে গিয়েছে, আমি আর পারচি না, আমার শক্তিতে আর কুলাচ্চেনা। কাকেও এমন যদি পাই, ইত্যাদি,—সব যা তোমার এখন চলছে—

আমার যে কি হলো এই কথাটি শুনে তা আর বলতেই পারবো না। শুধু অন্তরে মনে হলো,—জয় মা।

শেষদিকে যমুনা মায়ী কয়েকটি বিশেষ কথা বলিলেন,—নিজের সাধন পথ গুহ্য থাকাই ভালো, তাইতে নিজের মধ্যে আত্মশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় কথা বলিলেন; সাধুর মতো বেশভূষা দেখে, সাধু মনে করে তার কাছে নিজ সাধন কথা প্রকাশ করা ক্ষতিকর;—একজন আর একজনের মনের গতি বুঝতে পারে না,—সাধু হলেও পারে না। সাধারণতঃ যারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে চলাফেরা করচে, যতদিন না সিদ্ধি আসে ততদিন তাদের ঠিক চিনতেও পারা যায় না। আর নিজের মনের গোল সম্পূর্ণ না কাটলেও তো ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নেই, অতএব সাবধান।

এখন বুঝিলাম আমি কতটা দুর্বল, তাই প্রথমে নিজের কথাটা যমুনা মায়ীর কাছে খুলিয়া বলিতে পারি নাই; তিনি দয়াময়ী, নিজগুণে চমৎকার আমার অন্তরের কথা বাহির করিয়া লইলেন। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হইল—কেহ কাহাকেও সিদ্ধি দিতে পারে না, আত্ম-শক্তিতেই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে এবং লাভ করিতে হয়। অবশ্য এক সময়ে মধ্যাবস্থায় সঙ্কট আছে, তখন সবকিছু যেন গুলাইয়া যায়,—ফলে আত্মশক্তির উপর আস্থা থাকে না, মনে হয় যেন আমি পারিব না;—তাই অন্য কোন শক্তিমান, যিনি আমায় উদ্ধার করিবেন এমন কারো সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। তখনই ইষ্টকে জোর করিয়া ধরিতে হয়, ছাড়িতে নাই। যথাকালে ঠিক সে সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আবার নিজপথে

আনন্দেই চলিতে শক্তি পাওয়া যায়। এ সকল অবস্থার কথা কাহাকেও বলিবার নয়। আমার ইষ্ট এবং আমি, মধ্যে আর কাহারও স্থান নাই, এ রাজ্যের সার কথা। তারপর—

একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন, যেন অন্তর ভেদ করিয়া ভিতরের ভাববস্তু এবং আমার মধ্যে আত্মনির্ভরতা কতটা, যেন বুঝিলেন ; —যম্‌না মায়ী তারপর বলিতেছেন—

দেখ বাবা,—এক শ্রেণীর জ্ঞানমার্গের জীব আছেন তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও বিচারের প্রবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা শূন্য হইয়া আবাল্য ঐ পথে চলিতেই অভ্যস্ত। কোন ব্যক্তি বা সাধকের কাছে কখনও নতি স্বীকার করিবেন না। গোড়া থেকেই আত্মশক্তিতে নির্ভর করে নিজ সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছেন, গভীর আত্মতত্ত্ব নিজ শক্তিতেই পেয়ে গিয়েছেন এমনও আছেন এখানে ;—যেমন মহর্ষি রমণ।

এখানে এই ফিরঙ্গ-বাবা ও যম্‌না মায়ীর সঙ্গে দেখা আমার জীবনের বড় লাভ। পরদিন প্রভাতেই আমরা বিদায় নিলাম।



প্রায় বারো বৎসর আগের কথা,—প্রথমে নোয়াখালির ঘটনা তারপর পাকিস্থানের রিফুজিদের শিয়ালদা স্টেশনে অধিষ্ঠান যারা দেখেছেন, সেকথা তাঁদের স্মৃতির মধ্যে আর এনে দিতে চাই না। শুধু আমার কথাই বলচি, নিত্য নিত্য ঐ নাটক চক্ষে দেখা ও শোনা অথচ প্রতিকারের হাত নেই,—ফলে এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে,—কলকাতা থেকে পালাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিলাম। কিন্তু কোথায় যাবো, এইটিই ছিল আসল কথা।

যিনি সবার মনের খবর রাখেন তিনিই বুঝি এবার আমার প্রতি সদয় হলেন :— তমলুক থেকে যোগজীবনের একখানি পোস্ট-কার্ডে পত্র এলো ; তিনি লিখেচেন, দুই তিন দিনের মধ্যে যদি এসে পড়তে পারো তো একবার দেখা হবে। শীঘ্রই বিন্ধ্যাচল যাবো।

এই তো চাইছিলুম। তমলুক বহু প্রাচীন স্থান, মেদিনীপুরের একটি বিখ্যাত তীর্থ বর্গভীমার ক্ষেত্র, আগে কখনও যাইনি। সুতরাং প্রবল একটা উৎসাহ আর আনন্দে রাতটুকু কাটিয়ে পরেরদিন সকালেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর একখানি পাঁশকুড়ার টিকিট কেটে, সাড়ে সাতটার ট্রেনে উঠে বসলাম। কামরায় ভীড় ছিল, তবুও জানালার ধারে জায়গাও পেলাম। বসে একবার চেয়ে দেখলাম ঘরের ভিতরের লোক সমষ্টি। গাড়ি অবশ্য যথাকালে ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের সামনের বেঞ্চে একটি গম্ভীর মূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, হাতকাটা ব্যানিয়ান গায়ে, থান কাপড় পরা, ডানহাতে বিঁড়ি, বাঁ-হাতে কাগজখানা,—কোলের উপর রেখে কি যেন ভাবছিলেন।

তাঁর পাশেই বোধ হয় তাঁর স্ত্রী, সুন্দর মূর্তি, প্রৌঢ়া, ম্লানমুখে বসেছিলেন। হাতে কাঁচের চুড়ি মাথায় সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। তার পাশেই ঐ অল্প স্থানের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে একটি মেয়ে; আঠোরো থেকে কুড়ির মধ্যেই বয়স, মায়ের মতই সুন্দর মুখ; কিন্তু বিষন্ন ভাবটাই প্রকট ঘুমন্ত সেই মুখের পানে তাকালেই বুঝা যায়। তারও হাতে নীল রংয়ের কাঁচের চুড়ি গাড়ির ভিতরে আমার দেখা এই পর্যন্তই। তারপর পাশের দিকে জানালার পাশে আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে পড়লো,—গাছপালা জঙ্গল-ঘেরা গ্রাম, আর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের দৃশ্য। দ্রুত অতিক্রমের মধ্যে আপন চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ইতিমধ্যে অনেক সময় কেটে গিয়ে থাকবে। গড় গড় গড় গড় শব্দে চেয়ে দেখি গাড়ি রূপনায়ণের সেতুর উপর দিয়ে চলছে। ভিতরে দেখলাম,—এবার মেয়েটি উঠে বসেছে, আর মা তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন,—দেখতে দেখতে কোলাঘাটে এসে দাঁড়ালো ট্রেনখানা।

ভদ্রলোক এবার উঠে বাইরে গেলেন, কিছু কলা আর পেয়ারা সওদা করে নিয়ে এলেন। এবার তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন, তাতেই বুঝলাম এঁরা পূর্ববঙ্গের লোক। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় নামবো। পাঁশকুড়া শুনেই দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সেখান থেকে কোথায় যাবো; তমলুক শুনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, আবার বললেন,—ওখানে জে, এন, চোন্দারকে চেনেন, ওখানকার সব্ডেপুটি। বললাম, এই প্রথম তমলুক যাচ্ছি, কাকেও চিনি না।

তবে থাকবেন কোথা?—বললাম; বর্গভীমা দেবীর মন্দিরে একজন সাধু থাকেন তাঁর কাছেই যাচ্ছি। তবুও প্রশ্ন শেষ হলনা; তিনি কি আপনার পূর্ব-পরিচিত?

হাঁ, তিনি আমার গুরুভাই, ভালোবাসেন, ডেকেছেন তাই যাচ্ছি। অ। এবার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল, কতক্ষণ পর তিনি বললেন,—

যোগেন্দ্র চৌধুরী আমার ভাইয়ের জামাই। এখন তার ওখানে যাবো বলেই বেরিয়েছি,—কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে তিনি ওখানে আছেন কি না? আগে খোঁজ খবর করে যাচ্ছি না, বড় অসুবিধার মধ্যেই যাচ্ছি এই হয়েছে মুস্কিল। তবে তাঁর একটা ঠিকানা পাবোই,- তাই ভেবেছি—

বাপের কথা শুনে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। দেখলাম অবজ্ঞাতে মুখখানি তার বিরক্ত হয়েছে—স্থানকাল উপেক্ষা করে অস্বাভাবিক চিৎকার করে বললে,—আমি তো আপনাকে বারবার এখন যেতে বলেছিলাম না, ওসব লোকের কাছে না জানিয়ে, আগে ব্যবস্থা না করে গেলে ভালো হবে না, তিনি কি আপনাকে এক সময়,-

হঠাৎ যেন দম ফুরিয়ে গেল, মেয়েটি আর কথাই বললে না। বাপ অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়েই রইলেন, তারপর যেন সন্তর্পণে কণ্ঠে বললেন, চিঠিপত্র দিয়ে যেতে গেলে আরও তিন চারদিন বিলম্ব হয়ে যেতো না, ততদিন থাকতাম কোথায় আমরা? মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বললে,—কেন, যেখানে দেশের এত লোক আছে। বাবা বললেন,—সেই শিয়ালদহ স্টেশনে,- ওখানে এখনও ভদ্রলোক থাকতে পারে? একদিন ও এক রাত্রি থেকে তো দেখেছ, তোমারা। তবুও মেয়েটি বললে, হোটেলেও দু চারদিন থাকা যেতো।

আমাদের বেঞ্চের একটি লোক তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা পূর্ববঙ্গ থেকেই আসছেন বোধ হয়? শুনেই ভদ্রলোক

যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন, কতক্ষণ নির্বাক, সবাই তাঁর কথা শুনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। ভদ্রলোকের মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি,—এখন বললেন ;—হাঁ, পূর্ববঙ্গ থেকেই আসচি ;—সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে, সর্বনাশের চরম করেই এই তিনটি প্রাণী আমরা বেঁচে আসচি ; কিন্তু যে প্রাণ সেখানে খোয়ায়ে এসেছি :—ও হো—ভগবান—

আর কথার কিছুই রইল না : বললাম—থাক্ থাক্, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, বুঝেচি। এবার তিনি যেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, একটা ধমক দিয়েই বললেন ;—কি বুঝেছেন ? কিছুই বুঝেন নাই, - কি করে বুঝিবেন, আমি মহিমাচরণ রায় ভৌমিক, গ্রামে আমার প্রতিপত্তির কথা—কল্পনাও করতে পারবেন না ! ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে,--এম. এ. তারপর গত বৎসর ল পাশ করে উকিল হয়ে বেরিয়েছিল। কলকাতায় বাসায় তখন সে, দেশের খবর কিছুই জানতো না, পরে লোকমুখে খবর শুনে আমাদের কলকাতায় নিয়ে আসবে বোলে দেশে এলো। আশ্চর্য ব্যপার, আমাদের গ্রামে তখনও পর্যন্ত আমার দাপটে কেউ মাথা তুলতেই পারেনি। গান, রাইফেল রিভলভার সব হাতে হাতে ফিরতো। কোন গোলমাল কল্পনাও করতে পারিনি। ছেলে গেল একেবারে ফেরবার নৌকা ঠিক করে,—সেই রাত্রেই আমাদের নিয়ে আসবে। আমি বললাম, এত তাড়া কেন, এখানে কিছুই হয়নি, আর আমি তো রয়েচি, দু চারদিন থাকো, দেশে এসেছ যখন। ছেলে বলে, আমি যেসব কথা শুনেছি সে খবর রাত্রে নৌকোয় বলবো। চলুন, আর এখানে থাকা এক রাত্রিও নিরাপদ নয়। এদের ব্যাপার আপনি কিছুই জানেন না দেখছি।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে, যা কিছু নৌকায় নেবার মালপত্র সব চালান করে বাবা, মা আর বইনকে রেখে, নিজের স্ত্রী আর ঘুমন্ত এক বৎসরের খোকাকে আনতে আর পুরাতন চাকরের হাতে বাড়ীর সব ভার বুঝিয়ে দিযে আসতে গেল ; আব ফিবে এলোনা। ইতিমধ্যে দেখি মাঝি নৌকা খুলে দিচ্ছে ;— বিশ্বাসী মাঝি, জানিনা সে কি দেখছিল, বললে—বাবু আব আসবে না, এখন আপনাদের প্রাণ বাঁচাতে পারলেই বাঁচি, বলে খুলে দিলে নৌকা ; আমাদের হাঁ হাঁ করতে কবতে খানিক বেড়ে গেল নৌকা,—তখন দেখি,—রক্তাক্ত দেহ, মাথাটা ঝুলছে,— নদীর পাড়ে এনে ফেললে, পাঁচ ছয় জন ছিল তারা, তারপব নৌকাব দিকে চেয়ে, হেই কর্তা ছেল্যারে লইয়া যান, বোলে সেই দেহটা দুজনে মিলে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীব জলে। নৌকা থেকে দশ বারো হাত তফাতে পড়লো। সঙ্গে আমাব দুনলা বন্দুক দুটো, একটা রাইফেল হাতেব কাছে। আমি নৌকা থেকেই দু তিনটাকে শেষ করতে পারতাম। স্ত্রী আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, আমাদের আর একজনকেও রাখবে না। মাঝি বললে, আমবা কেউ রক্ষে পাবো না ওদের হাত থেকে— আমি জড়ো হয়েই রইলাম। মাঝি প্রাণভয়ে আর দাঁড়ালো না ; সারারাত প্রাণপণে চালিয়ে ভোরের দিকে স্টেশনে পৌঁছে দিলে। বাপ হযে চক্ষের সামনে দেখলাম আমার একমাত্র পুত্র-সন্তানের পরিণতি।

বেঞ্চে সবাই স্তম্ভিত। কারো মুখে বাক্য নাই। শোকের ছায়া যেন সবার মুখে, এদিকে গাড়ীও এখন ধীরে ধীরে পাঁশকুড়ায় এসে দাঁড়াল।

যারা নামবার তারা নামলো, আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়ালাম। কর্তা ও গিন্নি নামলেন, মেয়েকে ডেকে এলেন, কিন্তু

মেয়ে বসেই আছে, যেন মনেই নেই এখানে নামতে হবে। শেষে বাপ গিয়ে নামিয়ে আনলেন হাত ধরে। দেখলাম মেয়েটি পীড়িত, না হয় অপ্রকৃতিস্থ। বাপ বললেন,—অনুমণি—অমন কর ক্যান্।

বাসে তমলুক ষোলো মাইল,—রাস্তা ভালো। আমরা এক গাড়িতেই উঠে তমলুকের বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে নামলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। এখানেও, সবাই নামবার পর অনুমণিকে ধরে নামাতে হলো। নেমেই প্রথমে মহিমাচরণবাবু, খোঁজ করলেন এখানকার সাবডেপুটি সাহেবের বাড়ী কোথা? তাড়াতাড়ি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, আসুন আসুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি. বোলে কর্তাকে উৎসাহিত করলেন। ভালোই হলো; আমি আর দাঁড়ালাম না। আসবার সময় নমস্কার করে মহিমাচরণ বাবু বললেন; আবার দেখা হবে হয়তো। আমি বললাম,—নিশ্চয়।

আশ্চর্য কীর্তি এই বর্গভীমার মন্দির, অনেক দূর হতেই দেখা যায়;—এ ধরণের মন্দির বাঙ্গলায় কোথাও নেই। ভারতের কোন প্রদেশের মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের স্থাপত্যগত কোন সম্বন্ধই নেই। অনেকে বলেন, বৌদ্ধ স্তূপের উপরেই মন্দিরটি স্থাপিত, তাই অতটা উঁচু। মনে হয় এত উঁচু ভিতের উপর পুরীর মন্দির ছাড়া আর কোন মন্দির নেই। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও শুনেছি বৌদ্ধস্তূপের উপর নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরও কত দিনের তা কেউ হিসাব রাখেনি।

আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ী, সবগুলিই পাণ্ডাদের অধিকারে, যাত্রি-নিবাস। তারই একখানিতে দোতলার উপরে বেশ বড় ঘরেই যোগজীবন থাকেন; এখানে তাঁর নাম যোগিবাবা। ইচ্ছা

মত সকল ব্যবস্থাই করে নিয়েচেন, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আপন স্থানে আপন আসনে একলাই থাকেন। ঘরের সামনেই খানিক মুক্ত ছাদ, বেশ খোলা ম্যালা; তারই একদিকে সিঁড়ি, তাই ধরেই ওঠানামা করতে হয়। আমি যোগিবাবার সামনে গিয়ে নমস্কার করলাম;—একঘর লোক। তিনি বললেন, আমি জানতাম আজই তুমিই আসবে।

পাশের ঘরেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করাই ছিল আমার জন্য,—এখন কেবল বললেন, স্নানাহার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের পর আবার যথাকালে দেখা হবে। তারপর বললেন,—আমার সামনে যাদের দেখচো তাদের সবার কাজ সেরে তবে আমার ছুটি। সবাই হেসে উঠলো, আমি চলে এলাম।

আমার বিশ্রামের দরকার ছিল না, মা জগদম্বার প্রসাদ পাবার পর আরামে না শুয়ে আমি নীচে এসে চারদিক দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন বেলা বারোটা হবে। দেখি মুটের মাথায় সব কিছু বস্তু, স্ত্রী এবং কন্যাসমেত মহিমাচরণ রায় মশাই যাত্রী-নিবাসে এসে ঢুকচেন। সঙ্গে অবশ্য পাণ্ডা আছে সেটা না বললেও চলে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন,—নাঃ, যোগেশ চোংদার গত মাসে বদলী হয়ে বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছে, এখন মা বর্গভীমার আশ্রয়ই নিলাম। দেখলাম অন্নমণির চক্ষে আগুন জ্বলচে, মুখে বাক্য নেই। মা তার হাতখানি ধরেই আছেন।

মহিমাচরণকে বললাম,—বেশ করেচেন, এমন সুন্দর তীর্থ, এইখানেই থেকে যাননা কিছুদিন। তিনি বললেন,—আমি তাঁকে বাঁকুড়ার ঠিকানায় পত্র দিয়েই এসেছি, দেখি কি উত্তর আসে, সেই বুঝেই ব্যবস্থা করবো,—এখন তো এইখানেই থাকি।

বললাম, ঠিক আছে। ভদ্রলোক আমাদের খবর করলেন অর্থাৎ

আমি কোন্ বাসায় থাকি—শেষে ঐ বাড়ির একখানি নীচের ঘরেই তাঁরা বাসা ঠিক করলেন। আসলে আমায় তিনি ছাড়তে চান না।



সন্ধ্যার পূর্বে দেখা হলো; আবার তখন অনেক কথাই বললেন। আজ তো প্রসাদ খেয়েই কাটিয়ে দিলাম, কাল বাজার হাট, রান্নাবান্না করা যাবে। মেয়ে কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি, আজ তিন দিনের উপর উপবাসী। আমি বললাম, সে কি কথা, আপনি সেজন্য কি করছেন?

কি করবো, ও তো ছোট মেয়ে নয়। ওর রাগ আমার উপর। আমি কলকাতা থেকে হেথা চলে এসেচি ব'লে। তারপর যেন আপন মনেই বলচেন;—কলকাতায় আমি থাকতেই পারবো না;

যেদিন এসেছি সেই দিন থেকে দেখতে বাকি রাখিনি; যার যেখানে যত আত্মীয় আছে কুটুম্ব সব গিয়ে উঠেছে, সব সংসার ভরতি। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেচে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমরা কারো গলগ্রহ হবো না; সেই জন্যই তো মেয়ের কথা না শুনে চলে এলাম হেথায়। যখন নিয়তি এনে ফেলেচেন এই মহামায়ার রাজ্যে তখন আর কোথাও যাবো না। কলকাতায় আমি থাকতে পারবো না। আমার ঐ একমাত্র ছেলেব শ্বশুর বাড়ি, মুখ দেখাব কেমন করে। একখানা পত্রে সকল খবর লিখে গত কালই পোস্ট করে দিয়েছি। আমার পুত্রবধুর রূপ যদি দেখতেন,—ছেলে তাকে দেখেই বিবাহ করেছিল। ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। এই তো সংসার;—নিয়তি কেন বাধ্যতে।

আমি শুনছিলাম,—ভাবছিলাম,—আমায়ও নিয়তির বিধানে যখন মহিমাচণের সকল কথাই শুনতে হচ্ছে;—তখন ভাল করেই শোনা যাক—যাতে কোথাও কিছু ফাঁক না যায়।

এবার গলাটা একটু খাটো কবে বললেন,—এ সময়ে আপনার মত সদাশয় একজনকে পেয়েছি তাই বলচি, তাইতে মনে অনেকটা হাল্কা হতে পাচ্ছি, এখন আমার বিশেষ কোন দুঃখ নেই, কেবল ঐ মেয়েটি কি করে বাঁচবে তাই হয়েছে সমস্যা। ও না খেয়ে মরবে ব'লে সেই রাত্রি থেকে আজ তিন দিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত গেলেনি। কেবল বলচে আমার বাঁচবার কোন মানে হয় না। আজই ওর মাকে বলেচে, না খেয়ে মরতে দেরী হবে, আমি কেন এত দেরী করবো। কি জানি কি করবে কোন দিন।

আচ্ছা, আপনার ঐ সাধু বাবাকে একটু বলবেন, ওঁদের তো কত রকম তন্ত্রমন্ত্র সবজানা আছে; কত শক্তি ওঁদের, যদি ওঁর পায়ে গিয়ে পড়ি, দয়া কি হবে না? বুঝতেই পারচি দৈব ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন একটা কুটো হাতের কাছে পেলে তাই ধরেই বাঁচতে চায়। এখন বললাম—আচ্ছা, আমি বলবো তাঁকে আপনার কথা। বলেই উঠলাম, আর বসলাম না।

যোগজীবনের মূর্তি দেখলে শ্রদ্ধা হয়, প্রৌঢ় বয়স, প্রায় ষাট হবে কিন্তু শরীরের বাঁধন অটুট আছে, যোগীর শরীর—চুল বেশীর ভাগই পাকা, জটা বা বড় চুল নয়, বৎসরে একবার চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মুণ্ডন করেন, তারপর সারা বৎসর আর ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন হয় না। এখন অক্টোবর মাস, বেশ বড় চুল ও গোঁফ দাড়ি; কিন্তু কোন পারিপাট্য নেই। গোঁফ দাড়িটি খানিক শ্রীঅরবিন্দের মত। এখন আমায় দেখেই আসন থেকে উঠলেন, বাইরে এসে বললেন—

শোনো, এখানে আর বেশী দিন থাকা নয়, দেখচো তো এক-পাল এসে সকাল থেকে সুরু করেচে,—সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে থাকি, না হয় বেরিয়ে নদীতীরে চলে যাই। তুমি এসেছ; এই কয়দিন থাকো, আমায় রক্ষা করো।

আমি বললাম, আগে তুমি তো আমায় রক্ষা করো—তারপর তোমার কথা ভাববো।

সে কি রকম; তোমার আবার কি বিপদ হলো?

এখন ট্রেনে যা ঘটেছে, আগাগোড়া যেমন শুনেছিলাম এখন পর্যন্ত মহিমাচরণ বাবুর সব কথাই যোগিকে বললাম। শেষে বললাম, ভদ্রলোক তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন।

কি সর্বনাশ,—বলে যোগজীবন বসে পড়লেন। এ যে পরম-হংসদেবের কেস, আমরা এর কি ট্রিটমেণ্ট করবো। তুমি এই সব সর্বনেশে ল্যাঠা জড়িয়ে নিয়ে আসবে জানলে কোন্ শালা তোমাকে আসতে লিখতো।

যখন এসে পড়েচি তখন আর চারা নেই, এখন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, অন্ততঃ সাধ্যানুসারে।

না হলে ঠাকুর দুঃখ পাবেন,—কেমন? বোলে যোগিবাবা উঠলেন, কিন্তু তাঁকে কোথাও যেতে হলো না; সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন অধৈর্য মহিমাচরণ স-স্ত্রীক, স-কন্যা এসে উঠলেন যোগিবাবার ঠিকানায়;—আমরা আসতে পারি কি?

আসুন, আসুন, বসুন। এইমাত্র এঁর কাছ থেকে সব কথা শুনলাম।

তাঁদের বসালেন ঐখানেই; তারপর প্রায় বিশ মিনিট ধরে মহিমাচরণের সকল কথা, তাঁর কর্মজীবন—তাঁর এত দিনের সংসার-জীবনের নাড়ি-নক্ষত্র সব কিছুই বেশ বার করে নিলেন তার পেট থেকে। তাঁর এই অবস্থার মূল সূত্র যেন পেয়ে গেলেন। এতো কথা হলো কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে জন্য সাধুর কাছে আসা, মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই হলোনা। মহিমাচরণ তো নিজে থেকে কিছু বলতেই পারলেন না,—সাধুর কাছে এসে, প্রথম সম্ভাষণ থেকেই যেন কেমন হয়ে গেলেন। আর এটাও দেখলাম, যোগিও তাঁকে নিজ থেকে কিছু বলবার সুযোগই দিলেন না। অথচ মেয়েটি ঐখানেই বসে আছে; একমনে সাধুর কথা শুনচে। নিজে থেকে সেক্ষেত্রে কোন কথা তোলা আমার ভাল মনে হলো না। যোগীও ঐ মেয়ের সম্বন্ধে আমার মুখে সবই শুনেছিলেন তিনিও কিছু বললেন না। যাই হোক এখন যোগীবাবা ভদ্রতা রক্ষা করে শেষে বললেন;—আচ্ছা, দেখা-শুনা আলাপ-পরিচয় অনেকটা হলো এখন আপনারা যান, মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠ, এখানকার সব কিছু দেখুন, তারপর, কাল আবার দেখা হবে, কেমন? বলে, তিনি সোজা নিজস্থানে চলে যাবেন বলেই উঠলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু চলে যাবার আগেই বুদ্ধিমান বাবু মহিমাচরণ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে টং করে সাধুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন।

যোগিবাবা বললেন,—ওকি মশাই, ওটা বার করলেন কেন? এখনি পকেটে ফেলুন—ফেলুন, টাকা নিয়ে কি করবো? মহিমাচরণ বললেন;—থাক না কাজে লাগবে।

তখন আপনার কাছে চেয়ে নিলেই হবে—এখুনি ওটা তুলে ফেলুন, বলেই চলে গেলেন। অগত্যা আবার টাকাটা পকেটে রাখলেন, তিনি। তারপর চলে গেলেন ওরা সবাই।

রাত্রে আমাদের অনেক কথাই হলো, বেশীর ভাগ পুরানো কথা, প্রথমে এই বলে আরম্ভ করলেন, তোমায় পত্র দিয়ে এখানে আনলাম আমি;—কারণটা তো এখনও জানতে চাইলে না;—অথচ জানো বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা আমার স্বভাব নয়। শোনো, আমার মনে ছিল—যেদিন তুমি এসে পৌছাবে সেদিন আর রাত, বড় জোর পর দিন ও রাত কাটিয়ে আমি বিন্ধ্যাচলের পথে যাত্রা করবো;—আর যদি চাও তো তুমিও থাকবে সঙ্গে,—কেমন হবে বলো তো! বললাম,—বেশ হবে;—তা বিন্ধ্যাচল কেন, তোমার প্রিয় সেই—

বাধা দিয়ে বললেন;—কেশবানন্দের আশ্রমটি পাওয়া গেলে, অমন পবিত্র স্থান আর নেই—দিনকতক থেকে একটু আনন্দ লাভ করবো।

কেশবানন্দ তো ওটা সত্যানন্দকে দিয়েছিলেন?

সত্যানন্দ তো গুরুর পশ্চাদ্ধাবন করেচেন অনেকদিন। আরে, সে দুনিয়ার কোন খবরই রাখনা দেখচি।

অবধূতের কথা, পরমহংস দেবের কথা হলো, কিন্তু অনুমণির সম্বন্ধে কোন কথাই নয়। আমি যতবারই ঐ মেয়েটির কথা তুলতে গেলাম ততবারই তাঁর অদ্ভুত ভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া দেখে ভাবলাম, দূর করো ছাই, আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন, যা হবার তাই হবে। অনেক দিন পরে দেখা হলো, পুরাতন বান্ধব,

সতীর্থ ; আন্তরিক প্রীতির টান একটা আছে, তা বলে জোর করে কোন কাজে বাধ্য করার চেষ্টা অন্যায়।

তারপরও দেখলাম, যতোবার পূর্ববঙ্গের অত্যাচার সম্পর্কে কোন কথা তুলতে গিয়েছি সে কথা উড়িয়ে দিয়ে অন্য কথা পেড়েছেন। যাই হোক, এখন আমার ক্লান্তি দেখেই বোধ হয়—এইবার শুয়ে পড়ো, রাত হয়েছে—বোলে চলে গেলেন নিজ আসনে। আমি তো আমার বিছানায় বসেই ছিলাম। মনে হলো আজ মা জগদম্বার কোলেই শুয়ে পড়লাম, আর অঘোরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, সারাদিনের ক্লান্তির পর।

গভীর রাত্রে প্রথমে খট্ খট্ যোগির কেঠো পয়জারের শব্দ। তাবপর আমার বিছানার কাছে এসে—বন্ধু, ওঠো, কাজ পড়েছে। শুনেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম,—ব্যাপার কি? একবার বাইরে যাও তো। ঐ দিকে নদীর ধারে যেন একটা কিরকম শব্দ পেলাম।

কি রকম শব্দটা, যেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—একটা ধমক দিয়ে যোগি বললেন,—একটু উঠে গিয়েই দেখনা ছাই।

আমার ঘুম ছুটে গেল।

কাছেই সিঁড়ি, তরতর করে নেমে এলাম, দেখি দরজার হুড়কো খোলা, অথচ কাছেই খাটের উপর একজন ঘুমুচ্ছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বাইরে বেরিয়ে নদীতীর পানে গেলাম, কেউ কোথাও নেই;—কি হলো? ডান দিকে আরও খানিক চলে সামনেই চন্দ্রালোকে দেখলাম, একটা কালো মাথা, পিঠে এলোচুল একটি মূর্তির পিছনের সাদা কাপড়ও দেখা গেল, যেন সামনের দিকেই চলেছে। এবার দ্রুত পা চালিয়ে কাছেই গিয়ে পড়লাম, দেখলাম নারী-মূর্তিটি আর কেউ নয় অনুমণি, টলতে টলতে পাড়ের উপর এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যেখান থেকে ঝাঁপ দিলে গভীর

জলেই পড়া যাবে। কোন কথা না বলে পিছন দিক থেকে ধরেই পাড় থেকে তাকে খানিক তফাতে এনে ফেললাম। ঐ দুর্বল শরীর, চারদিন খাওয়া নেই, তবু কি জোর, সামলাতে পারি না। গলা ফাটানো চিৎকার করে তখন বললে; আমি কেন বাঁচবো,—ছেড়ে



দাও, আমাকে ধরবার কোন অধিকার নেই,—বলে এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে জলের দিকে একটা ছুট দেবার প্রবল চেষ্টা করতে গেল; কিন্তু অশক্ত হয়ে তখনি ঘুরে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য।

পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলাম আমাদের ঘরে; মেজেতে শুইয়ে দিলাম, মাথায় একটা বালিস দিয়ে। যোগিবাবা বললেন, এই রকমই একটা অনুমান করেছিলাম। এখন আর নাড়াচাড়া নয়,

যখন আপনি জাগবে তখনই দেখা যাবে। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে,—চাঁদ দেখে যোগিবাবা বললেন। বলা বাহুল্য পিতামাতা তখনও কিছুই জানে না, ঘরে তাঁরা নিশ্চিন্ত ঘুমাচ্ছেন। যোগি চলে গেলেন আসনে।

এখন আর শুলাম না,—জেগেই রইলাম। যখন ভোর হয়েছে, জ্যোৎস্না তখনও রয়েছে, যোগী এলেন দেখতে এখানকার অবস্থাটা। বললেন, ভয়ঙ্কর আঘাত,—সহজ অবস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। সুবিধার ভিতর এই বিদেশে একটা আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাইতে উপকার হবে। তার উপরে এই পীঠস্থানের মাহাত্ম্যও কাজ করবে। বিধাতার অপূর্ব যোগাযোগ।

এ দিকে ফরসা হয়ে এলো—এমন সময় বাবা ও মা হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন,—আমাদের মেয়েকে দেখছিনা যে।

যোগি বললেন,—এই যে আপনাদের মেয়ে, দেখুন, তবে ছোঁবেন না। এখন ওকে নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, একটু বসুন আপনারা। বসলেন তাঁরা ঘটনাটা সব শুনলেন, আর বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই রইলেন। কতক্ষণ পর, মেয়েকে বাঁচিয়েছেন বলে যখন আমায় ধন্যবাদ দিতে এলেন তখন যোগি বললেন,—ধন্যবাদের অনেক দেরী, এখনও আপনার মেয়ে ঠিক বাঁচেনি, শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কিনা একমাত্র জগদম্বা ব্যতীত আর কেউ জানেন না। তবে প্রথম ধাক্কায় হয়তো রক্ষা পেলেন।

এই সময়টি একবার চেয়ে দেখলে, সে দেখবার মধ্যে কোন লক্ষ্য নেই কেমন ফ্যালফেলে যেন পাগলের চাহনি, তার পরেই পাশ ফিরে শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়লো।

বাপ বললেন, এইবাব ওকে উঠিয়ে আমাদের ঘয়ে নিয়ে যাইনা কেন; আপনারা আর কতক্ষণ কষ্ট করবেন?

না না, ওকে এখন নাড়াচাড়া করা হবে না;—অর্দ্ধেক রাত যখন কষ্ট করা গেছে এখন তো দিন, এখন আর বেশী কষ্ট হবে কেন? যখন ওর ঘুম আপনি ভাঙ্গবে তখনই কথা।

বাপ চুপ করলেন,—মা এবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, বাবা, আজ চারদিনের মধ্যে এমনভাবে শুয়ে এতক্ষণ ও ঘুমায়নি। যখনই উঠেছি দেখি বসে আছে, বড় জোর বসে বসে বালিসে মুখ গুঁজে থাকতো। এখন বাপ বললেন,—আমরা এখানে শুধু শুধু বসে কি করবো, আপনারাই বা কি করবেন?

আপনাদের বসে থাকতে কি কেউ অনুরোধ করছে, এখানে?

শুনে বাবা বললেন,—সঙ্গে সঙ্গে একটা নিঃশ্বাসও পড়লো, বাঁকুড়া থেকে পত্রের উত্তর কবে যে আসবে, ভগবানই জানেন। শুনিয়া যোগী বলিলেন, ভগবান আরও জানেন,—আপনারা এখানে এসে পড়বেন তা জানেন, মেয়েটির গতি এইখানেই হবে তাও জানেন, তারপরেও এমন কিছু জানবেন যা আপনারা এখনও কল্পনা ও করেননি।

তা হয়তো জানেন,—কিন্তু এমন দুর্গতি করেন কেন মানুষের; সেইটাই যে আমরা বুঝতে পরি না,—ঐখানেই তো হয়েছে গোল। চল, চল, এখন আমরা উঠি, সকালে আজ কাজ আছে,—বাজার-হাট—

তাঁরা চলে যাবার পর, যোগজীবন বললেন, এরা কেউ এখনও প্রকৃতিস্থ নয়। এদের ভিতর যে আঘাত এসেছে তাই থেকে এখনও কেউ সামলাতে পারেনি। এখন মেয়েটীর সম্বন্ধে এইটুকু তুমি তো বুঝতেই পাচ্ছ, ঘুমটা যত দীর্ঘ হয় ততই ভালো। যে আঘাতটা ও পেয়েছে,—ততটা আঘাত ওর মাও পেয়েছেন, বাবারও কম নয়—তবে মায়ের একটা জোর অবলম্বন রয়েছে স্বামী, তাকে ধরেই সামলাচ্ছেন; কিন্তু মেয়ের তো সেরকম কিছু সেই, তাই

এতটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাও, এখানে বক্তৃতায় কিছু হবার নয়। তুমি একটি কাজ করোদিকি ;—মন্দিরে যাও, পূজারী যিনি, নিশিকান্ত আচার্য তাঁর নাম, তাঁকে একবার আমার নাম করে বলবে,—তাঁর পূজার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে এখনি একবার আমাকে দেখা দেন, না হলে পূজার পর যেন নিশ্চয়ই আসেন। বেশ লোক, দেখলে খুসী হবে, যাও চলে।

যেতে আসতে আমার পনরো থেকে বিশ মিনিটের বেশী লাগেনি; প্রায় আমার সঙ্গেই এলেন নিশিকান্ত ঠাকুর। বেশ জাঁদরেল মূর্তি, রক্ত বস্ত্র ও উত্তরীয়—কপালে সিন্দুর, রক্তচন্দন তার সঙ্গে চক্ষুর রক্ত আভা সব মিলিয়ে যেন একটি শক্তির প্রতীক বলেই মনে হয়। তিনি এসেই যোগিবাবাকে প্রণাম করলেন। তাঁকে বসিয়ে যোগজীবন এমন সুন্দর করে অনুমণির ইতিহাসটা বললেন, যেন তিনি আগাগোড়া সব কিছুই স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রত্যেকটি কথাই পূজারী ঠাকুর মন দিয়ে শুনলেন। শেষ হলে বললেন,- কবচ একখানি দিতে হবে। মেয়ের বাপ কত খরচ করতে পারবেন ?

মেয়ে আমার, ওর বাবা আমি ধরে নাও।

তা হলে পয়সার কথাই চলবে না। তখন যোগীজীবন বললেন —এই অবস্থায় কামড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা বার করলে তোমার ভাল হবে না, আর মাও অসন্তুষ্ট হবেন। তবে সেরে উঠলে, মা তোমায় যে পুরস্কার দেবেন তাতেই তোমার ঐ ছোট ব্যাগটি ভরে যাবে।

আর কিছুই বলবেন না প্রভু,—ক্ষমা করুন। তারপর বললেন,—আজ শনিবারও আছে, সন্ধ্যার একটু আগে মেয়েটি যেন মন্দিরে যায় তারপর যথাকালে যা করতে হবে তা করে দেবো। যোগী বললেন—ওর বাবা-মার সঙ্গে ও ঠিকই যাবে।

পূজারী বললেন, একখানা নতুন শাড়ী পরে যেন যায়; স্নান করিয়ে কাজ নেই। যোগী বললেন, এক কাজ করো,—তোমার মনোমত একখান শাড়ী ওর জন্যে তুমি কাছে রেখো,—ইতিমধ্যে ওর শাড়ী যদি যোগড় হয়তো আর লাগবে না।

পূজারী বললেন— কালো, নীল বা সবুজ আর সাদা ছাড়া যে কোন রং চলবে।

আচ্ছা, কোন রংটা হলে ঠিক হয় তাই বলতো বাবা;—

লাল সিঁদুরের রং পেঁয়াজি, এর কোন একটা হলেই ভালো হয়। যাবার আগে পূজারী ঠাকুর অনেকক্ষণ ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখলেন;—জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী?

হাঁগো বাবা, এখনও বুঝতে পারোনি?

শাড়ীখানা আমিই দেবো, বাধা দেবেন না প্রভু, মায়েরই ইচ্ছা জানবেন। প্রণাম করে চলে গেলেন পূজারী।

যোগিবাবা বললেন,—মা নিজেই নিজেই সবই যোগাড় করে নিলেন,—আমাদের কৃতিত্ব কতটুকু—দেখেছ?

ঠিক যন্ত্রের মত কাজই করেছি আমরা,—তাছাড়া আমাদের শক্তি কোথায়?

এইটুকু বুঝতেই মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই; অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থ আর মতামত নিয়ে মাথা ফাটাফাটি।

কতক্ষণ পরে আবার পিতা মাতা এলেন। বাপের উদ্বেগ, মেয়ে এখনও উঠছে না কেন? মা বলেন, আহা একটু ঘুমাক না— আজ চার দিন চক্ষে ঘুম নেই, গলা দিয়ে একফোঁটা জলও নামেনি। কি করে যে মেয়ে বেঁচে আছে তাই ভাবি। ভাগ্যে এখানে এসে পড়েছিলাম, মা, রক্ষা করো—মা রক্ষাকালী—

যোগী বললেন—এখন আপনারা যান, রান্না খাওয়া বিশ্রাম সব কিছুই সেরে নিন। ঠিক সন্ধ্যার আগেই মেয়েকে নিয়ে মায়ের

মন্দিরে যেতে হবে, মনে থাকে যেন। কবচ পরানো হবে,—দেবী কবচ। শুনেই মা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—তাঁকেই তো সব করতে হবে।

বাপ কাজের লোক, কাজের কথাটা পাড়লেন;—কবচ ধারণের ব্যাপার, খরচটা কি রকম লাগবে,—জিজ্ঞাসা করলেন। যোগি বললেন,—সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে, আপনি কত খরচ করতে পারবেন, তাই বলুন না।

এই অবস্থায় আমি আর কতটুকু খরচ করতে পারবো, বুঝতেই তো পারেন?

বেশ, তাহালে পাঁচ পয়সা;—কেমন? আচ্ছা, সেই কথাই রইলো—তাহলে,—যেন বলতে গেলেন এখন উঠুন। কিন্তু উহ্য রইল কথাটা—

আপনি যখন আছেন এর মধ্যে, তাইতে শুভই হবে বোধ হয়। জয় মা,—বাবা বললেন—

আগাগোড়া এটা মায়েরই ব্যাপার সেটা বুঝচেন না?

তাহলে টাকাটার কথা।

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন,—কিসের টাকা?

ঐ কবচের!—সেটা কি পরিমাণ হবে?

সাধু বললেন,—ঐ যে বললাম, পাঁচ পয়য়া। এর কম কি করে হয়?

পরিহাস করচেন, হেঁই বাবা, অপ্রসন্ন হবেন না। করজোড়ে বাবা বললেন।

আচ্ছা, তাহলে আপনিই বলুন না, কত খরচ করতে পারবেন। শুনেই বাবা মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করলেন, শেষে বললেন, আপনিই বলুন।

তাহলে একশো টাকাই দিবেন। ঠাকুর, তাহলে খুব খুসী হবেন।

বাবা বললেন ;—অবশ্য দৈবশক্তি অমূল্য,—ওর দাম কি পয়সায় হয়? তাছাড়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা, সৎপাত্রে দান এ তো আমাদেরই কর্তব্য। তারপর, দৈব ব্যাপারে দর কাষাকষি চলে কি? এখন আমার ঐ একমাত্র সন্তান, ওর শান্তি, ওর প্রাণের জন্য একশতই দিব; আপনি আশীর্বাদ করবেন। তা টাকাটা কখন লাগবে?

সাধু বলিলেন, আমি বলি কি, কবচ ধারণের পর আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেলে তখনই দিবেন।

তাহলে তো কথাই নাই, আনন্দেই দিব।

তাই দিবেন। তাহলে এই কথাই রইলো।

পায়ে রাখবেন, বলে প্রণাম করে বাবা উঠলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

দাদা-জীবন। যোগিবাবা আমায় বলচেন,—শোনো,—তোমার কাজ শেষ হলো মনে করেচ?

আমি তো কিছুই মনে করিনি, তবে কবচ ধারণেয় পর আর তো কিছু কাজ দেখচি না।

অবশ্য কবচের কাজ তো হবেই,—কিন্তু স্থায়ী স্বস্তি ও শান্তির জন্যে ওর জীবনে কাজ চাই, মনোমত কাজ, যার সঙ্গে ওর প্রাণের যোগ থাকে এমন কাজ চমৎকার হয়, যদি—

যদি কি?

উত্তরে যোগী বললেন, একটি সুপাত্র জোগাড় করে যদি চার হাত এক করে দেওয়া যায়। ভাবচি, মা জগদম্বা যদি এই রকম একটি ঘটিয়ে দেন তো বেশ হয়। এই কাজটা সম্পূর্ণ হলো বলে মনে করতে পারি তখনই।

কথাটা তোমার মুখে শুনলাম তাই,—অন্য কেউ বললে মনে করতাম, পরিহাস।

সে কি, বন্ধু, তুমি একথা বললে ?

কেন বলবো না,—সরলা বালিকার এই মানসিক অবস্থা, চক্ষের সামনে পৈশাচিক হত্যা, বীভৎস কাণ্ডের অসহ্য প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই বিকৃতি, তার ঔষধ হলো বিবাহ। এই কি বিবাহের মত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের অনুকূল অবস্থা ?

কথাগুলি শুনেই যোগি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কতক্ষণ পর বললেন; আমরা জানি তন্ত্রধর্ম এবং সাধন সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধিৎসা বেশ কিছু দিন প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকগুলি তান্ত্রিক, সিদ্ধ ভৈরবীর সঙ্গের ফলে সাধন ও সিদ্ধির পরিচয়ও ভালই জানা হয়েছিল। মূলে আনন্দসত্বা প্রকৃতি পুরুষের যোগই এই সৃষ্টির চরম ও পরম তত্ত্ব অর্থাৎ তন্ত্রধর্মের সার কথা এইটিও ভালমতেই জানা হয়ে গিয়েছে। এর পরও তুমি বর্তমান অবস্থায় অনুমণির বিবাহের কথায় এমন পিউরিটানিক্ মনোভাব • নিয়ে বিচার করতে গেলে কোন্ বুদ্ধিতে ?

এক ঘা চাবুক যেন পিঠে পড়লো, ফলে আমার বাক্‌রোধই হয়ে গেল কতক্ষণ।

কি ? আর কথা নেই যে ভায়ার মুখে ?

দেখ, তুমি জ্ঞানী। যথার্থই সায়ানটিষ্ট, অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞান যথাক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছ, আর—আমি নার্ভাস, দেখ, এখনও থিওরী ভাঁজছি।

আমরা যখন এই সব কথায় মসগুল ছিলাম,—মেয়েটি হয়তো সেই সময়েই জেগে উঠেছিল, এখন দেখি ধীরে ধীরে উঠে বসলো। হয়তো আমাদের কথা খানিক শুনেও থাকবে;—অদ্ভুত এক

কৌতূহল দৃষ্টি তার,—চার দিকে চেয়ে এখন জিজ্ঞাসা করলে,—আমার বাবা কোথা, আমার মা?

যোগী বললেন,—তাঁরা নীচে ঘরেই আছেন, তুমি যাওনা, ঐ সিঁড়ি দিয়ে,—যেতে পারবে?

যাবো,—বলে সে উঠলো। দুর্বল শরীর—তবুও সাধুকে প্রণাম করলে আমাকেও প্রণাম করে দ্বারপথে চললো। আমি পিছনে ছিলাম,—নীচে ওদের ঘর পর্যন্ত গেলাম পোঁছে দিতে।

ওদের ঘরটি দেখলাম বেশ গুছিয়ে নিয়েচেন গিন্নি। মেয়েকে দেখে মা একেবারে জড়িয়ে ধরলেন এসে। বাবা বসে বিঁড়ি হাতে ভাবছিলেন, মেয়েকে দেখেই আনন্দে কথাই কইলেন না। মা বললেন,—এইবেলা কিছু খেয়ে নাও তো মা;—এর পর মন্দিরে যেতে হবে সন্ধ্যায়। মেয়ে বসে পড়লো, বললে, এখন কিছুই খাবো না, খাওয়ার কথা বলবেন না।

আমি এই সব দেখে শুধু বলে এলাম, সন্ধ্যার আগেই এসে নিয়ে যাবো,—এখন আমি যাচ্চি।

মা বললেন—আত্মীয় কুটুম্বের বাড়া, কোথায় ছিলেন বাবা আপনারা? আপনারা না থাকলে কী যে হোতো আমাদের, সকাল থেকেই তাই ভাবচি।

বললাম—অন্য কেউ থাকতো, যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নিতেন।

এখন পথে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরেই এলাম। এমন একটা রহস্যময় আকর্ষণ আছে এই প্রাচীন উপনগরের মধ্যে, নদীতীরে এলেই সেটা বেশ অনুভূত হয়। এক সময় এইখান থেকে বাণিজ্য-তরী, বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ বহু দূর জলপথে কত দেশ-দেশান্তরেই যাত্রা করতো পণ্যভার নিয়ে। কত কত ধন ঐশ্বর্য সম্পদ তখনকার দিনে তাম্রলিপ্তির এই বিশাল বন্দর

দিয়েই যাতায়াত করতো। পৌষ সংক্রান্তির দিন মহাজনদের নৌবহর,—পূজা অর্চনার সঙ্গে শঙ্খরোলে শুভ যাত্রার সূচনা করতো, নর-নারীর মিলিত কোলাহলে বন্দর মুখরিত হয়ে উঠতো। প্রাচীন এই জাহাজ ঘাটায় কত বড় বড় সমুদ্রগামী পোত নিরন্তর দেখা যেতো, তার জায়গায় এখন ছোট বড় নৌকা—অবশ্য সবই মালবাহী নৌকা, পালোয়ার, আর দূরে দূরে ছোট ছোট জেলে ডিঙিগুলি নড়াচড়া করছে দেখা যায়। কলকাতার ওপারে সালিখা অথবা শিবপুরের কোলে যেমন কতকগুলি নৌকা বাঁধা থাকে, তার মধ্যে সব রকমের নৌকা থাকে এখানেও সেই রকম। সেই পুরানো দিনের সঙ্গে এখনকার কোন অবস্থার তুলনা করাই যায় না। কারো কারো মনে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতি, তাও আবার জোর করে যেন ধরে থাকা, স্থানে এসে দাঁড়ালে হয়তো উদ্দীপ্ত হয়। সেই পুরাতন ঐশ্বর্যের সাক্ষীরূপা এখন এই বর্গভীমাই আছেন এখানকার অদ্ভুত রহস্যময় স্থাপত্যের মধ্যে আবদ্ধ।

প্রাচীন স্থান, রাজা বা রাজবংশ আছেন, রাজবাড়িও আছে একটি পুরাতন জীর্ণ ও শীর্ণকায়া, তবে সে আধুনিক। অতি পুরাতন সেই তাম্রধ্বজ রাজার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিনা। এদিকটায় এক ঘাট পুকুর বা ঘাট পুকুরই সেই অতি পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেচে। অবশ্য অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে এর চেহারা এক রকম, আমাদের চক্ষে হয়তো সে রমক নয়। এই দিকেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপাদি অনেক আছে সেটা আমাদের মত অব্যবসায়ীদের মোটেই আকর্ষণ করে না। এক সময় রাজধানী ছিল নাকি এই স্থানটিতে।

চমৎকার কতকগুলি গাছ চক্ষে পড়লো। এই পুরানো গাছগুলিও অনেক কিছু দেখেছে এই প্রাচীন রাজধানীর। সেই রূপনারায়ণের বিস্তৃতিও এখানে কম নয়। এই ভাবে খানিক ঘুরে

বাজারের ঘন জনসমষ্টির মধ্যে না গিয়ে ফিরলাম। বাজার-হাট সব জায়গাই সমান, পণ্যদ্রব্যেই ভরা।

এখন ফিরে এসে পৌঁছে গেলাম মহিমাচরণের বাসায় দরজায় দাঁড়িয়েছি, শুনছি সেই একই কথা,—বাঁকুড়া থেকে পত্র কত দিনে আসবে। কত দিনে যেতে পারবেন সেখানে। কত দিনে আপনজনের মুখ দেখতে পাবেন। এই সকল কথাই চলছিল। দেখলাম অনুমণি একখানি নীল শাড়ি পরে বসে আছেন প্রস্তুত হয়ে। শরীর ক্ষীণ হলেও মনে হল অনেকটা স্বাভাবিক।

আমায় দেখেই মহিমাচরণ বললেন—এই যে, এইবার যেতে হবে।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—এরই মধ্যে অরুচি ধরে গেল আপনার এ জায়গাটিতে ?

হাঁ,—তাতো হতেই পারে। মনে করুন এই যাত্রীশালায় থাকা, নির্বান্ধব প্রদেশে,—

আমরা কি আপনার বান্ধবদের মধ্যে গণ্য হতে পারি না। এই সময় অনু বিরক্তপূর্ণ মুখে মায়ের দিকে চাহিল,—মা তখন বললেন, বাবা ওনার কথায় কান দিবেন না, ওঁর মেজাজ ঠিক নাই।

চলুন, মন্দিরে যাওয়া যাক্। এবার অনুমণি আগেই উঠে দাঁড়িয়েচে দেখে মনে হলো যাত্রা শুভ।

আমার একটি কৌতূহলও ছিল এই ব্যাপারে সেটা এই যে,—কবচ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল ক্রিয়া কিছু দেখা যাবে কিনা। যখন মন্দিরে পৌঁছলাম, পূজারী তখন ছিলেন না। আমরা সামনের যজ্ঞ মন্দিরেই বসলাম। তার সামনেই বিরাট নাটমন্দিরাদি। উপরের দিকে চাইলে, কি আশ্চর্য কৌশলে দেশের স্থাপতি এই মন্দিরের ভিতর দিকের ছাদ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছেন ভেবে মুগ্ধ হতে হয়। না দেখলে কথায় বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়।

ভারতে এমন ভাস্কর্য আর কোথাও নাই। অম্বুমণি কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে এখানকার কারু-বৈচিত্র্যই দেখছিল। মাঝে মাঝে আমার দিকেও দেখছিল। আমার খুব ভালই মনে হল ওর বর্তমান অবস্থা। অনেক দূরে নয়, কাছেই ছিলাম। আমার দিকে দেখতে দেখতে এক সময় আমায় লক্ষ্য করেই বললে,—কাল আপনাদের বড় কষ্টই দিয়েছি আমি।

বললাম, তা ঠিক নয়; যাঁর ঘরে আপনি আজ ঘুমিয়েছিলেন সারাদিন, তিনি যা কিছু করেছেন। তিনিই লক্ষ্য রেখেছিলেন—আমি যন্ত্রের কাজ করেচি মাত্র।

এমন সময় পূজারী এলেন হাতে একটি ঝারি তার মধ্যে অনেক কিছু, আর এক হাতে একখানি নতুন লাল কাপড়। কাপড়খানি অম্বুর হাতে দিয়ে বললেন,—ঐখানে গিয়ে কাপড়খানি পরে এসো। মা ও মেয়ে উঠে গেলেন, পূজারীও মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অনেক লোক ছিল না।

অল্পক্ষণেই দ্বারপথে দেখা দিলেন পূজারী ঠাকুর,—অম্বুকে সঙ্গে নিয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আমরা বাহিরেই অপেক্ষায় রহিলাম।

আরতির আয়োজন ওদিকে চলেছে, সে এক চমৎকার দীপাধার, এমনটি সাধারণত দেখাই যায় না। অবশ্য এখন দেরী আছে, তাহলেও আয়োজনটি আগে থাকতেই করতে হয়। এই সব দেখেই এটি অতীব প্রাচীন দেবস্থান বলে ধারণা হয়। সব কিছুই সুশৃঙ্খল, আমাদের কালীঘাটের মত নয়। অথচ কালীঘাটের ঐ তীর্থ কত প্রাচীন কালের—বাহান্ন পীঠের একটি, সেথা এমনটি দেখা যায় না কেন?

অল্পক্ষণেই অম্বুমণি ধীরে ধীরে মন্দির হতে বেরিয়ে এলো। এখন আর সে মূর্তি নেই, যেন এক অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত দেবীমূর্তি

সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে প্রসন্ন ভাব, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় লাল ফিতার সঙ্গে বাঁধা কবচ,—দেখে আমার যে কী আনন্দ হলো সে কথা আর বলে কাজ নেই। পূজারী আচার্য, সস্ত্রীক মহিমাচরণের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন যে দশ দিনের মধ্যে যেন কবচ খোলা না হয়, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে হারের সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য হয়ে থাকবে। পিতা একটি টাকা দিয়া প্রণাম করলেন দেবীর স্থানে;—আসবার সময় একটি মালসায় কলাপাতায় ঢাকা প্রসাদ এনে দিলেন। পূজারী বললেন, মেয়ে আজ এই প্রসাদ খেয়েই থাকবে, রাত্রে আর কিছুই খাবে না।

যোগজীবনের কাছে গেলাম রিপোর্ট দিতে, দেখি তখনও নিজ আসনেই রয়েচেন,—নিঃশব্দেই ফিরে এলাম। নিজ শয্যায় বসে ভাবছিলাম কত কথা। সেই ট্রেনে একত্র আসার ব্যাপারটা, কি পরিণতি লাভ করলো দুই দিনে; এখনও শেষ হলো কিনা কে জানে!

এবার যোগিবাবার সাড়া পেয়ে গিয়ে বসলাম, এবং সব কিছুই বললাম।

ইতি অম্বুর দেবী-কবচ ধারণ পর্ব সম্পূর্ণ।

যোগজীবন বললেন;—

তোমার প্রাণের টানেই মেয়েটির একটি সৎ গতি হলো। তুমি গোড়া থেকে এতটা পক্ষপাতি না হলে বোধ হয় এভাবের হতো না। এতটা টান কি শুধু বিপন্ন অবস্থা বলেই?

তুমিই বলো, তা ছাড়া আর কী ভাব থাকতে পারে। ওদের ঐ কথা যে শুনতো সেই সহানুভূতির চক্ষেই দেখতো, যেমন তুমিও দেখেচো।

খোঁটার সূত্রটার উপর জোর দিয়েই বললেন, তা সত্ত্বেও তোমার মত এত টান কারো হতোই না।

কেন বলো তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুলেই বলোনা, এতটা কায়দা করছ কেন?

তখন সাধু বললেন,—আহা, চটো কেন? আমি কি বুঝিনা কিছু,—তুমি অতগুলি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর তোমার জাত-টান, তাদের দুঃখ দুর্গতি তুমি সহ্য করতে পার না,—এ আমি বুঝিনি ভেবেচ। তা ছাড়া তোমার সেই মেয়েটি—যার সঙ্গে ওর বয়স ও আকৃতি প্রকৃতিগত ঐক্যই তোমায় এতটা আকৃষ্ট করেচে; এ যদি না বুঝবো তাহলে অবধূত শিষ্য আমি হতেই পারি না। যাক্, তোমার অনয়োরণিয়ান এখন সুস্থ হবার পথে এসেচে তাই আমার আনন্দ। শুনে আমিও বললাম—মহতোমহীয়ানের কৃপায় যে সেটা ঘটেছে এই জন্যই আমার এখানে আসা সার্থক মনে করচি। অতএব তোমার বজ্র এখন সম্বরণ করো।

সে রাত্রে আমাদের মধ্যেই ঠিক হলো যে আমরা পরশু দিনই বিন্ধ্যাচল যাত্রা করবো যেহেতু আমাদের কিছু কাজই রইলো না, এখন মেয়েটি সারবার পথেই চলেছে মায়ের কৃপায়। কথাটা শেষ করেই উঠতে যাচ্চি,—দরজার কাছে আবছায়ায় এক মূর্তি। অশ্চর্য ব্যাপার;—যোগিবাবা কাছে গিয়ে,—আরে, আমাদের অনু মা যে;-এসো মা, এসো, বোসো, ব্যাপার কি? রাত্রে কেন বলো তো? পেটে কিছু পড়েচে কিনা আগে তাই বলো?

প্রসন্নমুখে অনু প্রবেশ করলে,—বললে, এই তো প্রসাদ পেয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম -কি কি ছিল প্রসাদে বলো তো;—

ভাত ছিল, খিচুড়ি ছিল, দুখানা লুচি, ভাজা ডাল তরকারি

শেষে পরমান্নও ছিল। বললাম, আজ চার দিন পরে পেটে অন্ন গেল।

অন্নের গুণ এমনি যে অম্বুর মূর্তি গতি সবই বদলে গিয়েছে। সে মেজেতে পামুড়ে বসলো। যোগী বাবাকে বললে, কাল সকালে আমি আপনার কাছে আসবো—আমার কিছু বিশেষ কথা আছে, জানিয়ে গেলাম আজ।



সাধু বললেন—মা গো, তুমি আজ যে এতটা সহজ হয়ে আমাদের কাছে আসবে তা কল্পনাও করিনি। মায়ের কোলে এসে পড়েছিলাম, তখন জানতাম না যে মা কেন এখানে আনলেন কি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

আচ্ছা, মা, কাল আবার দেখা হবে। যদি আসো তবে সকালে একটু বেলায়, সাড়ে আটটা নাগাদ এসো। আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙ্গে না।

সত্যিই আপনি অটটা অবধি ঘুমান ?

প্রায় সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাতে পারিনা, বেশী রাতটাই জেগে থাকি ; ভোর বেলাটা ঘুমাই,—তাই দেরী হয়ে যায় উঠতে।

মনে আমারও একটা কথা এলো, বলেও ফেলালাম অমুকে—

উনি যদি রাত্রে আমাদের মত ঘুমাতেই পারতেন,—তাহলে কি কাল রাত্রে তোমায় বাঁচানো যেতো ?—উনি ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে বসে আছেন যে।

শুনিয়া যোগী বলিলেন, মাগো, ওর বাড়াবাড়িটা মোটেই সত্যি বোলে যেন নিওনা, আসলে রামপ্রসাদই যথার্থ ঘুমের ঘুম পাড়িয়ে ছিলেন,—ও সেইটে আমার উপর চাপিয়েছে। মেয়েটি বললে ;—আচ্ছা, তা হলে সাড়ে আটটা নাগদ আসবো। এখন আমি তা হলে যাই—এই বলে দাঁড়লো,—গেলনা। এক-বার একটু উঁকি মেরে দরজার দিকে দেখলে তার পর অতীব নীচু গলায় বললে—দেখুন, আমার বাবা ভয়ানক শোক পেয়েছেন, আপনি সবই শুনেচেন তো ; আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ; —এই বয়সে এ আঘাত সহ্য করতে সবাই পারে না ;—সেই জন্যই ওঁর মাথার ঠিক নেই ;—এখন এখান থেকে বাঁকুড়া যাবার জন্য ছটফট করছেন। যেই দেখলেন আমি ভাল আছি, প্রসাদ খেয়েচি, —অমনি বাঁকুড়া যাবার ঝোঁক। বড়ই ব্যস্ত লোক—এখন আপনজনের মুখ দেখবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন। আমরা কিন্তু যেতে চাইনা এখান থেকে ; তাই মা আমাকে বলে দিলেন যাতে উনি এখান থেকে না যান, আপনারা—

যোগীজীবন বললেন,—উনি কি ছেলেমানুষ যে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরা রাখবো।

মেয়েটি বললে,—আমরা কেন ওখানে যেতে চাইনা সে কথাটি আপনাকে না বললে বুঝবেন না। আমার জ্যেঠামশাই, বিষয়

ভাগাভাগির পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কেশব সেনের দলে নববিধানের শিষ্য। তাঁর তো জামাই যোগেশবাবুও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। ঠাট্টা করেন আমরা নাকি মাটির ভগবানের পুজা করি—তা ছাড়া তিনি বিলাত ফেরত। একেবারে পুরো সাহেবি চালে চলেন। বাড়িতেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদে, ককটেল করেন। আমরা কেউ শান্তিতে থাকতে পবো না ওখানে গেলে- বাবা ওসব গ্রাহ্য করেন না। তাই এই বিপদের পর থেকে আপনজন দেখবার জন্য নেচে উঠেচেন। আমাদের আসল কথা, আমরা আপনাদের পেয়েছি, —মা বলেন; যেমন হারিয়েছি, তেমনি ভগবানের দয়াতেই আপনাদের মত আপনজনও পেয়েচি। আমার যে অবস্থা হয়েছিল, মা বলেন, আপনরা না থাকলে কি হতো ভগবান জানেন। —সেথায় আপনাদের কোথায় পাবো? এই দুঃসময়ে আপনারা আমাদের ত্যাগ করবেন না।

আচ্ছা মা, কাল সকালে দেখা হবে, এখন—তুমি মা জগদম্বাকে ডাকো, উপায় তিনিই করে দেবেন ঠিক। যাতে তোমাদের কল্যাণ হয় তাই করবেন,—বিশ্বাস রেখো তাঁর উপর।

অনুমণি চলে যাবার পর যোগীবর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, নাও ঠেলা,- কি ফ্যাসাদ জোটালে বলো তো—এখন আমি কী করি। মা মা, জয় মা, রক্ষা করো। একেই বলে কর্মই কর্মকে টানে। একটা কর্ম সামনে এসে পড়লো, বিপন্ন দেখে দয়াপরবশ হয়ে লাগলে সেই কর্মে; সেটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারই আনুসঙ্গিক আরও কর্ম এসে জুটলো এখন ঠেলা সামলাও। শুনিয়া আমি বলিলাম—সেটাও তো তোমার ইচ্ছাধীন,—না করলেও তো পারো?

সকল ক্ষেত্রে কি নিজ ইচ্ছামত কর্ম ত্যাগ বা গ্রহণ করবার সুযোগ থাকে। এই বলচো তুমি, সবকিছু তাঁরই ইচ্ছানুসারেই

হচ্ছে,—আবার কর্মের স্বাধীনতাব কথা আনচো কি করে। বিশেষ এই ব্যাপারে সঙ্গে যে এক বিশেষ ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রত্যক্ষ যুক্ত দেখচি একথা কাহাকেই বা বলি ?

এখন ঐ মহিমাচরণবাবুর কথাই ধরো,—কর্তা তো খবর রাখেন না, এখানে কার অধিকারে এসে পড়েছেন, এ জানতে সাধ্য নেই তাঁর। এখন মেয়েটি সুস্থ হয়ে এসেচে, এবার যা মন চাইবে তাই করবেন। এদিকে যে আরও কাজ আছে তার হুঁস নেই।

কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ের মনস্থির হয়েচে, আর কাজ কি রকম, একটু খুলেই বলোনা। শুনে যোগির চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—যেন ভিতরের আলো বাইরে আসতে চায়। বললেন,—কাতর হয়ে যখন একবার মেয়ের জন্য আত্মসমর্পণ করেচেন. যতক্ষণ না সে কাজ সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ নিষ্কৃতি কোথা ? মহামায়া সহজেই ছেড়ে দেবেন মনে করেছো। বিষয়ী লোক, যা কিছু বুদ্ধির পুঁজি বিষয়েই ঢালা রয়েচে, মা জগদম্বার উদ্দেশ্যের কথা কি বুঝবেন—বাবু ?

সাধু যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন—

উনি তো বিদেশী,—ঐ যে মন্দিরের পূজারী, মাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, তারাই কি জানে যে এই মা-দেবীটি কি বস্তু। ওরা শুধুই প্রচার করে,—মা বড় জাগ্রত। মায়ের দৌলতেই ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস চলেছে তাদের। তাই, কতকটা আনুগত্য আবার কতক ভয়ও আছে। উৎসাহ বেড়ে যায় যখন কোন বড় যজমানের মানৎ অর্থাৎ মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই সব নিয়েই তো ওরা আছে—ভগবতীর তত্ত্ব কে করে ?

তারপর, অন্য দিকে,—যার জন্য এই সিদ্ধপীঠ, এত বড় একটা প্রকাণ্ড জনপদকে বল, বুদ্ধি, ভরসা যোগাচ্চেন তাঁর কথা আর মনে আনবার দরকার নেই। নিজের দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করে যিনি এই

তারা মাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, মাকে এই কেন্দ্রে বাঁধলেন, তাঁকেও ওরা ভুলে বসে আছে। অবশ্য কালধর্মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু তিনি নিজ ইষ্টকেই জনহিতায়, তাঁর সিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পুরুষ একজন এলেন, উপাসনা,—পূজার ভার নিয়ে, তিনি বললেন-- এ তো শুধু তারা নয়, ইনি উগ্রতারা। আসলে এরা নিম্নস্তরের। মায়ের শুধু তারা নাম তাদের মনঃপূত নয়, একটা উগ্ররকম বিশেষণ না দিলে তার বুদ্ধি, তার অনুভূতি তেমন জোরালো বলে প্রমাণ হয় না। তাই উগ্র-তারা, বজ্র-তারা, এ তারা, সে তারা নামের উৎপত্তি। এক মা,—এ যেন হাল্কা, ঘর সম্পর্ক হয়ে যায় ;—তাই ভাষার অলঙ্কার জোড়া লাগানো। পাগলেরা জানে না,—এক কালী বা তারাই সব,—আর কেউ নেই ;—তাঁরই অস্তিত্বের ঠেলায় ত্রিভুবন টলটলায়-মান, কত উলট-পালট হয়ে যায় ; এ ধারণা থাকলে ঐ সব প্রাণ চমকানো শব্দসম্ভার জোড়া দেবার প্রবৃত্তিই হতো না। ওরে বোকা পণ্ডিত,--মাকে পেতে, মাকে বুঝতে, ঐ এক মা ছাড়া কোন শব্দই পর্যাপ্ত নয়। মাকে গয়না পরিয়ে বড় করতে চাস কেন, এটাতে যে মায়ের অপমান,—আর তোর বোকামির পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। এটা যদি আভাষেও বুঝতিস তা হলে আর এ দুর্মতি হবে কেন? যতই ভাষার অলঙ্কার বাড়াবি, অলঙ্কার বিশেষণ চাপাবি ততই যে সেই পরম অস্তিত্বকে দুর্বোধ্য করে ফেলবি ;—সামলানা তোর অহঙ্কারের খেলাটা!

এক মনে শুনছিলাম, এমন কথা তো আগে শুনিনি। বলতে বলতে এখন যেই থেমেচেন একবার, আমি যোগীর দিকে দেখলাম। —একটু রহস্য করেই জিজ্ঞাসা করছেন, কি ভাবছো? বললাম, ভাবছিলাম যে, তোমার নামে মায়ের কাছে নালিশ চলে।

কি রকম?

ধরো, যারা উগ্র-তারা, বজ্র-তারা, বিদ্যুৎজ্বালা, করালী এই সব নাম প্রচার কবেচেন, তাঁরা যদি মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করেন—দেখো তো মা, কালকের একটা বালক, তোমার মূর্তি নিয়ে আমাদের দেওয়া নাম নাকচ করে দিচ্ছে।

একটু হেসে যোগি বললেন,—তখনই মা তাদেরকে বলবেন, প্রথমাবস্থায় দূর থেকে আমার রূপের একটুখানি পেয়েই আনন্দে তোরা এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলি কেন নাম নিয়ে বাছা;—আমাব নামে একরাশ শব্দ, অক্ষরের বোঝা চাপিয়ে নিজের খুসীমত লম্ফ ঝম্ফ করে তো চলে গেলি;—এখন ওরা এসে যদি আসলটা চিনে নিয়ে, শব্দের বোঝাগুলো ফেলে আমায় হাল্কা করে দিয়ে থাকে তাইতেই আমার আনন্দ, ওবা সত্যই কাছে থেকে দেখচে বলে। ওদেব ওপব অত রাগ কেন বাপু? ওরাও তো ফেলনা নয়।

তারপরেও ওরা হয়তো বলবে,—তুমি বেশ মা তো, তখন যে আমাদের উপব খুব খুসীই হয়েছিলে, তাইতো অত উৎসাহিত হয়েছিলাম আমরা। মাও বলে দেবেন;—প্রথম মুখেই কেউ তো সবটা পায় না; তোরা ঐ একটুখানি পেয়ে তারই আনন্দে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিস, সত্যকে দেখতে বুঝতে চাসনি, ভাব আর আনন্দই সম্বল করে ছুটেছিলি! আমি মা হয়ে কি তোদের সেই আনন্দে জল ঢেলে দিতে পারি? তা হলে কি তোদের দুঃখ হোতো না? তখন আনন্দেই তাই সহ্য করেছি বাগ করো না বাছা,—সত্যকে ধরে কথা কও। অলঙ্কার, শব্দ আড়ম্বর তত্ত্ব নির্ণয়ের পরিপন্থি এটা ভুলে যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো কথা কি?

এখানে যেমন খর্বভীমা তারা-মূর্তি, তেমনি দক্ষিণেশ্বরের বর্তমান পীঠ তো রামকৃষ্ণই প্রতিষ্ঠা করেছেন ভবতারিণী কালী-মূর্তিতে?

যোগি বলিলেন,—মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেচেন রাসমণি,—আসলে বুঝতে হবে, রামকৃষ্ণ ঐখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন, ফলে ঐটি সিদ্ধপীঠ হয়ে গিয়েছে,—এটা প্রতিষ্ঠা করছি বোলে তাঁকে কিছুই করতে হয়নি। তত্ত্বটি এই যে, এইখানে তাঁকে কেন্দ্র করেই ভাগবতী শক্তির আবির্ভাব হযে গিয়েচে। ওখানেও যা এখানেও তাই। তিনি বললেন, হাঁ গো, ঐ একই সূত্রে এখানকার বর্গভীমা আর দক্ষিণেশ্বরের ঐ ভবতারিণী বাঁধা। অবিকল একই তত্ত্ব। ঠাকুরও কি মাকে বলেননি যে,—মা গো, - এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তাদের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রত্যেক সিদ্ধ মহাপুরুষেরই ঐটি শেষ কামনা তাঁর ইষ্টের কাছে। নিজেদের তো চাইবার কিছুই নেই; সিদ্ধ হওয়া মানেই তো ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তাঁর আর আলাদা করে চাইবার কি থাকলো? আবার বলছেন,—

তাঁরা তো জানতেন সাধারণ জীব কতটা অসহায়, বহির্মুখী বলে। তবু বিপদে অশান্তিতে নানা দুঃখ বা পীড়নে অন্ততঃ এই রকম একটা পীঠস্থানে বা সাধন কেন্দ্রে এসে আত্মসমর্পণ করলে খানিকটা তো চৈতন্যমুখী হতে সাহায্য করবে তাকে, এই আর কি। বিশ্বাস করে আশ্রয় নিলে পাওয়া সহজ হয়ে যায়। এখানেও দেখ বিশ্বাসটাই সবার বড়ো।

আচ্ছা এমনই চৈতন্যের ভূমি বা তীর্থক্ষেত্র, এমন পবিত্র স্থান অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এখানে এত ব্যবসাদারি বিষয়, কারবার কেন? সব তীর্থ তো দেখেছি, হাট-বাজার, হৈ হৈ নানা প্রকার শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যসম্ভার নিয়ে যেন যুদ্ধ চলছে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে।

আহা, বাইরের শরীর দেশভূমির এতটা প্রসার, আর দৈবশক্তির কেন্দ্র হলো ঐ দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্রটি; ঐ একটুখানি বিশেষস্থানেই মহাপীঠ দেব বা দেবীর অধিষ্ঠান-মন্দির; যারা

বোঝে তারা বাইরে জাঁকজমক দেখে ভোলে না। যাহারা বহির্মুখী তারাই হাট বাজার মনোহারির দোকান দেখেই ভোলে। সাধক তাতে ভুলবে কেন?

আমার ঘুম এসেছিল,—রাত এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে এবার শোওয়া যাক, অনেক কথাই তো হলো।

প্রহর উত্তীর্ণ হলো জানলে কি করে?

শেয়ালগুলো ডেকেছিল শুনেছি।

ওহো, তুমি দেখচি অনেক ঘাটের জল খেয়েচ।

পরদিন সকালে ঠিক সময়েই অনু এসেচে, তখন আমরা আজ-কালের মধ্যেই বিন্ধ্যাচল যাবার কথাই কইছিলাম। আমি উঠলাম এই ভেবে যে,—ওর এমন কথা থাকতে পারে যা আমার শুনবার নয়। অনু বলে, আপনি উঠলেন কেন?—বললাম, বাইরে আমার একটু কাজ আছে। শুনে অনু বললে, আচ্ছা আমার কথা হয়ে গেলে কাজে যাবেন। বসতেই হলো অগত্যা।

এবার মেয়েটি গম্ভীর হয়ে গেল। তাই দেখে যোগজীবন বললেন, বলতো মা তোমার আসল কথাটি; এবার আমি প্রস্তুত। কিন্তু অত গম্ভীর হয়ে গেলে আমি ভয় পাবো যে। তখন সহজ ভাবেই মেয়েটি বললে—

আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিয়ে এখন থেকে অধ্যাত্ম পথেই সারা জীবন কাটাতে চাই। আমায় আপনি বাঁচান এই সমাজের খপ্পর থেকে।

খুব ভাল কথা, —বেশ, তোমার বাবা মা কি দীক্ষিত?

হাঁ, উনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। বাবা-মা দুজনে একই সঙ্গে দীক্ষিত।

বেশ, শোনো—এখন আসল কথা যে দীক্ষা অর্থাৎ কানে

একটা মন্ত্র দিয়ে তোমার মুক্তির যে ব্যবস্থা, সেটা আমার দ্বারা হবে না, গুরুর নিষেধ। কিন্তু দীক্ষা পেয়ে যে কল্যাণ তুমি আশা করো তা তোমার হতে পারবে যদি তুমি আমার কথামত উপদেশ মেনে চলো।

হাত দুটি জোড় করে নীচু মুখে অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই অনু বললে,—আমাকে আপনার মেয়ে মনে করে আমার জীবনে কল্যাণের জন্য, এক বিবাহ ছাড়া আর যা বলবেন আমি তাই শুনবো।

এবার আমার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই যোগী এক বিস্ময় জড়িতকণ্ঠে বললেন ; ও সাধু বাবা ! এ মেয়েটি যে আমার অনেক উপরে চলে গিয়েছে দেখি। এ্যা, তাহলে মায়ের উদ্দেশ্য তো আমার পক্ষে ল্যাটিন গ্রীক হয়েই রইলো, এতটা আশা করিনি। আচ্ছা অনু-মা, তোমার হিতাকাঙ্খী ব'লে যদি আমাদের মনে করে থাকো, তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা, তার আসল কথাটা বলবে ?—যদি বিশেষ কোন আপত্তির কারণ না থাকে।

না, আপনাদের কাছে বলতে আমার কোন আপত্তি থাকতেই পারে না ;—বলচি, দেখুন—একটি পরম রূপবতী নারী, আমারই বয়স, আমারই আপনজন, তার যে দুর্গতি দেখেচি, তার চক্ষের উপর তার স্বামীকে যে নৃশংস পৈশাচিকভাবে হত্যা দেখেচি, তাতেই বিবাহ ও সংসার সুখের উপর একটা এমনই বিতৃষ্ণা এসে গিয়েচে যাতে এ জীবনে বিবাহ করে সুখী হতে পারবো না। ও-কাজে আমার কোন লাভ নেই। শুনেই যোগি বললেন,- আচ্ছা, ও -কথা থাক। এখন তোমায় তো কিছু নিয়ে থাকতে হবে—কিছু কাজে লাগতে হবে মা লক্ষ্মী।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম দু বছর আগে,—তারপর আর পড়তে ইচ্ছাই হলো না। ভাবলাম কি হবে পড়ে ? বড় জোর

৫০।৬০ টাকা মাইনের একটা চাকরি হবে, বড়জোর তাইতে নিজের খাওয়াটুকু হতে পারবে। জীবনে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তা ছাড়া আমরা বড়ই দুর্বল, একটা প্রকৃতিগত দুর্বলতা মেয়েদের আছে, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় আছে কিনা জানিনা, এটাও এক দুর্ভাবনা হয়ে বসেছে আমার মধ্যে। তাই ভেবেছিলাম আপনার কাছে অধ্যাত্ম জীবনের নির্দেশ পাবো; —তাইতেই হয়তো ভাল হবে।

যোগি তাঁহার নিজের কথাটিই সস্নেহে বললেন,—মাগো, এই অবস্থায় তুমি যা-কিছুই করতে যাবে তাই-ই হবে পরীক্ষামূলক বিষয়, তার ফলাফল অনিশ্চিত, পরিণামটা যা হবে সেটা আগে থেকে তো জানা যাবে না, শেষ পর্যন্ত তাইতে তোমার মন না থাকার সম্ভাবনাটাই প্রবল রয়েছে যে।

তা হলে আমার উপায় কি হবে,– বাঁচবার কি কোন উপায়ই আমার হবে না?

নিশ্চয়ই হবে,—তবে সেটা তোমায় নিজশক্তিতে নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেরই মধ্যে আবিষ্কার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কারো উপদেশে তোমার কিছু হবার নয়।

অনু একটু কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে বললে;–কেন—কেন?

কারণ তুমি সাধারণ,—সরল প্রাণ—পরনির্ভরশীল গতানুগতিক বুদ্ধি,—অথবা নির্বিচারে গুরু উপদেশ অনুগামী মেয়েও নও, তুমি যে স্বাধীনচেতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতি; নিজ বুদ্ধিতে চলতে না পেলে তুমি সুখী হবে না।

তবে—আমার কি উপায় হবে, আমায় বাঁচালেন কেন আপনারা?

আমরা তোমায় বাঁচাইনি তো;—তোমায় মারা বা তোমাকে বাঁচানোতে আমাদের হাত আছে, কল্পনায়ও ওকথা মনে ঠাঁই

দিওনা। ঐ ব্যাপারে আমরা ঠিক যন্ত্রের মতই কাজ করেচি,— যেমন মিস্ত্রির হাতে একটা যন্ত্র কাজ করে।

অনুমণি বললে—দেখুন, কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসচি যে ভগবানই কর্তা, সব কিছুই করেন বা মানুষকে দিয়ে সব কিছুই করান, মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। অথচ প্রত্যেক কাজ, ভাবনা-চিন্তা করা, নড়া-চড়া বলা, যা-কিছু আমরা আপন ইচ্ছায় করি, এটা করব বা করছি আমিই কর্তা বলেই তো করি; আমিই এখানে প্রধান। তাহলে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হলাম কি করে এটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

একটু স্থির হয়ে বসো দেখি,—শোনো মা। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—রহস্যটি এই যে মানুষের হাতের যন্ত্রটা, মানুষ ইচ্ছামত তার কাজের উপযোগী করে কঠোর পরিশ্রম করেই গড়েচে; তবুও সে নিষ্প্রাণ জড় একটা, মানুষের হাতেই তার নিয়তি যা কিছু কর্মগতি। আর ভগবান, আপন আনন্দে খুসিমত যা সৃষ্টি করেন, তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য, তাঁর ইচ্ছার প্রাকৃত নিয়মেতে 'সহজেই সৃষ্ট হয়ে যায়, -সে যন্ত্র প্রাণময় জীবন্ত—তার গতি আছে, শক্তি আছে—তার সম্ভাবনাও বিপুল। কারণ তার মধ্যে চেতনারূপ আমি আছে,—সেটাই অহম কর্তা। ভেবে দেখ দুই যন্ত্রের প্রভেদটা।

অনুমণি এতটাই স্থির হয়ে গেল যে মনে হল ওর যেন শ্বাস প্রশ্বাস চলেছে না। সাধু বললেন—শুনচো মা?

হাঁ শুনেচি, বলেই সে যেন জেগে উঠলো। যোগি বললেন—একটু আগেই তুমি অধ্যাত্ম পথে জীবন চালাবার কথা বলছিলে, তুমি কি জানো অধ্যাত্ম জীবন কি রকম বা কি লাভ তাতে?

না, তা তো জানিনা।

সাধু বললেন,—তাহলে না জেনেই তুমি যেতে চাইছো?

তাইতো।

স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে যোগি বলিলেন তাহালে জেনে রাখো, মানুষ যে তাঁরই হাতের যন্ত্র মাত্র, আর তিনি মানুষ বুদ্ধির অগম্য বিশ্বস্রষ্টা ধাতা ও পাতা, একমাত্র নিয়ন্তা, এই তত্ত্বেই প্রবেশ একান্তে সাধনা ও সিদ্ধি ফলে সম্পূর্ণরূপে নিজ জীবনে সার্থকতা এবং নিরাপত্তাই চাইছিলে ; এরই নাম অধ্যাত্ম পথে সিদ্ধিলাভ।

এবার অনু সহজ ভাবেই বললে,—এ তো বুঝলাম বেশ যেমন বললেন,—কিন্তু তাহলে নোয়াখালিতে যে ব্যাপার হোলো, ঐ ভীষণ হত্যা, পৈশাচিক পীড়ন যথেচ্ছাচার—এও তো সেই আসল, বিশ্বযন্ত্রী ভগবানেরই কাজ বলেই বুঝতে হবে।

শুধু বুঝতে কেন, নিশ্চিত ভাবেই ধারণা করতে হবে,—সত্যই তো তারই, তাছাড়া আর কার কাজ হতে যাবে? আচ্ছা, এর কার্যকরণ সম্বন্ধ বুঝতে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলো তো মা, তোমার বাবা কি করতেন?

নিজের জমি-জমা দেখতেন, চাষবাস করাতেন মজুরী দিয়ে। টাকা ধার দিতেন জমি-জমা বন্ধক রেখে, সুদ নিতেন, দিতে না পারলে আদালতে নালিশ করে ডিক্রি পেতেন,—আবার 'ক্রা জারী করতেন, অনেকেই জমি-জমা ঘর ব্যাড়ি নিয়ে অনেক রকমেই টাকা উশুল করতেন। আইন আদালত নিয়েই বেশীর ভাগ থাকতেন। সাধু বললেন –শুধু তোমার বাবাটি নয় অমন শত শত ছেলে-মেয়ের বাবারা আগে থেকেই ঐ কাজ করে এসেছেন তো। আর আইন তো ধনবানেরই পক্ষে। কিন্তু মা ভেবে দেখো তো আইনসঙ্গত ভাবেই যার ভিটে-মাটি গেল, তার প্রাণে কি লাগেনি, ভিতরে ভিতরে কতদিনের জমা রীষ, ফলে যেই সুযোগ এসেচে অমনি দুর্দমনীয় বেগেই আরম্ভ হয়ে গেল ওদের যা কাজ। এটা দুইপক্ষেই পরমেশ্বরের সহজ নিয়মভঙ্গের ফল।

ঐ খানেই শেষ নয়,—বুঝে দেখবার মত আরও কিছু আছে। পাশাপাশি বাস। একদল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধন-সম্পত্তিতে সকল দিকেই প্রভুত্ব ক'রে এসেছে অন্য দল গায়ের জোর থাকতে পরিশ্রমে অকাতর, তাদের আগেকার অধিকার স্মরণ করে কতটাই বা সহ্য করতে পারে? তাছাড়া ধর্মের ক্ষেত্রে মতবিরোধ; বিচারে ধর্ম বা জ্ঞানের ব্যাপারে সোজা সহজ মেলামেশার ভিতরে কোন যুক্তিযুক্ত বোঝাপড়া নেই, সুযোগ সুবিধা নিয়েই করবার;— একদল হলো অপব দলেব ঘৃণাব পাত্র আর অপর দল গায়েব জোরে দুঃসাহসিক হীনাচাবে অভ্যস্ত—আবার তাদেরই পরিশ্রমে অন্ন উৎপন্ন করে লাভবান অপর পক্ষ। এইভাবে কতদিন চলতে পারে? এতদিন পর মৌকা তাদেরই এলো কৃত্রিম মেজরিটিব জোরে। ইংবেজ সবকার প্রসন্ন ছিলেন ওদের উপর। তারপর সরকার-বিরোধি উন্নত বাঙ্গালী হিন্দুর উপর এলো সরকারী-জাত ক্রোধ। ফলে ওদেরি সরকারী আমলেই সুযোগ পেয়ে গেল, আর যা করবাব তা করলে। ওদের প্রবৃত্তি, ওদের বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি নিয়ে যতটা পেরেছে করেছে আগে থেকে জমা আক্রোশ মেটাতে। এ হলো যন্ত্রে যন্ত্রে লড়াই—কর্তা দেখচেন স্বাধীন যন্ত্র তাঁর কেমন কাজ করছে। এর বেশী আর কি করতে পারতো। বুদ্ধির কারবার তো ওদের ঐভাবেবই, গায়ের জোরে সতেজ ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগই ওদের কারবার; ওরা ঐ কাজই করবে দুপক্ষেরই যখন জীবনের উদ্দেশ্যই আলাদা। কাজেই ঐ ব্যাপারে তোমাদেরও কতটা নামিয়ে এনেচে সেটা ভেবে দেখেছ? একটা ঘৃণা আর আক্রোশ তো রয়েই গেল, এর ফলে পরে তোমাদের মধ্যেও হিংসাপ্রবৃত্তি কম জাগায়নি,—সেটা কি ভালো হলো? এটা এইখানেই শেষ নয়, আর দেখো না এর জের কত দূর যায় -

সর্বনাশ। তা হলে উপায়? সাধু বললেন,—উপায় অবশ্যই

আছে কিন্তু তা চায় কে? আছে উপায় দু রকম। একরকম ব্যক্তিগত অর্থাৎ তুমি একটি ব্যক্তি, তোমার পক্ষে উপায় হলো বুদ্ধিপূর্বক ঐ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র থেকে সরে আসা। তুমি বুঝেচ যে হাতে সুযোগ পেলেই নিজ সার্থ সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করবার প্রবৃত্তি বড়ই উত্তেজক এবং ভয়ানক ফল প্রসব করে বিশেষত যখন প্রতিক্রিয়ার সময় আসে। এ ভাবে অশান্তির জীবন, যারা ভালো সংভাবাপন্ন লোক কখনই চাইতে পারে না' এমন কাজে না যাওয়া যাতে, নিজ কল্যাণের জন্য অপরের ক্ষতি করতে হয়। এরই নাম সংপথ। এটা ব্যক্তিগত উপায়। আর ঐটাই সমষ্টিতে বা সমাজগত হলেই সং-সমাজ যেখানে বেশীব ভাগ লোকই ওটা বুঝেচে। সংভাবের একতা থাকলেই ও-সব পাপ আর থাকবে না। এখন সবাইকে ঐভাবে তৈরী, সে বিধাতার ইচ্ছা ব্যাভীত মানুষের সাধ্য নয়।

কথার মাঝে এক বাধা—পূজারী হন্তদন্ত হয়ে প্রসন্ন বদনে হাতে একখানা জন্ম-পত্রিকার মত কিছু নিয়ে হাজির। যোগির চরণে প্রণামান্তর নিবেদন করলেন কোথাকাব এক বড় যজমান এসেচেন। এখানে যোগজীবন স্বামীজী আছেন শুনেচেন তাই দেখা না করে যাবেন না। তাঁর যা কথা নিজ, মুখেই বলবেন এখন শুধু অল্প সময়ের জন্যই দর্শনপ্রার্থী।

যোগজীবন বললেন;—দেখো, শশী! কাকেও বিমুখ করা উচিত নয়, তুমি বলে দিও এখানে সবার সামনেই কথা কইতে হবে, আর পাঁচজনের সঙ্গে একই মেজেতে বসে কথা কইতে হবে। স্পেশাল ফেভার—

এই পর্যন্ত শুনেই;—যথা আজ্ঞা বলেই আচার্য চলে গেলেন।

যোগি বললেন—এই দেখ, তাল কেটে গেল মনে হচ্ছে; নয়?

তা হোক এর মধ্যেও তাঁর অভিপ্রায় আছে। শুনে অন্নমণি সসংকোচে বললে, তা হলে আমি এখন যাই,—বাধা দিয়ে স্বামীজী বললেন ;—কেন মা. কোন্ দুঃখে ?

উত্তরে কিছু বলবার আগেই পূজারী ও তার পিছনে সংকোচে প্রবেশ করলো সুদর্শন এবং ভদ্র এক যুবা। বেশভূষায় যেন দীন-হীন মনে হয়। একখানি আধ ময়লা ধুতি তার উপর গায়ে একখানি সাদা চাদর মাত্র। পায়ে ধূলিধূসর চটিও ছিল।

এ রকম ভট্চায্যি প্যাটার্ণ সম্ভ্রান্ত ঘরের দুলাল তো আশা করিনি। প্রথমেই এই হলো সাধুর পিলে-চমকানো সম্ভাষণ। মনে হলো, সাধুর কি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি ? এই ভাষা শুনে অন্নমণি বিস্মিত দৃষ্টীতে, শশীকান্ত পূজারী বিপন্ন দৃষ্টিতে, আমিও কতকটা অবাক দৃষ্টিতেই চেয়ে দেখলাম সাধুর দিকে। যিনি এলেন, তাঁর মুখখানি হাঁ হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সাধুবাবার মুখে কোন বৈলক্ষণই দেখা গেল না ; যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন—কেবল শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায়ের মত বুজু বুজু চক্ষে দেখছেন নবাগত যুবার পানে।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বললাম,—বসুন। আমার পাশেই বসলো

সব চুপ চাপ ;—শশীকান্ত বললে, মন্দিরে আমার কাজ আছে, আসি, বলে প্রাণাম করেই চলে গেল।

বেশ সৌম্য মূর্তিটি ; -বলো বাবা তোমার কথা। নিঃসঙ্কোচেই বলো ; সাধু বললেন।

ছেলেটি একবার অন্নুর দিকে চেয়ে দেখলে ; তাই দেখে সাধু বললেন, ওঁর মামলাটাও সঙ্গীণ; কোন চিন্তা নেই তুমি নিঃসঙ্কোচেই বলে যাও।

ছেলেটি আরম্ভ করলে ;—আমার নাম সুধাংশু ভদ্র ; গত ৪৩

সালে আমি বি. এস সি পাশ করে চার বছর শিবপুরে এঞ্জিনীয়ারিং পড়েছিলাম ;—এমনই সময়ে আমার মা মারা গেলেন ; তাইতেই আমার সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল। আমি আর পড়াশুনায় মন বসাতে পারিনি। পিতামাতার একই সন্তান আমি, মায়ের স্নেহেই গড়ে উঠেছি। বাবাও আমায় খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু মায়ের জন্যই আমার এই অবস্থা দেখে বাবা ভাবলেন আমাকে শান্ত করতে হলে বিবাহ দেওয়া দরকার।—আর আর বর্ষিয়সী বাড়ির আপনজন—জেঠাই খুড়ি পিসিরা সবাই একমত হয়ে আমার বিবাহের চেষ্টাই করতে লাগলেন। এক ধনবানের সুন্দরী কন্যা পাত্রী দেখে দিনস্থির পর্যন্ত হয় আর কি। আমার দুঃখটা কেউ বুঝলেনা, আমি বাধ্য হয়েই পালিয়ে গেলাম। বাড়িতে মা নেই, আমি থাকবো কেমন করে, মা আমার বাড়ির সবটাই জুড়ে ছিলেন। বাবাও ভীষণ শোক পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সব কিছু তাঁর কর্মপন্থা গিয়ে পড়েছিল যেমন করেই হোক আমার বিবাহ দেওয়ার কাজে। আমার মধ্যে দারুণ বিতৃষ্ণা, কাজেই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায়ই রইল না। পালিয়ে বাঁচলাম ; আর একখানা পত্রে মনের কথা জানিয়ে গেলাম।

চারটি মাস,—আমি সারা দক্ষিণ ভারতটা ঘুরে বেড়ালাম। প্রায় দেড় মাস কাটিয়েছিলাম কন্যা কুমারীতে। বাবা পত্র দিতেন, টাকা পাঠাতেন, তাঁকে লিখতাম যখনই যেখানে থাকতাম এমন কি শেষে তিনি একথাও লিখলেন যে আমার অমতে তিনি আর কখনও বিবাহের চেষ্টা করবেন না। তখনই আমি ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, ঘরে এক মা এসেছেন। আমার পুরাতন চাকরের মুখে আরও শুনলাম,—যে-মেয়েটি আমার জন্য পছন্দ করেছিলেন তাঁকেই তিনি গৃহলক্ষ্মী করেছেন।

সাধু বললেন,—চমৎকার, তাহলে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলো, বাবার বয়স কত ছিল? আটচল্লিশ—সুন্দর শরীর—দেখবার মতই চেহারা।

এই দেখ সংসারের খেলাটা। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা—

হাঁ, আমি এসেছি শুনেই তিনি আপনি আমায় সস্নেহে ডেকে কথা বললেন,—তোমার কোন কাজেই আর আমি বাধা দেব না। তোমার যেমন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা তুমি থাকবে; তোমার জীবন যে ভাবে ইচ্ছা কর তুমি চালাও, যথাসাধ্য আমার সাহায্য তুমি পাবে। এখন তুমি সম্পূর্ণই স্বাধীন।

সাধু বললেন,—বেশ কথা।—তা এখন আমার কাছে কেন?

আমি সংসার করবো না, এখানে আচার্যকে আমি কোষ্ঠি দেখিয়েছিলাম, তিনি বলেছেন—আমার দুর্দিন কেটে গিয়েছে, এখন শুভ সময় এসেছে। আপনি আমায় উপদেশ দিন; আমি এখন সন্ন্যাসী হতে চাই। শুনে যোগি বললেন;—তা চাওয়া তো ভালই,—এখন তোমার কি যথার্থ বৈরাগ্য জন্মেছে, বলতো বাবা, যে বৈরাগ্যর তেজে সন্ন্যাস নেওয়া যায়? সন্ন্যাস নিলে তুমি কি নিয়ে থাকবে?

কেন, দিবারাত্র ভগবানের নাম করবো। সাধু বললেন,—সন্ন্যাস না নিয়েও তো তা করতে কোন বাধা নেই তোমার। সন্ন্যাসের মুখ্য প্রয়োজনটা কি? সুধাংশু মাথা চুলকাতে লাগলো। তার পর বললে,—তা হলে আমায় আপনি কি করতে বলেন?

হাঁ গা, তুমি কি খোকা? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, যা তোমার ভাল লাগে তাই করবে। এক কাজ করো না, মায়ের একখানা বড় ছবি রেখে খুব দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে সাজাবে, মালা পরাবে, ধূপ-ধুনো দিয়ে পূজা করবে, সামনে বসে ধ্যান করবে, সর্বদাই মাকে ভাববে।

সুধাংশু চুপ করেই রইলো। সে কি ভাবছিল তা জানি না। খানিক পরে সে বললে,—দেখুন, আপনি আমায় এতটা হেয় ভাববেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। স্ত্রীলোক বিধবা হলে যা করে থাকে আপনি আমাকেও সেই ব্যবস্থা দিচ্ছেন। তারা যে সময়ে ঐভাবে নিজ জীবন সার্থক বোধ করতো এখন সে কাল নয়;—তারপর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ চলন নেই, আর এই হেয় দুর্বল সমাজে নারীর উন্নতির সম্ভাবনার সকল পথই বন্ধ ছিল, এখন সে দিন নেই, আপনি কোথায় আমাকে র‍্যাশোনাল ফুটিং একটা যাতে পাই তাই করবেন, তা নয় যা-তা একটি সেন্টিমেণ্ট্যাল,—এ আমি কল্পনাও করিনি,—আমার মাতৃভক্তিতে ব্যঙ্গ করে—এই সব বিধান দিচ্ছেন।

তোমার খুসিমত চাওয়াটা সে তোমার মরজি—কিন্তু গ্রহণ করবার কেপ্যাসিটির কথা ভেবে দেখেছ কি? তোমার অধিকার কতটুকু?

কি করবো তাই বলে দিন?

সেটা যে তোমার নিজেরই করবার।

যদি আমি তা না পারি?

তাহলে আমি বলবো, যে সময়ের যা; যদি ক্রিয়েটিভ এনার্জি কিছু থাকে তো আপনা থেকেই তা বেরোবে। একটা কাজ ধরে যেতে হবে তো, কাল কাটাবে কি নিয়ে? তোমার বাবা এমন এ্যাক্‌টিভ লোক, তুমি এতটা প্যাসিভ, ম্যাদামারা কেন?

দেখুন, অনেক আশা নিয়ে এসেছি;—এমন করে গায়ে জল ঢেলে দেবেন না।

তুমি তো সন্ন্যাসী হতে চাও,—জানো কি তার কোয়ালিফিকেসন?

কি করে জানবো, আমার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব ?

তাহলে ভালো এবং যথার্থ সন্ন্যাসী হতে গেলে যা দরকার আগে তাই কর।

সে বললে ;—বলুন।

ঠিক আমার উপদেশ মতো চলবে তো ?

নিশ্চয় চলবো, না হলে এতটা এসেছি কেন ?

মন দিয়ে শোনো তাহলে আমি প্রথমেই বলবো, এত বৎসর তপস্যা করে যে বিদ্যাটি লাভ কবেছে তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে একটা কাজে লাগাও, হেড্ আর হার্ট এক করে লেগে যাও, তার-পর বিবাহ করো। গার্হস্থ্য ধর্মের ভিতর দিয়েই পথ ;—যথাকালেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

তা হলে সেই বাবার আশ্রয়েই যেতে হবে ?

হলোই বা—তাঁর কাছ থেকে তুমি তো নিষ্কৃতি পাওনি ; তুমি গিয়ে তোমার বাবাব সংসারেই ঢুকবে আর বিবাহ করবে যাকে, সে তাকে "নিজের সংসারই কবে তুলবে। সে সব তোমায় দেখতে হবে না,—বিধাতার সনাতন নিয়মের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এঞ্জিন যেমন ট্রেন টেনে নিয়ে যায় সেই রকমই তোমার শক্তি নিজ গতিতেই নিয়ে পৌঁছে দেবে তোমার লক্ষ্যস্থলে। পরলোকগতা জননীও আশীর্বাদ করবেন।

সুধাংশু বেশ ভিজে গিয়েছে। এখন অনুমণি উঠে দাঁড়ালে, প্রণাম করতে গেল ; যোগি বললেন—আর একটু বোসো মা, এখনও কাজটি শেষ হয়নি।

অনুমণি বসলো, আর প্রশ্নভরা চক্ষে সাধুবাবার দিকেই চেয়ে রইলো। ছেলেটির দিকে চেয়ে সাধু বললেন—তোমার ব্যাপার তো সব শোনালে, এখন এই যে মেয়েটি—এর ব্যাপারটা শোনো। অভিজ্ঞতা বাড়বে, নিজ কর্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করবে। তারপর

আমার দিকে ফিরে বললেন,—ভাই, তুমিই সবটা বলো, তোমার সঙ্গে এদের যোগাযোগ থেকে ;—

এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে, সেই ট্রেনের কথা সব এবং এখানে এসে যা যা ঘটেছিল, আগাগোড়া সব কিছুই,—এমন কি দীক্ষা নিয়ে অনুর সাধন ভজনের অভিপ্রায় পর্যন্ত—সব কিছুই বলতে হোলো। আমার কথা শেষ হলে এখন যোগি বললেন,—আমার একটা কথা রাখবে,—অনুমা!

আজ্ঞা করুন,—অমন করে বলচেন কেন,—

কারণ আছে তাই না বলি—শোনো, তুমি তো ছেলেটির সকল কথা, যা আমি, তুমি, ইনি (আমি) সবাই শুনেচো,—এখন আমার অনুবোধ, এক্ষেত্রে ওঁর কি করা কর্তব্য ওঁর যথার্থ কল্যাণ যাতে হয়,— কথাটা তুমিই বলে দাও।

অনু নিঃসঙ্কোচেই বললে,—আমার মনে যা হয়েছে তা বলতে পারি, উনি কি নেবেন সে কথা ? শুনে সাধু বললেন.—উনি নেবেন কিনা সে কথা নয়. এখন ওঁর কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো সেইটাই আসল কথা।

উনি তো চার বছর ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েচেন বললেন, আর এক বৎসর মাত্র বাকী ; এখন ওঁর কোরসটি কমপ্লিট করাই প্রথম ও প্রধান কাজ। তারপর ভালো পাশ করতে পারলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যাবেই,—তারপর স্বাধীন জীবন,—

সঙ্গে সঙ্গেই সাধু বললেন, চমৎকার,—জয় মা! তারপর ছেলেটিকে বললেন, কেমন বাবা, কথাটা লেগেছে ?

লেগেছে, বলেই মুখখানি নীচু করে রইলো। শেষে বললে—বর্তমানে এর চেয়ে আর ভালো কিছুই হতে পারে না, তাও বুঝি, কিন্তু আমার মনে জোর পাচ্ছিনা, যেন—

সাধু বললেন, সত্য কথাটা এই যে,—মায়ের মৃত্যুতে যে

অন্তরের স্নেহ ও প্রীতির মুখ্য সহযোগটি হারিয়েচ এখন তুমি সেইটির কাঙ্গাল হয়েই ঘুরচো, সেইজন্যই তোমার বিবাহ করাই উচিত।

কিন্তু এখন যদি আমায় কলেজে ঢুকতে হয় তা হলে সময় নষ্ট করা চলবে না, বিবাহের ব্যাপারে তো সময় চাই ; এদিকে সামনেব মাসেই কলেজেব সেসান আরম্ভ,—

বিবাহেব ব্যাপাবে পিতার অনুমতির দবকার হবে কি ?

না,—সে দিকে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ;—হয়তো খুসীই হবেন শুনলে।

তাহলে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। অনু-মা -মা জগদম্বাব ইচ্ছা জেনেই বলচি, তুমি এ ছেলেটির ভাব নাও, এতে উভয়তঃ কল্যাণ। তোমরা দুজন একই ঘাটে এসে উঠেচ নৌকাডুবিব পর।

কতক্ষণ ভেবে অনু বললে,—বাবাকে বলবার ভার আপনাব কিন্তু—

ভালো, তাই হবে। একেই বলে বিধাতার নির্বন্ধ,—এই জন্যই তোমরা এইখানেই এসেছ—আর এ বিধান আমার নয়, ঐ বিধাতারই এটা বিশ্বাস করো।



॥ ১ ॥

নিরবচ্ছিন্ন সুখ কামনা করে সবাই ; কিন্তু সন্ধান জানে না, কি ক'রলে বা কোন্ অবস্থায় তা সুলভ। তাই সাধারণের ধারণা যে মনুষ্যজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভব নয়। কোন ভাগ্যবানের হয়তো কোন বিশেষ একটা অবস্থায় মনের সুখ বা সাম্য একটু দীর্ঘস্থায়ী হ'ল, তারপরই যখন অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে তাকে চঞ্চল ক'রে তুললে, তখনই তার অনুসন্ধানের বিষয় হবে কেমন ক'রে সেই অবস্থা আবার ফিরে আসে, কিন্তু তা আর কখনও আসে না, প্রাকৃত নিয়ম বা বিধির বিধানেই যা আসে তা নূতন, তাকেই মানিয়ে নিয়ে তার মনকে ভরাতে হয়।

কেউ কেউ বলেন, একজন সুখী হ'তে পারে, যদি তার সকল কর্মই ধর্ম-অনুমোদিত হয়। কিন্তু ধর্মবোধ তো সবার সমান নয়, তাই অপরকে সুখী করাই নিজের জীবনে সুখী হবার সব চাইতে সহজ উপায়, এই কথাটি আমাদের বন্ধু ব্যান্‌কট্-রত্নম্ নাইডু বলতেন।

দক্ষিণ ভারতের রেলপথের বিখ্যাত স্টেশন বেজওয়াড়া। শহরটি বড়। আমার বন্ধু ব্যান্‌কট্-রত্নম্ নাইডু ঐ শহরের একজন গণ্যমান্য এবং বরেণ্য ব্যক্তি। বাঙ্গালীর প্রতিভার উপর একটা সহৈতুকী শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। এমন অনেক বড় বড় দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী শিক্ষিত লোকেরই তখনকার দিনে ছিল; হয়তো এখনও আছে। এখন নাইডু একজন ধার্মিক বলেই তাঁর প্রসিদ্ধি, তার উপর ধনবান উচ্চ শিক্ষিত, ঐশ্বর্যশালী এবং বিনয়ী। আবার ভারী সৌখীন এবং

বন্ধুবৎসল। ইস্তাম্বুল থেকে আতর আনিয়েছেন,—বুলগেরিয়ার গোলাপের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ, তাও বন্ধুদের মাখানো চাই। প্রশস্ত ভদ্রাসনের কাছেই ঠাকুরবাড়ী, দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা, পূজা, ভোগরাগ. সাধুসন্তদের সেবা, নিত্যনৈমিত্তিক সকল রকমের ব্যবস্থাই আছে। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গে, সৎবিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা তাঁর জীবনের একটি উচ্চস্তরের বিলাস। এ কথা ওখানকার সবাই জানে। আমরা সাত আটশো মাইল দূরে থাকি, ভিন্ন প্রদেশবাসী হ'লেও আমরাও জানি। তখন আমি ঐ অঞ্চলে ঘুরছিলাম ;—মধ্যে মধ্যে তাঁর আতিথ্য উপভোগ করতাম।

এখন বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে,—আজও তিনি নিঃসন্তান। অনেকেই বলেন, নাইডুর এত সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্য—যদি সাধুদের মধ্যে এমন কাকেও পাওয়া যায়, নিজ দৈব শক্তিতে, তাঁর একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, নাইডুর স্ত্রীর হয়তো সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে কারণ তিনি যাগ-যজ্ঞ স্বস্ত্যয়নে বিশ্বাসী ; অনেক-কিছু করিয়েছেন। কিন্তু নাইডুর মত উচ্চ শিক্ষিত অবিশ্বাসীমনা একজন যথার্থ আধুনিক লোকের ঐ উদ্দেশ্যে সাধুসঙ্গ একেবারেই অসঙ্গত কল্পনা —কারণ বিবাহিত দম্পতির দীর্ঘকাল সন্তান না হওয়ার বৈজ্ঞানিক কৈফিয়ৎ তাঁর ভালরকমই জানা আছে। সে যাই হোক, এখন তিনি এক বিচিত্র পরদেশীয় সাধু নিয়ে পড়েছেন, এমনই সময়ে অতিথিরূপে আমার আবির্ভাব তাঁর সংসারে।

প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন, এক অদ্ভুত সাধুর আবির্ভাব হয়েছে এখানে। ভারী সুন্দর হিন্দী বলেন, উর্দুও বলেন, একজন ইংলিশম্যানের মতই ইংরাজী বলেন, আমাদের মতই টেলেগু আর তামিলও বলেন, যেন তামিল নাড়ুর লোক। অসাধারণ মানুষ ;—কিন্তু কোন্ প্রদেশের মানুষ কেউ জানে না।

উড়ে নয়তো? জিজ্ঞাসা করলাম। অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের সেই, 'সড় অন্ধা'র গল্পটাও বলতে হলো; শুনে খানিক হাসাহাসির পর স্থির হলো পর্বতের উপরে গিয়ে রামায়ৎ সাধুর আশ্রমে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যাবে।

বেজওয়াড়া স্টেশনের পশ্চিম দিকে পর্বতের উপরেই দুর্গা-মন্দির;—নাইডুর সেথা নিত্য যাতায়াত। মা দুর্গার ভক্ত কিনা তা জানিনা, তবে ঐ পুরানো মন্দিরটি সংস্কাবের ভার নিয়েচেন নাইডু গারু। এখন সেই মন্দিরে চলছিল মার্বেল পাথরের কাজ। এখানে যেসব পাথর দেবীর মন্দিরে লাগানো হচ্ছে তার বৈচিত্র্য ইটানিয়ান মার্বেলকে হার মানিয়েছে। বেজওয়াড়া থেকেই মাচারলা লাইন পশ্চিম দিকে গিয়েছে; সেই লাইনে রাণ্টাচিন্তালায় এই পথেরের খনি। ঐখান থেকেই এখানে আসছে পাথরের ফালি লম্বা লম্বা সাইজ, নানা আকারই পাচ্ছে। এইসব প্রত্যহ দেখা-শুনা, বন্ধু-বান্ধাবদের দেখানো, তাদের মাতমত নেওয়া, আবার তাই নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রবল উৎসাহ।

এখন ঐ দুর্গা-মন্দির থেকে খানিটা দক্ষিণে গেলেই রামায়ৎ আশ্রমটি। নাইডু গারুর ঐ নবাগত এবং আমার অপরিচিত সাধুটি ঔখানেই নাকি আসন করেছেন। নাইডু মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে আসেন, কত কথা নিবেদন করেন। নানাভাবেই সাধুকে প্রসন্ন করে তাঁকে কিছু দান গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেন। সাধুর কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই, এই পর্যন্তই তাঁদের সম্বন্ধের কথা।

এইটুকুই জানা হয়ে গেল, আমার পক্ষে তাই ঢের।

পরদিন সকালে একেবারে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে উঠলাম। মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ, এই সকালে, তখন সাড়ে সাতটা, এখন সাধুর

কাছে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। প্রভাতে সাধুদের বিরক্ত করার অধিকার—নেই অবশ্য তাঁর আজ্ঞা থাকলে স্বতন্ত্র কথা। শেষে একটু উঁকি মেরে দেখেই চলে যাব এই মনে করে ঐ সাধুব আশ্রমে গিয়েছি ;—দেখি কেউ নাই ; বোধ হয় বাহিরে কোথাও গিয়েছেন। এইভাবেই প্রথম উদ্যমে নিরাশা হয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাকেই বা বলবে-, অন্তর্যামী জানলেন। একটা ভয়ও ছিল, বিরক্ত হয়ে সাধু এখান থেকে চলে যাননি তো ?

॥ ২ ॥

চলেই এলান আমি। এসে বসলাম স্টেশনে প্লাটফবমের উপর এক বেঞ্চে। সাধু দর্শন হলো না, এখন এই জনস্রোত দেখতেই রইলাম। বিচিত্র এই মানব-সমাজ নানা প্রকৃতির মানুষ তাব মধ্যে এক ধরণের মানুষ যারা গায়ে পড়ে আলাপ করে, মেশে, তারপর বিচ্ছেদ ঘটাতে ও বেশী দেরী হয় না। নিজের কাজ যতই থাক পরর্চ্চার সময়াভাব হয় না। এমনই একজনের সঙ্গে দেখা হওয়া আমাদের যতই অরুচিকর হোক না কেন শেষ অবধি দেখা যায় সে বিধতার ইচ্ছাই পূর্ণ করেছে।

অসংখ্য যাত্রী দেখছিলাম। তারই সঙ্গে এক মূর্তির সঙ্গে দেখাদেখি, খানিক পরিচয়ও ঘটে গেল—লোকটি বাঙ্গালী, পোষাকে আধুনিকতার ছাপ দেখেই বলচি। লম্বা দোহারা শরীর, পরণে ধোপদোস্ত ঢলঢলে পায়জামা, তার উপব ঐ রকমের পাঞ্জাবী, ডান দিকে বোতামের সার, পায়ে নূতন স্যাণ্ডেল, মাথায় গান্ধী ক্যাপ। প্রৌঢ় বয়স হলেও মুখে যৌবনের চপলতা, তার মধ্যে ঘন চুলে প্রায় মাঝ বরাবর সিঁথি, মাথার দুপাশের জুলপির চুল বেশী পাকা। মানানসই পাতলা ভ্রূ, ছোট ছোট চক্ষু তার, তারা দুটি একটু কটা ;—কেমন একটা ছট্‌ফটানি নিয়েই তিনি ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর, আমার সামনাসামনি। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হন্‌হন্ করে কাছে এসেই একগাল হেসে,—বাঙ্গালী! নিশ্চয়? বলে দুই কাঁকালে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে থমকে দাঁড়ালেন;—যেন বিচক্ষণতার প্রতিমূর্তি।

যেই আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি, একেবারেই পাশে এসে বসলেন।

আমার নাম কৈলাসপতি রায়, আজ প্রায় এক উইক এখানে এসেছি, আরও দক্ষিণ দিকেই যাবো, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ইচ্ছে আছে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই আমার পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন আরম্ভ হলো;—কে আমি এখানে কোথায় এসেছি, কোথায় যাবো, কত দিনের জন্য, উদ্দেশ্য কি, কবে এখান থেকে যাবো এবং কোন্ দিকে? আগে কোথা ছিলাম, আগে এসেছিলাম কিনা ইত্যাদি। প্রায় দশ মিনিট কাল প্রশ্ন-উত্তরের ঝড় উড়িয়ে শেষে বললেন,—আপনার কথা তো সবই বললেন, আমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না তো?

বললাম, আগ্রহের অভাব, বুঝতেই তো পারছেন।

ইতিমধ্যেই তিনি জেনেই—নিয়েছিলেন,—আমি এখানে বন্ধুত্বসূত্রে শ্রীমান ব্যন্‌কট রত্নম্ নাইডুর আশ্রয়ে তাঁর অতিথি হয়েই আছি। তিনি এখানকার একজন মহামান্য, বরেণ্য ধনৈশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সবার উপর একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তার উপর ধার্মিক বলে, এখানে যতগুলি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ. তাঁর দানের প্রসিদ্ধিও কম নয়, এসবও তিনি শুনেছিলেন। এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কথাই এনে ফেললেন, বললেন—তাঁর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছে, লোকটা কালচার্ড, বাঙ্গালীর গুণাগ্রহী;—বেশ সৌখীনও বটে;—বাড়ির কাছেই একটা ঠাকুরবাড়ি আছে, না? সাধুসন্ত বৈরাগীদের আড্ডা, লোকটা ভিতরে ভিতরে কি

রকম কে জানে? বাইরে থেকে যেন রিলিজিয়াস মাইণ্ডেড্ মনে হয়, না?

উত্তর দিলাম, হ্যঁা। তার পর জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি সি-আই-ডি অথবা—

ইনসিওরেন্স এজেন্ট। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ও-কাজও করে থাকি। ঠিক ধরেচেন।

তা হলে তো সবই জানেন দেখচি?

তা জানতে হয় বৈকি;—আরও জানি, সেদিন নাইডু একজন সাধুকে অপমান করে তাঁর ঠাকুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে ঠিক অপমান নয়, একটু তাচ্ছিল্য করে যা তা বলেন, তাইতেই তিনি চলে যান, পরে চেষ্টা করেও আর ফেরাতে পরেন নি। আপনি জানেন না এ কথা?

বললাম,—মোটে পরশু রাত্রে আমি এসেছি, তাঁর বসত বাড়িতেই ছিলাম, ঠাকুরবাড়িতে কবে কি হয়েছে জানবো কি করে সব বৃত্তান্ত? তবে তাঁর কাছেই একটু আধটু শুনেচি ঐ সাধুর কথা।

তা হয়তো ঠিক, কিন্তু এ নিয়ে এখানে নানাকথা হয়েছে। —আমি সাতটা দিন আছি তো, দেখলাম শুনলাম অনেক কিছুই; যদিও আমি ঐ সাধু-ফাধু বেটাদের বিশ্বাস করি না, বরং ঘৃনাই করি ঐ সব অকর্মণ্য ভণ্ড তপস্বীদের।

এতক্ষণ আমার অসহ্য হয়ে এসেছিল এই লোকটির সঙ্গ। এবার আর কোন কথা না বলে একেবারেই উঠে পড়লাম, বেশ জোরেই পা চালিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছি। ফিরে দেখি লোকটিও আসচে, মতলবটা বুঝতে একটু দাঁড়িয়েচি;—কাছে এসে একটু অপ্রতিভের মত হেসে বললেন,—বিরক্ত হয়েছেন হয়তো, কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি; সে সাধুকে আমিও, দেখেচি, পাগলাটে—

ভিখারী ক্লাসের মনে হয় বাঙ্গালী। দুর্গামন্দিরের কাছে রামানন্দীদের একটা আশ্রম আছে, সেইখানেই থাকে ; সত্য মিথ্যা একবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেই আসুন না।

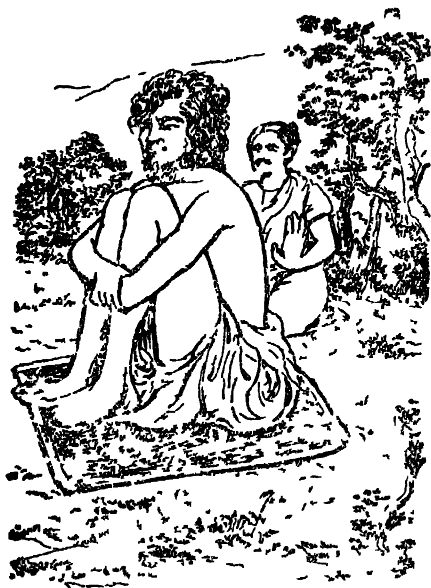
আর কথাটি না বলে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে বোধ হয় সাধুকে পাওয়া যাবে ভেবেই যথার্থ বলতে কি মনের অগোচরেই কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়ের উপর দুর্গামন্দিরের কাছে সাধুর দ্বারে পৌঁছে দিলে।

সামনেই বসে এক মূর্তি,—নিম্ন দৃষ্টি তাঁর। এ আশ্রম আমার জানা, আগে অনেকবার এসেছি। এখন সোজা এসেই প্রবেশ করলাম।

এখন নির্জন। সামনেই বেশ লম্বা চওড়া চতুষ্কোণ বেদী বা চৌতাবা। তারই এক ধারে বসে আছেন সাধু, একখানা চেটাইয়ের উপর। কতকগুলি তালপাতার চেটাই এক দিকে রাখা আছে, একখানা টেনে নিয়ে বসলেই হ'ল। দুই হাতে, খাড়া-মোড়া হাঁটু জড়িয়ে বসে আছেন তিনি। অদ্ভুত মূর্তি একটি। শ্রীহীন বিবর্ণ এক-খানা বস্ত্রমাত্র কটিদেশে জড়ানো, শরীরের উর্ধ্বাংশ নগ্ন ; দেখলেই মনে হয় পেটভুখা, সাধারণ গাঁজাখোর পথে ঘাটে যাদের হামেসাই দেখা যায় তাদেরই একজন ;—লম্বা শরীর, ধূলায় ধূসরিত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ ; কোন চিহ্ন বা সাধু-সম্প্রদায়ের ভেক নেই। জানবার যো নেই মানুষটি সাধু সজ্জন অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক পথের পাগল একজন। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, বহুকাল তৈলহীন, ধূলায় প্রায় কটা, সামান্য একটু ছাগল দাড়ি কিন্তু গোঁফজোড়া বেশ ঘন, এ এক অদ্ভুত মূর্তি। বোধ হয় কিম্ভূতকিমাকার এই মূর্তি দেখেই নাইডু গারু প্রশ্ন করে থাকবেন।

গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—কোন্ দেশের মানুষ, কি সম্প্রদায় এই সব ভাবছি ;—একবার মাত্র ঝটতি নিম্ন দৃষ্টি তুলে আমার মুখের উপর

ফেললে ;—তাঁর ঐ চাহনীতেই চমকে দিলেন আমাকে,—অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। বললেন,—সাধু দেখতে এসেছ তো দাঁড়িয়ে কেন ? তখনই প্রণাম করে বসলাম,—এতক্ষণে মনটা শান্ত হলো।



সাধু অনেক তো দেখেছি— ভেক-ধারী, প্রচ্ছন্ন, যোগি, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী বাউল সহজিয়া, হিন্দু মুসলমান, —কত কতরকম সাধুই আছেন এই ভারতে। বসে বসে মনের ভাবে ভাব মিলিয়ে দেখচি, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ কোন সাধুরই মিল নাই।

নির্বাক, বিস্ময়াবিষ্ট, চেয়ে দেখছি মানুষটির দিকে, বয়সটা কত, ধরাই মুস্কিল। রোগা একহারা শরীর, মুখের ভাবে একটা সরল গ্রাম্য রূঢ়তা। মাথার চুলের মধ্যে একবার আঙ্গুল চালিয়ে আর একবার আমায় দেখলেন তাঁর চক্ষু দুটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঘন ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল রক্তাভ নেত্র, জলভরা, টলটল করচে, মধ্যে বড় বড় কালো তারা,—ঐ চক্ষু দুটি ছাড়া এ মূর্তির মধ্যে আকৃষ্ট হবার কিছুই নেই। নিম্ন দৃষ্টিটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য কথা কইছেন নিম্নদৃষ্টি ঠিকই আছে।

এখন যেন্ আপন মনেই বলছেন ;—দক্ষিণের লোক, এঁদের সাধু চেনার লক্ষণ হল ভেক্, আর সম্প্রদায় ছাড়া সাধু হবে না ;

সাধু হলেই তার দণ্ড চাই, ত্রিশূল চাই, কমণ্ডলু চাই, গৈরিক পীতাম্বর, রক্তাম্বর, শ্বেতাম্বরে ভূষিত হওয়া চাই, ফোঁটা তিলক রুদ্রাক্ষ মাথায় জটাভার না হয় মুণ্ডিত তুণ্ড,—এ সব না হলে সাধুই হল না। এই পর্যন্ত বলে চুপচাপ, কতক্ষণ আর কথাই নেই। আবার বলছেন;—সেদিন ঠাকুরবাড়িতে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যাইনি। সেদিন অনেকটা দূর পথ হেঁটে পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হয়েই ফটকের ধারে নিমগাছটার ছাওয়ায় বসেছিলাম। এমন সময় ভাগ্যবান এলেন; পিছনে দুই তিন জন সহচরও ছিল। প্রথমে আমিই ছিলাম, নজরে পড়লাম;—অদ্ভুত এই মূর্তি দেখেই প্রশ্ন,—এই, আপ্ কৌন্ সম্প্রদায়কা সাধু? বললাম,—কোই সম্প্রদায়কা খাতেমে অব্ তক্ তো নাম লিখায়া নহি। এ্যায়সাই ঘুমতা ফিরতা। ব্যাস্—শুনেই 'কর্তা বলে ফেললেন,—তব্ তো সাধুই নহি, হিঁয়া কাহে? এইমাত্র কথা। তাঁর কথার ভিতর দিয়ে একটা প্রবল তাড়িত শক্তি যেন আমাকে তখনই উঠিয়ে দিলে সেখান থেকে।

তারপর চুপচাপ। খানিক পরে আবার বলছেন, আপন মনেই চলে আসছিলাম। বাবুর সঙ্গী একজন তাঁর কানের কাছে কি বললেন;—সুবুদ্ধি বাবু তখনি ফিরে এসে আমাকে ফিরতে এবং যেখানে খুশি বসতে বললেন। আমার আর ওখানে যেতে প্রবৃত্তি হল না; সোজা এইখানেই এসে গেলাম,—ব্যাস শান্তি। কিন্তু বাবুর দৃষ্টিটা ঠিকই আছে। প্রত্যহ দুর্গামন্দিরে আসেন, দর্শনের পর এখানেও আসেন, প্রায় এই সময়টায়;—একটু বসেন, প্রশ্ন করেন, তুষ্ট করতে আমায় তাঁর আস্তানায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি, অনেক উপরোধ অনুরোধ করেন, অনেক মিষ্ট কথাই বলেন;—আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশও দেন যথা,—সাধুদের রাগ বা অভিমান ভাল নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, বাবুটি একেবারেই সোজা মানুষ;—আর হিন্দী

চমৎকার বলতে পারেন। দক্ষিণ দেশের লোককে এত সুন্দর হিন্দী বলতে শুনি নি।

ঠিক যেটুকু জানতে আসা, বিনা প্রশ্নে চমৎকার জানা হয়ে গেল! ইনি কি অন্তর্যামী! এ কথাটিও একবার চিত্তের মধ্যে উঠলো;—আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কওয়ার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দরকারের বেশী সাধু আর একটিও কথা কইলেন না।

আমার মধ্যে চিন্তার প্রবাহ। এখানে আর আমার কোনো কাজই নেই;—সাধুর পরিচয় পাওয়া ছাড়া। আমার পক্ষে, এঁকে প্রশ্ন করে পরিচয় বার করা নিতান্তই অসঙ্গত, অশোভন এবং ধৃষ্টতা। বিশেষতঃ ইনি এমনই ভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, কারো পক্ষে তাঁর উপরে পড়ে অযাচিতভাবে ঘনিষ্ঠতা করা অসম্ভব। তাঁব কথা কওয়ার মধ্যে লক্ষ্যের বিষয় হল, অতি মধুব কণ্ঠস্বর;—অথচ বাইরেটা পাগলের মত মলিন যেন অস্পৃশ্যই করে রেখেছেন নিজেকে। তা ছাড়া এটিও জানতাম এ যুগে পরমহংসদেবের তিরোধানের পর থেকেই এমনই এক শ্রেণীর বৈরাগ্যবান দেখা গিয়াছে যাঁদের মধ্যে গতানুগতিক ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অথবা ধর্মের কোন চিহ্ন এমন কি গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা, তিলকাদি ব্যবহার উপেক্ষিত এবং অর্থহীন। এটি অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী সাধু সম্প্রদায়ের কথাও বটে।

তারপর আমার দিকেও একটু কথা আছে।

যখনই আমি নূতন অপরিচিত সাধুর সঙ্গে মিলবার সুযোগ পাই; সাধুর প্রকৃতি বুঝতে, তাঁর মূর্তি দেখে যা কিছু ভাব মনে আসে, তা বুঝতে খানিকক্ষণ যায়, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে কথা কইতে পারি না। এখন—এঁর সঙ্গ আমার কাম্য কিনা সেইটিই হ'ল কথা। সকল সাধুসঙ্গই যে প্রীতিকর হবে এমন কথা

তো নেই। অনেক জায়গায় ভাব প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, ভাবে গদগদ হয়ে, এক সাধুব বাহ্য সৌম্য মূর্তি দেখেয় এগিয়ে মিলতে গিয়েচি, ফলে এমন হয়েছে মিলন তো হলই না উপরন্তু অনুশোচনা নিয়ে ফিরতে হয়েচে। সে যাই হোক, এখন সরল প্রাণেই আপন অকপটতার পরিচয় দিয়ে, আমার উদ্দেশ্য বুঝে এবং কৌতুহল মিটিয়ে প্রথমেই ইনি যে আমায় গ্রহণ করেছেন, তাইতেই আমায় আকৃষ্ট করেচে অর্থাৎ অন্তরে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি, এতে আর সন্দেহ মাত্র নেই। এখন এই গম্ভীরাত্মার কাছে আমার কোন কথাই যোগাচ্চে না অথচ ইনি আর কথাই কন না। আমি কি করবো, এইভাবে যখন সংশয় দোলায় দোল খাচ্চি;—দেখি,—সামনেই, এই আশ্রমের প্রবেশ-পথে শ্রীযুত ব্যান্‌কট্‌ রত্নম্ নাইডু গারু প্রবেশ করচেন। উজ্জ্বল, অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি তাঁর ঐ সাধুর উপর,—পিছনে পিছনে আসছে স্টেশনের নেই কৈলাসপতি রায়, আনুগত এক ভক্তের মতই এখন তাঁর ভাবটি।

হাওয়াটা যেন বদলে গেল, গুমোট কেটে গেল এখানকার।

॥ ৩ ॥

আমাকে এখানে সাধুর সঙ্গে দেখে, বোধ হয় নাইডু গারু ধরে নিলেন আমরা পূর্ব-পরিচিত। তাঁর কি মনে হল ঠিক জানি না, বললেন, মিঃ চ্যাটারজি! একটা আহন্মকের মত কাজ আমি করে ফেলেচি, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম।

দক্ষিণ দেশে এলে আমাদের ইংরাজিতেই কথার আদানপ্রদান চলে। এখানেও ইংরাজীতেই হলো। বললাম,—শুনেছি কিছু কিছু,—কিন্তু আপনার এতে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, যেহেতু কোন অন্যায় অথবা অস্বসাভাবিক কিছুই ঘটে নি। নিন, আসুন, এখন এখানে যখন একজনকে পাওয়া গিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা যাক।

শুনে—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এই জন্যেই তো এখানে আসা ;—এই বলে নাইডু একখানা চেটাইয়ে বসলেন, কৈলাসপতি সসম্ভ্রমে আগেই পেতে দিয়েছিলেন। এখন নাইডু বললেন, আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েছি, এঁকে কি বলে সম্বোধন করবো ভেবে পাই না ; - কোন সম্প্রদায়ের চিহ্নই নেই এর মধ্যে, চেহারা দেখেও বোঝবার যো নাই কিছু। শুনে আমি বললাম,—

এতে মুস্কিলটাই বা কি, সাধুজী বলতে পারেন, স্বামীজী বলতে পারেন, মহাত্মাজী ও বলতে পারেন।

এতক্ষণ পরে সাধু সুন্দর ইংরাজীতেই বললেন,—ওটা গান্ধীজীর নিজস্ব, মহাত্মাজী বলতে একমাত্র তাকেই বুঝি আমরা।

সাধুর মুখে ইংরাজীতে কথা শুনে এবং সুন্দর সহজ শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিব্যক্তিতে নাইডু গারু মুগ্ধ হলেন—বললেন, তিনি তো মহাত্মা সত্যই, তবে পলিটিক্যাল ফিল্ডে।

এর পর কেউ আর কোন কথাই কইলেন না, কেমন যেন খাপছাড়া কথাবার্তা। এবার কৈলাসপতি বাবু দম্ভভরে এগিয়ে এসে, যেন নাইডু গারুর সমপদস্থ ব্যাক্তি এমন ভাবেই নাইডুকে লক্ষ্য করে ইংরাজীতে বললেন — আমি কিন্তু ভগবান বা ভক্তি ধর্ম্ম, এ সব বুঝি না ; একজনের জীবনে তার ধর্মই হল আসল, একথা আমাদের বুদ্ধদেবই বলে গিয়েছিলেন। নিরন্তর অভাবগ্রস্ত, পুরুষার্থহীন, অলস প্রকৃতির মানুষ যারা তারাই ধর্ম ধর্ম করে ভগবানের ভক্ত সেজে সমাজকে এক্সপ্লয়েট করচে, সংসারীদের দোহন করছে বহু কাল থেকে। আমার সাফ কথা, বলতে ভয় পাই না।

এই বলে রায় মশাই এখন জোর করেই নিজ যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন।

নাইডু বললেন,—ওসব মার্কসবাদ এখানে চলবে না,—যদিও

আমি স্বীকার করছি হয়তো কেউ কেউ ঐ ভাবের মানুষ থাকতে পরে ধর্ম-সমাজে। কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করে যাঁরা সব কিছু ছেড়েছেন সেই দৃষ্টান্তও বিরল নয় এ দেশে, তাঁদের পুরুষার্থহীন বলবেন কি করে?

কৈলাসপতি তবুও বললেন,—আসলে একটা অর্থকরী বৃত্তি ছেড়ে আর একটি অর্থকরী বৃত্তি ধরা,- ধন সংগ্রহের ফিকিরটা তার ঠিকই আছে। ধন ছাড়া কারো গতি আছে কি, বুঝে দেখুন না।

কথাটি শুনেই সাধু একটু হেসে, যেন আপন মনেই বলছেন,— সাবাস। সাব কথা বলেছেন বাবু, খাঁটি জিনিসটাই ধরে ফেলেছেন একেবারে।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে গলার স্বর চড়িয়ে কৈলাসবাবু বললেন ; —পরিহাস করছেন, আমি প্রমাণ করে দেবো, উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দোয়ার্কা আর পূর্বে আসামের পরশুরাম তীর্থ পর্যন্ত যেখানে যত তীর্থ, ধর্মস্থান আছে, তাইতে যত সাধু আছে সবাই হা পয়সা হা পয়সা করছে ;- পয়সা উপার্জনের ফিকিরেই দিন কাটাচ্ছে।

রায় মশাইয়ের এতটা উৎসাহ দেখে সাধু যেন চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তিনি সোজা হয়ে আসনে বসলেন, আকাশের দিকেই দৃষ্টি,—আর নিম্নদৃষ্টি নেই। তার পর কৈলাসপতি রায়মশাইয়ের চোখের উপর এমনই একটি দৃষ্টি হানলেন যার ফলে অমন উৎসাহদীপ্ত মুখখানি তাঁর নিষ্প্রভ হয়ে গেল, কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

সবাই চুপচাপ! কি যে হলো, কেউ কিছুই বুঝল না ; কিছু ক্ষণের জন্য সব ঠাণ্ডা, কারো মুখে কথা নেই।

নাইডু গারুও সবার মুখের দিকে এক একবার দৃষ্টিপাত করে

কিছু না বুঝতে পেরে চুপ করেই ছিলেন ;—এইবার—সুযোগটি তিনি চমৎকারভাবে ব্যবহার করে ফেললেন। দুই হাত জোড় করে, বিনয়পূর্ণ কোমল কণ্ঠে বললেন,—একটি কথা আমি কোনরকমেই মীংমাসা করে উঠতে পারিনি স্বামীজী—কথাটা আমার নিজেরই, ধন আর ভগবান এর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা যথার্থ বড়ো।

সাধু বললেন,—কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট এ কথায় কাজ কি, আপনার প্রাণ যেটি চায় সেইটিই বড়ো বা সত্য জেনে তাকেই কষে ধরে থাকুন না।

তা তো পারি না,—ভেবে দেখেছি, ভগবান তো শুধু মনের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু ধনের অস্তিত্ব বাস্তব, প্রত্যক্ষ, এতটা শক্তিশালী বস্তু জগতে আর আছে কি? ভগবান না ভাবলেও দিন চলে কিন্তু অর্থ না থাকলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আবার একটা যেন স্তম্ভিত ভাব এসে গেল। নাইডু গারুর এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে তখন সাধু স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ আকাশ-পানে চেয়ে রইলেন, ঠিক যেন ঐখানেই উত্তর দেখে নিচ্ছেন। নাইডু গারু কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না, একটু অস্থিরভাবেই বললেন, আজ যখন ধরা দিয়েছে তখন চক্ষুলজ্জার বালাই রাখব না; নির্লজ্জভাবেই সব কথা প্রকাশ করবো—প্রভু! আমার দুইই চাই;—ধনও চাই, ভগবানও চাই। কোনটা ছাড়তে রাজি নই। এই আমার চরম নিবেদন।

সাধু মাত্র একটি শব্দ প্রকাশ করলেন,—চমৎকার!

নাইডু আবার বললেন—ভিতরের কথাই বলছি,—যখন ধন উপার্জনের পিছনে কাজ করি তখন দেখেছি, নিরুদ্বেগে একটি দিন ও কাটাতে পারি না, মনে হয় আমার আসল কিছুই হলো

না, আবার যখন আসল কাজ বলে জপ-ধ্যান করতে যাই, কিছুতেই দীর্ঘ কাল মন রাখতেই পারি না, চিন্তার ভিতর দিয়ে ঠিক বিষয়ের এবং ভোগের মর্মস্থলেই এসে পড়ি,—এর কি উপায় বলতে পারেন ?

সাধুর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—এ প্রফুল্লতা স্বর্গীয়। বললেন,—আপনি মহৎ,—অকপট না হলে শুধু ধনাধিকারীর এ বুদ্ধি হয় না। কিন্তু—প্রাণ তো একটা, দুটো সামলাবেন কি করে ? দু নৌকোয় পা ?—আবার যেখানে দুটো, সেইখানেই ঠোকাঠুকি, এড়াবেন কি করে ?

নাইডু বললেন,—সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু মানুষের বেলা কেন এটা হবে ?

স্বভাবের নিয়মে হবে। রাজার দুই রাণী—শুয়ো আর দুয়ো। দুই নিয়েই ঘর করতে হয়। দুইয়েরই আকর্ষণ আছে, ঠোকাঠুকি হবে না ? জীবন্ত শক্তি যে। রাজার টান সুয়োরাণীর উপরেই বেশী। ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ বিলাস, সকল আনন্দই সুয়োরাণী,—তার উপরেই দম বেশী, ঈশ্বর তো আপনার দুয়োরাণী, তাকে দেখা, তাকে নিয়ে ইচ্ছামত ব্যবহার চলে কি ?

নাইডুর শরীরটা আর দুলছে না—একেবারেই স্থির। সাধু বলছেন,—আমাদের দেশে এক বড় ভাগ্যবান, শক্তিশালী, প্রবল বিষয়ী ছিলেন, লালাবাবু নাম; তাঁরও ঐ দুইই চাই;—বিষয়-ভোগটাই প্রবল অবশ্য। এইভাবে অর্ধেক জীবনই কেটে গেল,—দুই নিয়ে ঠোকাঠুকি, শান্তি পাচ্ছিলেন না,—তারপর যথাকালে ঘটে গেল এমনি গোলযোগ,—তখন তিনি নির্ঘাৎ বুঝলেন, এই ভাবে দুই নিয়ে থাকলে কোনটাই পাওয়া যাবে না। তখনই বিষয়ে অরুচি ধরল, জীবন দেবতার উপর লক্ষ্য স্থির হল;—তাইতেই

ঝাঁপ ; ফলে সর্বার্থসিদ্ধি, ইষ্টলাভ যাকে বলে তা-ই ঘটে গেল,—সময় হলে আপনিও ঠিক বুঝবেন।

আর প্রশ্ন নেই, নাইডু গারু একেবারেই স্থির। চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, জামার হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেললেন,—তারপর বললেন,—আজ আমার মহাভাগ্য, আপনার কাছে বসে যেন সবকিছুই পেয়ে গেলাম ;—প্রাণ ঠাণ্ডা হল, মনে দ্বন্দ্ব নেই আর। কিন্তু এখান থেকে যেই যাবো—পূর্ববৎ ;—সার্থক মনে করে বিষয়ের উপাসনাই করবো।

সাধু বললেন,—বাবা, ওটাও তো মিথ্যা নয়, জগৎ-সংসারে ধনই তো আসল। এখানে কি বিশাল কর্মপ্রবাহ চলছে ঐ ধন নিয়ে, কত কত মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত ঐ ধনের অধিকার সর্বত্রই প্রবল। যখন তাঁর কৃপায় ঐ বস্তুর অধিকারী হয়েছেন তখন এর পরিচয়টি ভাল করে নিয়েই নিন না ; এ থেকে যতটা হয় করে নেওয়াই ভাল। তা ছাড়া আপনার এই জীবনে কর্মপ্রবৃত্তির মূলে তাঁরও যে একটা অভিপ্রায় রয়েছে সেটি দেখছেন না কেন ?

কথাটি এতই হৃদয়গ্রাহী, নাইডু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু,—এই কথাটা শুনেই কৈলাসপতি কট্‌মট্ দৃষ্টিতে একবার সাধুর দিকে দেখলেন,—তখন সাধুর দৃষ্টি নীচে জমির উপরেই ছিল তাই তিনি ওটা দেখতেই পেলেন না। কৈলাসের রোষকষায়িত নেত্রের দৃষ্টিটা বৃথাই গেল। নাইডু গারু একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন,—বললেন, যদি ভণ্ড মনে না করেন তা হলে সাহস করে একটি কথা বলতে পারি কি ?

সাধু বললেন—ভণ্ড আমরা অল্পবিস্তর সবাই, ঐ বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন,—তিনি আমাদের কাজে কতই না অসঙ্গত দেখছেন।

চিন্তিত মনে নাইডু বললেন—যখনই আপনাদের মত ত্যাগী মহাত্মাদের সঙ্গ পাই, তখনই মনে হয় যে পরমেশ্বরের উপাসনাই সবার বড়ো, সব ছেড়ে তা-ই করি। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণভাবে মনটা রাখতেই পারি না; অর্থকরী বিষয়টাই টানে। তখন এটাও বুঝতে পারি সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় কোন একটা বস্তু ধরা বা ছাড়া কখনও স্থায়ী সুখের বিষয় হয় না। তখনই ভাবি পরমেশ্বর সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শুনে আগে কিছু সঞ্চয় না করে ওদিকে এগোনো যাবে না।

সাধু হেসে বললেন—এই তো ঠিক বিজনেস্‌ম্যানের মতই কথা, এই তো চাই।

নাইডুর মুখে একটু অপ্রতিভের হাসি। বললেন,—কথাটা হয়তো আমার ঠিক বলাই হয় নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম সম্বন্ধটি আগে ঠিক করতে পারলেই উপায় ঠিক পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁকে যে আমার চাই-ই।

এ চাওয়া আপনার কি রকম জানেন,—যেমন একজন মহারাজা বা রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া বা তাঁকে পাওয়া, আসলে আপনার বিলাসের একটা উপাদান হিসেবেই চাওয়া বা পাওয়ার কথা। কিন্তু আসলে বস্তুটি আপনার ধারণার বাইরে অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব।

তা হলে তো মুস্কিল,—আমরা কি তাঁর সম্বন্ধে কিছুটাও জানতে পারবো না? আচ্ছা, এই যে দুর্গা, কালী, অথবা রামসীতা, হরপার্বতী, কিম্বা রাধাকৃষ্ণ মূর্তি পূজা করি, তাও তো ঈশ্বর-পূজা?

যদি তা-ই ঈশ্বরপূজা বলে ধারণা হয়ে থাকে, তবে আবার আলাদা ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন কেন, তাইতেই ডুবে যান না। তাতেও লাভ কম নয়।

হাত জোড় করে নাইডু বললেন,—প্রভু! আমরা জ্ঞানবৃক্ষের

ফলও যে খেয়েছি খানিকটা। কখন কখন মা জগদম্বা বলে বেশ শান্তি পাই ঐ মন্দিরে গিয়ে; আবার কখনও মনে হয় মায়ের উপরে বাবাও একজন আছেন, তত্ত্বের দিক থেকে হয়তো তা ঠিক জানা হচ্ছে না, ফাঁক পড়ে যাচ্ছে;—মনে হয় অনেক কিছু জানবার আছে এ সম্বন্ধে। পুরাণ পাঠ করে একরকম বুঝি,—তারপর উপনিষৎ বেদান্ত পড়ে মাথা একেবারেই গুলিয়ে যায়।

কি মনে হয়?

মনে হয় যে সেটি এমনই এক পদার্থ যে আমাদের মত মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও ধরা সাধ্য নয়।

এই তো ঠিক, ঐখান থেকেই তো আরম্ভ। কেবল পরমাত্মা, পরমেশ্বর, আর পরমব্রহ্ম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শব্দের এই ধোঁকাগুলি এক করে ফেলতে হবে,—তারপর তাঁর সঙ্গে সত্য সম্বন্ধটা যে কি তাই জানবার সরল পথ পাওয়া যাবে।

ক্ষমা করবেন, আবার বলছি একটু কষ্ট করে বলুন না আমার মত আকাট বোকার বুদ্ধিতে ধরবার মত করে। তাঁর সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধটি কি রকম?

আপনারা ইনটেলেক্চুয়াল, যুক্তিটাই বোঝেন, আর তাই ধরেই চলেন একরকম করে। বলতেই যদি হয়, সে বস্তুটি এমনই যে এখানকার ভাব দিয়ে বুঝানো যায় এমন কোন সম্বন্ধই নেই তাঁর সঙ্গে।

শুনেই বিষণ্ণ মুখ;—ভিতর থেকে নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘশ্বাস প'ড়লো নাইডুর, বললেন, সেটি কি রকম সম্বন্ধ একটু বলুন না, অন্ততঃ কাছাকাছি কিছু, একটু আভাষও যদি পাই

সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ আত্মিক অর্থাৎ আত্মার সঙ্গেই, তা ছাড়া শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি এখানকার কোন ব্যবহারিক শব্দ দিয়ে বুঝানো যাবে না। অথচ এখানকার কোন সম্বন্ধের উদাহরণ না

দিলে আপনিও বুঝতে পারবেন না ;—তখন আমায় বাধ্য হয়েই এর নিদান, এখানকার চরম সম্পর্কের কথাই বলতে হবে ;—তার সঙ্গে মাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ।

আরও একটু বিশদ করে বলুন, প্রভু।

তিনি প্রেমময়! প্রেম ছাড়া আর কোন শব্দই নেই যা ঐ বস্তুর সম্পর্কে লাগানো যায়।

শুধু প্রেমময়?—কোনো পণ্ডিত ব্যাক্তি তো বলেন তিনি শক্তিময়ও বটেন।

যে পণ্ডিত ও কথা বলেন, তাঁর মাথায় তখন শক্তি নিয়ে প্রবল আলোড়ন চলছিল, শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের প্রবৃত্তিটাই প্রবল হয়েছিল, না হলে শক্তির মূলেই ঐটি, তাঁর না জানবার কথা নয়। আসলে তিনিই প্রেমময়। মানুষের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সেই প্রেম, আপনার মধ্যেও তার অভাব নেই ;—তবে যতক্ষণ ঐ প্রেম বিষয়-ভোগ অথবা দান যজ্ঞাদি সৎকর্মের উপর রয়েছে ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা অবাস্তর।

এক এক সময় তো আন্তরিকই চাই মনে হয়।

এক এক সময়ের কথা নয় ;—আপনার সকল সময়টাই যখন ঐ আন্তরিক চাওয়াতেই ভরে যাবে তখনই ঠিক জানা বা পাওয়ার কথা। সে ছটফটানির বর্ণনা নেই—একমাত্র তার দৃষ্টান্ত এই যে আসন্ন প্রসবার বেদনার মত।

আচ্ছা, তিনি তো সবকিছুই যা যা আমাদের মনে উঠেছে—জানতে পারছেন—

অনুভব করছেন, হাঁ, তাইতো সবকিছু ছেড়ে যতক্ষণ না তাকেই ধরতে চাইছেন ততক্ষণ পাবার কথাই উঠছে না—একমাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ কিনা।

প্রেমের সম্বন্ধটা—নাইডু ঠিক বুঝতে পারছেন না, বিশেষ

চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রেম তো স্ত্রী-পুরুষের যৌবনঘটিত ব্যাপার।

নাইডুর উদ্বিগ্ন ভাবটি লক্ষ্য করে বললেন,—আচ্ছা নাইডু গারু,—যদি দেখেন আপনার শয্যায় বসে আপনার স্ত্রী একজন সুন্দর যুবা পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করছে,—সহ্য করতে পারবেন? ওটা অবশ্য উল্‌টো করেও বলা চলে—যথা, আপনার সাধ্বী স্ত্রী যদি দেখেন তাঁরই রচিত শয্যায় আপনি এক যুবতী-রূপবতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত, তাঁর নিজস্ব অধিকারে অপর একজন ভাগ বসাচ্ছেন—তিনি কি সহ্য করতে পারবেন? মোদ্দা কথা এই যে, প্রেমের সম্পর্কে ভাগীদারের স্থান নেই। যতক্ষণ ধন, মান ভোগ, ঐশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে রয়েছেন ভগবৎ প্রেমের টান বুঝবেন কি করে?

এবার নাইডুর সকল চাঞ্চল্য স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্থির নিশ্চল হয়েই রইলেন, আমরাও ঐ ভাবেই আছি। কতক্ষণ পর যেন নাইডু আবার একটা কিছু বলবো বলবো করছেন, সাধু বললেন, 'বেশী আর না, এখন স্বকর্মে লেগে যান, আজ অনেক কথা হয়ে গেল।

শুনে নাইডু বিষণ্ণ বদনে বললেন, বেশ ছিলাম এখানে, স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছেন, কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন প্রভু!

সাধু বললেন,—যেটুকু হল, তাইতো ভাল নিজ স্থানে গিয়ে ভাবনা করুন, আবার দেখা যাবে। অতএব, ভদ্র নাইডু গারু নমস্কারান্তে আর কোন কথা না বলে উঠে গেলেন।

॥ ৪ ॥

কৈলাসপতি বসে রইলেন দেখে সাধু বললেন, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন, আপনার আবার কি ভাব?

না, আমি থকবো, কথা আছে; বলে এদিক ওদিক দেখে

নিয়ে আবার বললেন,—হ্যাঁ, দেখুন. ভগবানের নামে ধর্ম, গুরুদীক্ষা জপ্‌তপ্‌, এসব আফিং এর নেশা, বহুকাল থেকেই সব দেশেই, বিশেষ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে একস্‌প্লয়েট্‌ করে এসেছে; সন্ন্যাসী, সাধু এদের আসল লক্ষ্য হল টাকা; নাইডু গারুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অপনি ঝোপ বুঝে বেশ কোপটি লাগিছেন; তাঁকে ধন-সঞ্চয়ে লেগে থাকতে উপদেশ দিলেন, বুঝলাম, বেশ কিছু থোক্‌থাক্‌ মেরে সরে পড়বেন। আমায় ভোলাতে পারবেন না, আপনার বুজরুগি আমি আগেই বুঝেছি। ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে উঠে অসবার মধ্যে এত মতলব আছে তা তো জানা ছিল না। বড় চালটাই চেলেছেন।

তা হলে আমার আর নিষ্কৃতি নেই দেখছি—ধরা পড়ে গিয়েছি তোমার কাছে?

নিশ্চয়ই গিয়েছেন, আচ্ছা বলুন তো,—ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে ঐ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কি কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত জানা ছিল না, সৎ ভদ্রভাবের দৃষ্টান্ত।

প্রেমের কথা বোঝাতে ওর চেয়ে বড়ো বা ভালো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত আর কি হবে, আমি তো জানি না। প্রেমের চেয়ে আর বড় বিজ্ঞানই বা কি আছে এ জগতে? আঁরে বাবা! আমরা সেকালের মুখ্যু সুখ্যু লোক ঐ রকমই বলে থাকি; তোমার মত মারক্‌স্‌ কিম্বা ফ্রয়েডের শিক্ষাদীক্ষা হজম করতে পারলেও বা কথা ছিল, তা যখন হয়নি তখন, যাকগে ও কথা।—একটু হেসে তারপর বলচেন; জানো তো আমরা বড়লোক দেখে তাদের মাথায় হাত বুলোতেই আসি; তা তুমিও তো সম্প্রতি ধনবান হয়েছো, দাও না কিছু আমায়;—যাবার বেলা না হয় তোমার মাথাতেই হাত বুলিয়ে যাই।

আমি ধনবান! কি প্রলাপ বকছেন?

তাই তো বলছি, কলকাতা থেকে আসাবার সময় প্রায় সত্তরের কোটায় হাজারের অধিকরী হয়ে আসোনি কি? মোকদ্দমা মামলা চুকে গেলে তখন ভাল মানুষের মত দেশে ফিববে এই তো মতলব?

ঠিক মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল কৈলাসপতির অমন উজ্জল মুখখানি, কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সামলে নিলেন অবস্থাটা। তারপর সতেজেই বলতে লাগলেন,—পাগল সেজে এখানে ওসব দমবাজি এখনকার দিনে চলবে না, আপনাদের ওসববুজরুকি আমার অনেক দেখা আছে, খুব চিনি আপনাদের—

উঁহুঁ,—অনেক বাকী আছে বাবা, মানুষ চিনতে—এখন তো শিশু, এই বলে সাধু ওখান থেকে আমায় বাইরে যেতে ইসারা করলেন। অবিলম্বে আমি আজ্ঞা পালন করলাম।

প্রায় পাঁচটি মিনিট, তার বেশী হবে না, বাইবে ছিলাম, সাধু ডাকলেন · এস গো! এসো,—

গিয়ে দেখি রায় মশাই বিরস বদনে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। খানিকটা ঐ ভাবেই গেল, তারপর যেন কোন জ্যোতিষীব কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এমনভাবেই কৈলাসবাবু বললেন-- আমার একটা কৌতূহল নিবৃত্তি করুন, কেমন করে এত ডিটেল্ জানতে পারলেন একটু বলবেন?

তুমিই তো সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছ বাবা, না হলে আর কোথা পাবো?

আমি? কি বলছেন! আমি জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে আমারই গোপন মনের কথা!

হাঁ, হাঁ, তুমি তুমি—এখানে এসে যখন ধনের মহিমা জোর গলায় কীর্তন করছিলে যে, সাধুদের একমাত্র ধনের উপরই লোভ, তখনই আমার খটকা লেগেছিল, তাই তোমার মনের ভিতর

কি আছে জানতে ইচ্ছা হল। তখন ডুব দিয়ে দেখি কি কাণ্ড। তিনি সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, পরিষ্কার।

কি রকম করে বলুন তো।

রকম আবার কি,—যা যা করছে সবই তো তোমার মনের ভিতর সর্বক্ষণ জেগে রয়েছে—তাবপর, যে মানুষ নিজের মনের খবর রাখে, সে ইচ্ছে করলে অপর একজনের মনের খবরও রাখতে পারে। যাক্, আর কেন, এখন সরে পড়ো দিকি; বুজরুগদের সঙ্গ আর নয়।

একটু কাতরভাবেই কৈলাসবাবু এবার বললেন,—আচ্ছা, এবার বলুন, আমার কি হবে, শেষটুকুও বলে দিন।

ধরা যে পড়তেই হবে তা তুমি খুব ভালই জানো, সেই জন্য টাকাটা রক্ষাব ব্যবস্থাও করেছ খুব বুদ্ধি খেলিয়ে, তিন পুরুষের পাটোয়ারী বুদ্ধি কিনা,—কাজেই টাকা মজুত থাকবে, কেবল কয়েক বৎসর শ্রীঘর বাসটুকুই লাভ, আর জ্বালিও না—সরে পড়ো, ধন আমার।

এখন যদি সাধুভাবেই দিন কাটাই?

সাধুভাবে দিন কাটবে, ঐ অপরাধের বোঝা বুকে করে? সব পাতকেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে যে, বাবা।

এটার কি প্রায়শ্চিত্ত সেটা, বলুন ঠিকই করবো।

তা তো করবে না বাবা, আমায় মিছে ছলনা করছো বোকা পেয়ে,—এর প্রায়শ্চিত্ত হল অধিকারীদের টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া—তারা দয়া করলে রক্ষাও পেয়ে যেতে পারো।

রায় মশাই আর মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, গট্‌গট্ করে বাইরে চলে গেলেন গোঁ ভরে।

সাধু বললেন, কথাটা বাবুর মনঃপূত হলনা, ব্যাপারটা দেখলে টাকাটা ছাড়বার কথা না বলে অন্য কিছু বললে হয়তো বা শুনলেও

শুনতে পারতেন। জানেন না তো, কি ভয়ানক আগুনটা নিয়ে খেলচেন।

এই পর্যন্তই কৈলাসপতির কথা—

মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা অপ্রিয় নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, এমনই পবিত্র একটি স্থানে। বেশ মনে মনে বুঝলাম—আমারও এবার যাবার পালা—আর এঁকে জ্বালতন করবার অধিকার নেই আমার।

ভদ্রতার হিসাবে আর কতটা উত্যক্ত করা যায়,—উঠে পড়াই ভালো।

অনেক তো হলো—আর কি চাই!

॥ ৫ ॥

পরদিন আবার গিয়েছি, এখন গিয়ে সাধুকে দেখলাম। আরও দেখি—বোধ হয় স্থানীয় ভদ্রলোক একজন, খুব আস্ফালন করে তেলেগু ভাষায় অনর্গল নিজ কথাই ব'লে চলেছেন,—আর সাধু এক অদ্ভূত" ভঙ্গিতে শরীর রেখে বসে আছেন; কিছু শুনেছেন কি না তা ভগবানই জানেন; কারণ তিনি চেয়ে আছেন অন্য দিকে, অন্যমনস্কভাবে। কতক্ষণ পর হয়তো একটি কথায় কিছু বললেন কিন্তু তার দিকে চাইলেন না।

এইভাবেই চললো কতক্ষণ,—আমি দাঁড়িয়েই আছি। খানিক পর ভদ্রব্যক্তি একখানা চেটাই দেখিয়ে—

'মুঞ্চেন্দুকু, কুরচোণ্ডি,' ব'লে আমার দিকে চাইলেন। আমি ভাবে বুঝে নিয়েই একখানা চেটাইয়ের উপর বসলাম। তাঁর কথা চলতেই লাগল। ভাষা তো বুঝিনা, কাজেই বসে বসে অপরূপ শব্দঝঙ্কার উপভোগ ক'রতেই রইলাম। তেলেগু, তামিল, কানাড়া মালেয়ালাম—এই চায়টি দক্ষিণী ভাষার যে মহিমা এক তেলেগুতেই তার অনেকটাই পরিচয় পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এখানে এখন এসে ভাল করিনি, এখনই উঠবো ? কথাটা মনের মধ্যেও উদয় হওয়া আর সাধু এই সময়ে অপাঙ্গে আমার দিকে একবাব চাইলেন, তার মধ্যে যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবারই ইঙ্গিত। আমি আর যাবার কথা মনে স্থান না দিয়ে সাধুর মূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম। এটা ঠিক চেয়ে থাকা নয়, নিরীক্ষণ করা যাকে বলে তাই। সাধারণভাবে প্রথম দর্শনে এই মুর্তিটিতে দেখবাব মতো এমন কিছুই নেই, কেবল পলকহীন উজ্জ্বল ঈষৎ রক্তাভ জলভরা চক্ষু দুটি, দুদিকে দুই গুচ্ছ ভ্রূর নীচে।

আমি গতকাল যতটুকু দেখেছি সেই সব ভাবছিলাম। তারপব --কৈলাসবাবুর শেষ পর্যন্ত মতিগতি কি দাঁড়ালো। গোপনে এসে কিছু জানিয়ে গিয়েছেন কিনা কে জানে! উনি তো সে-কথা বলবেন না। তবে তাঁর যদি সুমতি হয়ে থাকে তো ভালো।

আবাব ভাবচি, কি উদ্দেশ্যে এ-মহাত্মার এখানে আসা।

অনেকক্ষণ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে, বক্তা এখনও উঠবার নাম করছে না। একটু ক্ষুণ্ণমনেই আমি আবার নিজেই উঠবার কথা মনে করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাধু আবার আম র দিকেই চাইলেন, আর সেই বক্তা লোকটাও উঠে দাঁড়ালো। প্রণাম নয়, নমস্কারও নয়, লোকটা কোন রকমেই বিদায়সূচক কর্তব্যের অনুষ্ঠান না করেই যেন হঠাৎ আপন মনে স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চটপট্ প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক যেন বিশেষ কাজে গেল এখনই আবার আসবে। কিন্তু কতক্ষণ গেল যে আর এলোনা। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এইবার সাধু আসন পরিবর্তন করলেন, কিন্তু আসন পিঁড়িতে বসে নিজভাবেই চুপচাপ রইলেন, কোন কথাই বললেন না বা আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। আমার মধ্যে আনন্দ

উদ্বেগ ; লোকটা তো গেল ; কিন্তু আমার পথ কোথা খুললো। তবে এই যে চুপচাপ তার মধ্যে একটা জিনিস ছিল, অপূর্ব শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশটি এক দিব্যভাবেই ডুবিয়ে দিলে যা কথাবার্তার অবসরে মেলে না—যেন সবই পেয়েছি, চাইবার আর কিছুই নেই, কোন অভাব নেই সুতরাং কোন প্রশ্নই নেই।

এর পর যা ঘটলো তাকে নাটকীয় বলা যায়।

কতক্ষণ পরে, সময়ের জ্ঞান তো ছিলই না,—ঐ ভাব ভঙ্গের পরেই আমার মধ্যে একটা বিচার এল, সেই সকাল থেকে বোধ হয় ঐ লোকটাই এতক্ষণ জ্বালাতন ক'রে গেল, তারপর আমিও এতক্ষণ রইলাম, একটুও এঁকে একলা হ'তে দিলাম না—এটা আমার ভাল মনে হ'ল না ; তাই এখন সরে যাওয়াই ভাল ; এই ভেবে উঠবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বিদায় প্রণামের জন্য তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি, এইবার তিনি আমার দিকে চাইলেন, যেন অবাক হয়ে গিয়েছেন আমার ব্যবহার দেখে। আমি একটু থতমত খেয়ে হাত টেনে নিলাম, মুখে কথা ফুটলো না আমার ; কিন্তু তাঁর মুখে এবার কথা ফুটলো—সহজ বাঙ্গলা ভাষা—

এতক্ষণ পর সুযোগ এল, আর এখনি চলে যাচ্ছ !

জলভরা চক্ষের দৃষ্টি আমার নয়নগোচর হ'তেই আমারও চক্ষু ফেটে জল এল। তাঁর ভাবের এই ছোঁয়াচ আমার অন্তরে যেন একটা আঘাত হ'য়েই লাগলো ; অগত্যা নিঃশব্দে বসলাম। এবার তাঁর দিকেই চেয়ে দেখি, এ কি দেখছি ? - এখানে এসে পর্যন্ত এতক্ষণ যে মূর্তি দেখছি, একটু আগেই যা বর্ণনা করেছি এ তো সে পাগল মূর্তিই নয়, সামনে আমার একেবারেই একটি ভিন্ন মূর্তি, ঐ চক্ষু দুটি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই নেই পূর্বদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে। এ কি রহস্য ! এতক্ষণ যেন একটা মুখোস পরা ছিল এখন সেটি খসে গিয়েছে। এমনই দেবোপম সুকুমার মূর্তি—মানুষের মধ্যে, আমার

এতটা বয়স হল, কখনও দেখিনি। অদ্ভুত রূপান্তর— অবিশ্বাস্য এ পরিবর্তন। আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল; অথচ ঐ রূপ থেকে আমার দৃষ্টি এক মুহূর্তও নড়ে নি এমনই আকর্ষণ ঐ রূপের।

ইনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ মহাত্মা—বিভূতির অধিকারী। সাধারণের কাছে দেখতে এক রকম, আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিচিত্র ভাবের আতিশয্যে রূপ একেবারেই বদলে যায়। যিনি এ ব্যাপার জানেন না বা যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের কাছে এই রূপান্তরের তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলাই অসম্ভব। তবে আমাদের চিরদিনের অতুল্য সম্পদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে, সম্যক পরিচয়ও আছে।

যাঁরা সাধনের ভিতর দিয়ে কিছুকাল কাটিয়েছেন, তাঁরাই জানেন —যোগসাধনের ফলে অষ্টসিদ্ধি পর্যন্ত আয়ত্ত হয়। এসব বিভূতির অন্তর্গত। তবে এঁর সম্বন্ধে এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ইনি ইচ্ছা ক'রে, ভেলকী দেখাতে রূপান্তর ঘটান নি, এমন কি তাঁর যে রূপান্তর ঘটেছে এ বিষয়ে ইনিও সচেতন নন। আসলে প্রাণের প্রবল স্পন্দনই এই বাহ্য রূপান্তর ঘটিয়েছে; প্রীতির আস্পদ একজনকে পেয়ে অন্তরের ঐ আলোড়ন,—আসলে ভাব ঘনীভূত হয়েই এই প্রকাশ; মরমী সাধকমাত্রেই একথা জানেন।

তবে এই সূত্রে তাঁর যোগসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। আমি দেখতেই রইলাম ওই মূর্তি, ফলে এক ভাব-তরঙ্গ, ওখান থেকে নিঃসারিত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমায় যেন মাতাল ক'রে দিলে,—আমি তো আর এ মাটিতে নেই।

প্রাণের আনন্দে ভিতর বাহির সমান, সরল হয়ে গিয়েছে। সবকিছুই এখন সুখময় দেখ্‌চি! উনিও আর অপরিচিত নন, অতি আপন, চিরজনমের সাথী, আমার জন্মজন্মান্তরের সহচর। এই

অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সর্বশরীরে পুলক ভরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রত্যাশিতভাবেই মুখ থেকেই বেরিয়ে গেল—

আপনি তো পেয়েই গিয়েছেন।

কথাটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রেমাশ্রুপূর্ণ তরল নয়নের পবিত্র দৃষ্টি প্রথমে আমার মুখে, সঙ্গে সঙ্গেই আমার নয়নে এসে মিলিত হ'ল, সেই স্পর্শে আমার চক্ষেও ঝর ঝর ঝরতে লাগলো ধারা, একই আলোড়ন আমাদের মধ্যে। একটুক্ষণেই সামলে নিয়ে বলচেন তিনি.—

হ্যাঁ, পেয়েছি বন্ধু ; কিন্তু এ কি পাওয়া ?

ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল। আমি তাঁর মূর্তি থেকে চক্ষু আর ফেরাতেই পারিনি। কতক্ষণ পর বলছেন,—

ঐ পাওয়া,—যখনই ধরে রাখতে চাই, অমনি হারাই। সে এমনই হারানো, তাঁকে পেয়েছিলাম, এ বিশ্বাস পর্যন্ত টলিয়ে দেয়।

আবার চুপি চুপি বলেছেন,—দুঃখের কথা কাকেই বা বলবো, —তুমি এসেছ, দরদী তোমাকেই বলতে পারলাম।

এই জীবনে গুরু ও প্রবর্তকস্থানীয় অনেককেই পেয়েছি ; কিন্তু এতটা ভাবের মিলন কারো সঙ্গে ঘটেনি ;—এরই মধ্যে যেন হারানিধি পেলাম। আজ সেই কোন বেলায় এসেছি,—দীর্ঘকাল, কতটা অস্থির অবস্থা ভোগ করেছি, তার পুরস্কার যে এই প্রকার হবে, এই বিস্ময়কর পরিণতি ভেবেই আনন্দের সীমা নেই। এমনটা যে ঘটবে তা কল্পনাও করিনি।

এর পরও একটু আছে—

এখন তিনি আসন থেকে উঠলেন, কাপড়খানি পড়ে রইলো, কাছে এসে আমার হাত দুটি নিয়ে নিজ হাতে ধরলেন, মুখের পানে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ, কি দেখলেন জানি না। সম্পূর্ণ মুক্ত উলঙ্গ মূর্তি—অশ্রু বিগলিত,—

বলবে আমায়, কেন এমনটা হয় ?

কথাগুলি শুনতে যেন প্রশ্নের মতই--কেন এমন হয় ? কিন্তু আমার অনুভব অন্য।

এ একটি আজ্ঞা, অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যার উত্তরে আমার যা কিছু ঈশ্বরানুসন্ধানের ফলাফল, সকল পুঁজিপাটা ধরে দিতে হবে এর গোচরে। এর চেয়ে বড় পরীক্ষায় জীবনে কখনও পড়িনি,—কে জানত এই অদ্ভুত পাগল কোথা থেকে এসে এখানে বসে আছে আমার চরম পরীক্ষা গ্রহণ ক'রতে। তবে তাঁর স্নেহময় কোমল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে যন্ত্রের মতই উত্তরটি বেরিয়ে এল নিঃসঙ্কোচে—

তিনি যে স্বেচ্ছাবিলাসী, তাঁর স্বভাবই তো ঐ—অপ্রত্যাশিত কোনো এক ক্ষণে আসা, অন্তরক্ষেত্রে সবটাই পূর্ণ করে বসা, ক্ষণেক আমার প্রাণ নিয়ে বিলাস তাও আপন ইচ্ছামত। আমি তখন নিজ ক্ষুদ্রতা ভুলে যদি কাল-ব্যধান ঘুচিয়ে আরো পেতে চাই, নিজ হৃদয়ে আর একটু রাখতে চাই,--তখনই অন্তর্ধান।

আর না—আর না, ব'লে একেবারে সুদীর্ঘ প্রবল দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন—যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনেই বাঁধলেন। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, সেই অন্ধকারে আমরা কতক্ষণ ডুবেই রইলাম, কারো বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কথা যেটুকু হ'ল,—তা সাহিত্যের অধিকার সীমা বহির্ভূত।

এইভাবেই আগে যাঁকে যোগী ভেবেছিলাম একটু যোগৈশ্বর্য দেখে এখন বেশ ভালমতেই অনুভব করলাম, রাগমার্গের একজন—মরমী। এটি দ্বিতীয় পরিচয়।

আজ যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়লাম, ব্যবহারের পালা শেষ হ'লেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাল যদি আসতে পারি দেখা হবে কি ?

কথাটা আমার মুখেও এসেছে যে, তা হ'লে কালও দেখা হবে ? রাত্রে কোথায় থাকবে ?

উত্তরে, নাইডুর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বললাম ; এখানে এলে তাঁর অতিথি হাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

॥ ৬ ॥

আনন্দে ভরা প্রাণ, আত্মরাজ্যের অনুভূতি মধ্যে একাই আমি, যন্ত্রচালিত দেহটা নিয়ে কতক মাতালের মত প্রবাসের আশ্রয় লক্ষ্য ক'রে গিয়ে উঠলাম যেথা ব্যান্‌কট রত্নম্ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কথা কইবার অবস্থা নয়—আমার সঙ্গে তখনই কোন কথা হল না—

অন্দরমহলে ভোজনশালায় রাত্রে নাইডুর সঙ্গে দেখা। দুজনেই খেতে বসেছি—মেঝেতে পিঁড়ার উপর – গিন্নি পরিবেশন করছেন। প্রকাণ্ড কলাপাতায় অন্নব্যঞ্জনাদি। নাইডুর সঙ্গে যা কিছু কথা-বার্তা আলাপ-আলোচনা এই সময়টাতেই চলে। সারাদিন নিজের কাজেই ব্যস্ত গৃহস্বামী—অতিথি, বান্ধবের সেবার ভার গিন্নির উপরেই থাকে ; কিন্তু গৃহিণীর ঘন ঘন খাওয়ার ব্যবস্থা এড়াতেই আমার পক্ষে দিনের বেলায় বেশীক্ষণ ওখানে থাকা সম্ভব হয় না। তাই বেরিয়ে পড়ি—নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই,—যথাকালেই ফিরে আসি। নাইডুর সঙ্গে কথা আমাদের ইংরাজীতেই চলে, যেহেতু আমি তেলেগু বুঝি না।

এখন নাইডু বলছেন—আশ্চর্য ব্যাপার – তোমাদের এই বাঙ্গালী সাধু চেনা সহজ নয়। আশ্চর্য লাগে আমার একথা ভাবতে, জানো বন্ধু, এত সাধু ঘেঁটেছি তার সংখ্যা হয় না। ঐ তো আমার কাজ, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো। এঁকে কিন্তু আমি বাঙ্গালী ব'লে ধরতেই পারি নি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কি অসাধারণ

আত্মগোপনের কৌশল। ঐ সাধুকে—কোন রকমেই চেনবার যো নেই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসী দেখে দেখে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সাধুমাত্রেই তার শরীর, পোশাক, তাদের অঙ্গে বিশেষ ক'রে একটা ছাপ,—সাম্প্রদায়িক ধর্মের চিহ্ন কিছু-না-কিছু থাকবেই। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন ভাব কোন সাধুরই দেখিনি, আমার জীবনের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা।

এইভাবে, ষ্ট্রেঞ্জ কথাটা বহুবার ব্যবহার ক'রে তাঁর বিস্ময়কর অনুভবের পরিচয় দিলেন।

এক্ষেত্রে আমি বললাম,—বাইরের চিহ্ন দেখেই সাধু চেনার অভ্যাস কি তোমার যথার্থ সাধু চেনার উপায় ?

আরে, কি দেখে বুঝবো তাই বলো না যে, ইনি আমাদের মত গৃহস্থ একজন, স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘর করেন কিংবা ইনি সংসারত্যাগী, ভগবানের দিকে লক্ষ্য এবং তাঁতেই আত্মসমর্পণ করেছেন। সাধু-সম্প্রদায়ের একটা চিহ্ন বা লক্ষণ থাকবে তো। যেমন ধর—রামায়ৎ বৈষ্ণব; অথবা শক্তি-উপাসক শাক্ত। বৈদান্তিক অথবা শৈব—এ সব লক্ষণ তো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থেকেই বুঝা যায়। না হ'লে আমাদের সাধু চেনবার অন্য উপায় কি ?

বললাম, ঠিক ধরেছ। ঐ বাঙ্গালী পাগলার কাছে তুমি যাওনি তারপর ?

নাইডু বললেন,—আর কেন ও সব পাগলা-টাগলা বলছ ভাই; যখন স্বীকার করছি যে চিনতেই পারিনি, কোন ধর্ম-সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই ব'লে। এখন তুমি তো দেখে এসেছ, আমায় ব'লেই ছাওনা কি রকম সাধু আর এ্যাপ্রোচ করবো কি ভাবে ?

না ভাই, আমার কর্ম নয় তোমায় বোঝানো, তুমি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে বুঝে নেবে। তুমি নিজেও তো কথা বলেছ; কালকে কি চমৎকার ঈশ্বরতত্ত্ব বললেন।

কি জানো, আসলে আমাদের দ্বারা সাধুদের খাওয়ানো, পরানো, তাকে রেলভাড়া দিয়ে তীর্থে পাঠানো এ সব হতে পারে, কিন্তু সাধুর যথার্থ পরিচয় নেওয়া সম্ভব নয়। একটু শ্রদ্ধা যার উপর হ'ল বড় জোর তার কথাগুলি বসে খানিক সময় নষ্ট ক'রে, কাজ-কর্ম ফেলে শুনলাম। যা দেখি সবই একঘেয়ে, সেই জপ করো, ধ্যান করো, সাধু গুরু সেবা করো, দান করো, তীর্থ করো—এইসব বলবে; পজেটিভ কিছু পাবার হদিশ নেই। সন্দেহ হয় ওরাও হয়তো কিছু পায়নি, কেবল গুরু উপদেশ পালন করচে। আর ঘুরে ঘুরে সারা ভারতময় পর্যটন করচে। কিন্তু কৈ, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারি কি, যাতে আমার কিছু সত্যই লাভ হয়?

আমি বললাম, উনি নাকি কালকেই চলে যাচ্ছেন?

এ্যাঁ, তাই নাকি? তা হ'লে তো আমায় কাল সকালে গিয়েই আট্‌কাতে হয়।

আট্‌কে কি করবে?

সাধুসঙ্গ করবো,—তার ফলটা যাবে কোথা? জানো তো, আমরা ইণ্ডিয়ান—সাধুসঙ্গের মহৎ ফল, আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথা।

নাঃ, যতটা ভেবেছিলাম, নাইডু গারু বিগ বিস্‌নেসম্যান হ'লেও ততটা বহির্মুখী নন, সাধুসঙ্গের মহৎ ফলও ছাড়তে চান না। এ দিকে কিন্তু এর জন্য এতটা চেষ্টা করেও একটি পয়সাও এঁকে লওয়াতে পারেন নি কোন প্রকারে, না একখানা বস্ত্র, না খাওয়া, না কিছু, না কিছু টাকা রাহা খরচ ট্রেনভাড়া ইত্যাদি বাবদে, তাঁর প্রয়োজনমতো কিছুই গ্রহণ করাতে পারেন নি, তাই মহা ফাঁপরে পড়েছেন এই সাধুকে নিয়ে। অথচ দাতা তিনি, তার মনটা ভাল নেই। কিন্তু এমনই চিত্তাকর্ষক কথাও কোথাও পান নি এতো সাধু সঙ্গ করছেন। সারাক্ষণ কথাবার্তায় এইটুকু মনের কথা পেলাম।

এখন ভোজন শেষে আমার সঙ্গে আর কোন কথাই হ'ল না, গম্ভীর মুখে উপরে তার শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। ঠিক তার বিপরীত দিকেই আমার থাকবার ঘর। খানিক নিঃসঙ্গ থাকবার জন্য আমিও আমার স্থানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন একটি। ভাবতে ভাবতে সুষুপ্তির কোলে ডুবে গিয়েছিলাম,—জেগে—উঠলাম ভোরবেলা।

কোন সাধুর কাছে সকালেই না যাওয়া ভাল। শুনেছিলাম, —বিশেষ,—সূর্যোদয়ের পর প্রথম চারদণ্ড যোগি বা সন্ন্যাসীরা একরকম আত্মস্থই থাকেন।

নাইডু যথাকালে নিজেব অফিসে চলে গিয়েছেন শুনলাম তাঁব চাকরের মুখে। নিজ কর্তব্য সমাধা করে ঘড়িতে সাড়ে নটা দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে ওখান থেকে দুর্গা মন্দিরে যেতে। ভেবেছিলাম আজ নিশ্চয়ই একলা পাব, প্রাণ খুলেই খানিক কথা কইব।

হায়রে অদৃষ্ট, গিয়ে দেখি আমাদের ব্যান্‌কট্‌ রত্নম্‌. অফিস কামাই ক'রে, সাধুর যাওয়া আটকাতেই বোধহয়,—একখানা চেটাইয়ের উপর আসন পিঁড়িয়ে বসে সাধুর সামনে, ভক্তিভাবে তন্ময় হয়ে সাধুসঙ্গ করচেন; অর্থাৎ মনের সুখে প্রশ্ন ক'রে উত্তর বার করছেন সাধুর মুখ থেকে।

উলঙ্গ সাধু, চেটাইয়ের উপর তাঁর কাপড়খানি, কাল যেমন দেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই রকমই রাখা, তার উপরে এখন বসে আছেন; আর অন্য দিকে মুখ, চক্ষু বুজিয়ে হিন্দীতেই কথা কইছেন। চমৎকার, স্পষ্ট তাঁর হিন্দী শুনলে কে বলবে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী নন। বোধ হয় নাইডু হিন্দীতেই কথা আরম্ভ করেছেন। আমার জানা ছিল নাইডু খুব ভাল হিন্দী বলেন, তাঁর সঙ্গে একটিও ফার্সী বা উর্দ্দু শব্দ থাকে না, সংস্কৃতবহুল

হিন্দী। তখন কিন্তু এখনকার মতো জবরদস্তি ছিলনা হিন্দী শিক্ষার উপর। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা।

এখন দেখলাম সাধুর আর এক মূর্তি ; কাল সন্ধ্যায় যা দেখেছি যেন সে মানুষই নয়। যাই হোক, এখন আমায় দেখে নাইডু কি ভাবলেন কে জানে? নিঃশব্দে একখানা চেটাইয়ের উপর বসে পড়লাম। তখন সাধু বলছিলেন– সহজ হিন্দী ভাষায় ;—

পাগল না কি। ঐটাই তো সবার শ্রেষ্ঠ শক্তি, জীবনের পুঁজি। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তোমার ব্যবসায়ের মূল পুঁজি। এখানে প্রত্যেক জীবের ঐ প্রাণই সৃষ্টিশক্তিরূপে কাজ করে, যতই ভোগ ও কর্ম প্রবৃত্তির প্রেরণা, সকল গতির মূলেই ঐটাই যে।

পুরুষ প্রকৃতির সম্ভোগ—যার ফলে সৃষ্টি বা জীবোৎপত্তি। ঐ সৃষ্টি-প্রবৃত্তির মূলেই ঐটি, যা থেকে তোমার উৎপত্তি ; আবার ঐটি নিয়ে তুমিও এসেচ জীবনের সম্বল করে। জন্ম থেকে তোমার বৃদ্ধি, মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি, তোমার সকল গতি নিয়ন্ত্রিত করচে ঐটিই। তবে এটা জেনো যে, যৌবনে সন্তান-সৃষ্টি উপলক্ষ্যে যে সম্ভোগ, সেইটাই তোমার সৃষ্টি-শক্তির সবটাই নয়। ওর উদ্দামতা ও স্থূল অংশ যদিও সাধারণ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐ কর্মের উপর আকর্ষণটা প্রবলভাবেই থাকে। তাদের সংস্কারই ঐ রকম, স্থূলবুদ্ধি নিম্নস্তরের জীব ব'লে। এখন যার মধ্যে প্রথম থেকেই ওটা প্রবল সে নিশ্চয়ই অসাধারণ ধীমান। পরিণামে তার দ্বারা হয়তো অনেক উচ্চস্তরের সৃষ্টি, কল্যাণকর অনেক কিছুই হতে পারে। এখানে সমাজের শীর্ষস্থানে থেকে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ঐ প্রাণশক্তির প্রাচুর্যই তাঁদের অস্তিত্বের মূলে।

নাইডু বললেন—কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিটা ইন্দ্রিয় সুখের উপলক্ষ্য হয়েই তো রইল ; এর পরিবর্তন কোথা?

তা'হলে আরও একটু স্থির হও। শোন,—পরমেশ্বরের বিচিত্র

এই সৃষ্টির মধ্যে প্রাণীসমাজের শ্রেষ্ঠ এই মানব। এখন পুরুষ-জীবনে, এই পুরুষ বলতে প্রাণী জগতের পুরুষ জাতি বুঝতে হবে। পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তিটাই তার সহজাত, সংস্কারগত এবং আমরণ ক্রিয়াশীল। পুরুষের এইটিই বৈশিষ্ট্য। একটি মানব পুরুষের সৃষ্টি-স্পৃহা কতরকমে কতদিকেই কার্যকরী হয়ে যাচ্চে, কত প্রকারের কত কত সৃষ্টির 'কারণরূপে নিজ অস্তিত্ব সফল করছে · যে কেউ একজন পুরুষ. নিজ জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। এইভাবে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখ জগৎসংসারের প্রতিটি জীবের গতিপথে, প্রতি পলে পলে, কি প্রবল বেগ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি উপলক্ষ্যে এই বেগ, এ চাঞ্চল্য একবার যদি লক্ষ্য করতে পারো— তোমাকে স্তম্ভিত ক'রে দেবে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ-প্রবৃত্তি উড়ে যাবে তোমার।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ, সাধু নির্বাক।

পরে বলছেন,—

ব্যক্তিগতভাবে তোমার ধী অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি, তোমার প্রবৃত্তি কিনা মন,- সুস্থ ও সবল ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে তোমার প্রত্যেক সৃষ্টির প্রেরণা সফল করছে। তোমার মনুষ্যত্বের এই মূল কথা।

॥ ৭ ॥

যেই একটু থেমেছেন, হঠাৎ নাইডু হাত জোড় করে একটু ভক্তিভাব দেখিয়ে ব'লে ফেললেন,—

আপনি মনে করলে ঐ বিপুল প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারেন।

সাধু যেন চমকে উঠলেন। চক্ষু দুটি খুলেই বললেন—হঠাৎ একি কথা এনে ফেললে তুমি? এ যে তোমার অসঙ্গত আবদার দেখছি, স্বাভাবিক প্রাণের খেলা, ইন্দ্রিয়ভোগের 'ব্যাপারে মরা-বাঁচার কথা আনলে কেন এখানে?

নাইডু ইতিমধ্যে সচেতন হয়েছেন। বললেন, কারো মধ্যে ঐ সম্ভোগ-স্পৃহাটা প্রথম থেকেই দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, যে-কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ;—ঐ রিপুর প্রভাবের কথা ভেবেই ব'লে ফেলেছি। শুনে সাধু বললেন,—

রিপু বলছ এখন, শত্রু ভেবেই তো ? এখন জিজ্ঞাসা করি, ওটা যথার্থ শত্রু ব'লে মনে হয়েছে কি ? তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে কি তোমার মতো প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন মানব একজন, যার Superiority Complex সকল ব্যবহারে কাজ করছে তার মধ্যে এতক্ষণ টিকিতে পারে ? তুমি যেন দেখতে চাইছ যে ওটা তুমি ছাড়তেই চাইছ, কিন্তু ও ছাড়ছে না ; তাই নয় কি ?

ক্ষমা করুন, অতটা বুঝে বলিনি, প্রভু।

আসল কথা তো আপনিই এসে পড়ত,—অধৈর্য্য হ'লে কেন ? সরল কথা এই যে, একজন পুরুষের জীবনে প্রথম যৌবনে, সৃষ্টি-শক্তির উদ্‌বোধন, তাইতে জীবসৃষ্টির প্রবৃত্তি, এ তো সবাই জানে। দুই একটি সন্তান হয়ে গেলেই প্রাকৃত নিয়মেই ওটা আর অত প্রবল থাকতে পারে না। পিতৃত্বের গৌরবই তাকে সংযত করে,—তারপর শিল্প-সৃষ্টি, উচ্চ চিন্তা বিলাসের পথে চলে যায়। তবে এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন জীবই নারী-সম্ভোগটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বলে আঁকড়ে থাকে—তাদের কথা আলাদা, প্রকৃতির বিকৃতিও আছে তো—এখানে এদের কথা ছেড়ে দাও না।

নাইডু বললেন—যাদের সন্তান হ'ল না।

নাইডু নিঃসন্তান, বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর দু-তিন বৎসর হবে।

সাধু বললেন—নাই বা হ'ল, এত লোকের হচ্ছে, এই সভ্য সমাজে দুই-একজনের যদি নাইবা হয়, ধরিত্রী হাল্‌কা হয়ে যাবেন না।

সন্তান না হ'লে বংশধারা লোপ হয়ে যায়, পিতৃপুরুষ নরকস্থ হন, এই সবও আছে না ?

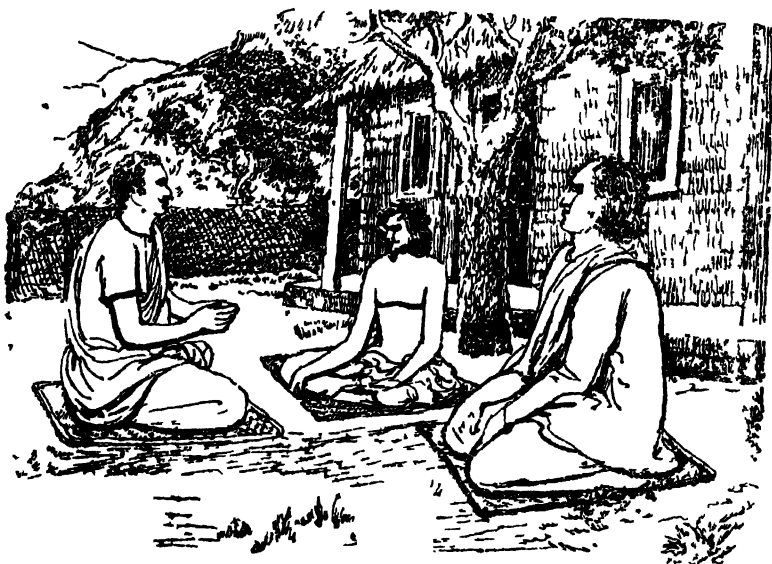
ওহো, ওসব এখনকার সমাজের কথা নয়। সেকালে, হাজার হাজার বছর আগেকার কথা,—তখনকার সমাজকে সম্প্রসারিত, শক্তিমান করতে দ্রুত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন সমাজপতিরা অনুভব করতেন। তাই প্রজাবৃদ্ধির উপর অতটা জোর দিয়েছেন। এরই প্রতিক্রিয়ার কথাটা এই,—যেমন এখনকার মনীষিরা অধিক সন্তান বা প্রজাবৃদ্ধির ফলে আহার্য বস্তুর অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়চে দেখে সেটাও সমাজের অশান্তির কারণ ব'লে সংযত হতে বলছেন। এমন কি, বাজারের রক্ষাকবচ ধারণ করতেও পরামর্শ দিচ্চেন, এই রকম আর কি।

মানুষ-সমাজ কি তখন সত্যই দুর্বল ছিল ?

—আরে বাবা, খৃষ্টীয় আট দশ সেঞ্চুরী আগেও কোথা ছিল এত লোকসংখ্যা আর এত বড় বড় সহর। দেশের চারদিকেই ঘন বন-জঙ্গল,—এক জায়গায় নদীর ধারে একটু ঘন বসতি, একটা বড় গ্রাম, সেটাও সুলভ ছিল কি ? সিংহ, বাঘ, ভালুক, নেকড়ের মত হিংস্র প্রাণী জঙ্গল-রাজ্যময়,—তার উপর চোর, ডাকাত প্রভৃতি যাতুধনেরা, তাই মানব সভ্যতার প্রথম দিকে প্রজাবৃদ্ধিটা একমাত্র কাম্যই ছিল—মানুষ-সমাজে নিরাপত্তার জন্য, দলবৃদ্ধির কত প্রয়োজন বুঝতেই তো পাচ্চো। যার যত সন্তান তার ততই প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এ সব তোমাদের তো না জানবার কথা নয়। তখনকার সেই প্রজাসংখ্যা অল্পতার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এযুগে—এখন প্রজা-বৃদ্ধির ঠেলা সামলাও। তারপর বলচেন—

ওসব বুদ্ধি ছাড়ো, এখন জেনে রাখ—এখনকার দিনে সন্তান না হ'লেও জীবনে তোমার অগ্রগতির কোন বাধাই হবে না। বিশ্বজননীর প্রজাসৃষ্টির হিসাব ঠিকই আছে। এখন, যাদের গোড়া

থেকেই ঐ সম্ভোগপ্রবৃত্তি উদ্দাম বলছিলে, আসলে তাদের প্রাণ-শক্তিঘটিত সৃষ্টি-প্রেরণাই প্রবল বুঝতে হবে। আর যৌবনে সৃষ্টির প্রেরণায় যে নারীসঙ্গলিপ্সা সেটা সৃষ্টি প্রেরণার প্রথম ধাপ, যেমন তোমার জীবনে কতকটা মোহাচ্ছন্ন শৈশব অবস্থা, সৃষ্টি-শক্তি বিকাশের শৈশব, ব্যাপারটা বুঝলে? নাইডু সস্মিত বদনে বললেন—তারপর—



তারপর পূর্ণ যৌবনে সৃষ্টি-শক্তি পরিণতির ক্রমে চৈতন্যের স্ফুরণ, স্থূল সৃষ্টির ধারা অতিক্রম ক'রে মানব চৈতন্য প্রতিভার এলাকায় পড়ে। তখন সাধারণ অসাধারণ ভেদে উচ্চস্তরের সৃষ্টি অধিকারী মানবসমাজের জ্ঞান, ধ্যান ও চিন্তাপ্রসূত কল্যাণকর নানা কর্ম প্রবৃত্তির স্ফুরণ। যথার্থ আনন্দময় মানবজীবনের আস্বাদ, ফলে পরমাত্মার বিলাসক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত হওয়া সম্ভব করে। মানুষ-সমাজে সৃষ্টির পর্যায়ে এর বড় আর কি? ঐ বিলাসই তো মানুষ-জীবনে চরম সার্থকতা।

বিলাস। এ আবার কি রকম কথা ?

হাঁ, একটু অবহিত হও, বৎস, এ সংসারে এই জীব কোটি কোটি অসংখ্য মানুষ, এরা কি নিয়ে থাকে, কি নিয়ে কালক্ষেপ করে ?

করে তো অনেক কিছু বহু কর্মই করে, এখানে কতগুলির নাম করব ?

আহা, অনেক কিছুর মধ্যে যাবে কেন, বহুকে সংক্ষেপ ক'রে ফেল না – বুদ্ধি আছে তো ?

তা হ'লে আপনিই বলুন। শুনে সাধু বললেন, এখানে ভোগ আর বিলাস ছাড়া আর কোন কর্ম আছে কি ? মানুষের দৈনন্দিন জীবন লক্ষ্য কব না,—স্থূল কর্মেন্দ্রিয়েব কত রকমের কর্ম বা ভোগ বাকিটা বিলাস, উপলক্ষ্য সুখ বা আনন্দ। ভোগের বেলাও তাই আর বিলাসের বেলাও তাই। মানুষের মধ্যে এসব জন্মগত সংস্কার হয়েই আছে,—যাতে সুখ বা আনন্দ নেই এমন কর্ম কেউ ক'রতে চায় ?

॥ ৮ ॥

এটা বুঝলাম, কিন্তু ঐ যে সাধারণ অসাধারণ ভেদে ব'লে একটা ফ্যাকড়া তুলে রেখেছেন।

হাঁ, তোমার সমাজে কি সাধারণ, অসাধারণ ব'লে কোন ভেদ নেই ?—কর্মক্ষেত্রে একজন খেটেখুটে নিজ সংসার পালন করে ; আর একজন সহস্র জনাকে খাটায়, প্রতিপালন করে, দুইজন কি একই পর্যায়ে পড়ে ? এ সব জানো তো ?

অতীব বিনীত এবং নম্র বচনে নাইডু বললেন, প্রভু! জানি তো সবই, কথা আর কি নূতন আছে ; কিন্তু সেই পুরানো কথা যখন আপনার মতো কারো মুখ থেকে বেরোয় তাইতে এমন কিছু থাকে যাতে ভিতরটা আলোকিত হয়ে যায়।

তুমি কি আইনও ঘেঁটেছিলে, বাবা? যেন আইনজ্ঞের গন্ধ পাচ্চি—কথাটায়?

বি. এ. পাশ করার পর কিছুদিন আইন পড়েছিলাম এবং ভালভাবেই পাশও ক'রেছিলাম, ভেবেছিলাম আইন ব্যবসায়ী হব। কিন্তু শেষ অবধি বাবাই এ বিস্‌নেসের জোয়াল ঘাড়ে তুলে দিলেন।

তোমায় উপযুক্ত কাজই দিয়েছেন। বেশ, এখন আরও একটা কথা—তুমি দর্শন শাস্ত্রও পড়েছ তো?

তা পড়েছি, সাংখ্য, পাতঞ্জল বেদান্ত অধ্যয়ন করেছি; কিন্তু যথার্থ তার মধ্য দিয়ে নিজ পথ ঠিক ক'রতে পারি নি—সাধনের পথে যাই নি।

পথের কথা বোলো না, তুমি তো পথেই আছ। ঠিক নিজ পথ যাকে বলে—

কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারি না আমি সত্যই কোন্ অবস্থায় রয়েছি, আর আমার ভবিষ্যৎটাই বা কি? সে যাক, আপনি এখন সাধারণ অার অসাধারণের কথাই বলুন।

মন আর বুদ্ধি এ দুইটি জীবনের পুঁজি, এটা বুঝতে পারো?

তা বোধ হয় পারি, তা নিয়েই তো পথ চলছি।

সাধারণ যারা তাদের বলছি মন প্রধান, মনের বশেই চলে। শরীর, ইন্দ্রিয় আর নিজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না; বুদ্ধি পর্যন্ত যাদের স্বার্থদুষ্ট, তারাই সাধাবণ। আচ্ছা, আর একটা কথা বুঝতে পার, মন-প্রভাবিত বুদ্ধি, আর বুদ্ধি-প্রভাবিত মন?

অর্থাৎ যাদের মন, বুদ্ধি বা বিবেকের অনুমোদিত কর্মই করে তাহাদেরই বুদ্ধি-প্রভাবিত মন, আর যারা স্বার্থান্ধ মন নিয়ে বুদ্ধি-বিবেকের কথা বিশেষ বিপন্ন না হ'লে শোনে না, তাদেরই মন-প্রভাবিত বুদ্ধি অথবা স্বার্থদুষ্ট বুদ্ধি বলেছেন তো?

সাবাস, একদম ঠিক। আচ্ছা, তাহ'লে মন-শাসিত বুদ্ধি যাদের

তারাই যদি সাধারণ পর্যায়ের হয় অঙ্কের হিসাবেই, বুদ্ধি-প্রভাবিত মন যাঁদের তাঁরাই হলেন অসাধারণ। তাঁদের মধ্যেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব।

সাধারণের মধ্যে কি প্রতিভা থাকে না?

ঠিক প্রতিভা যে শক্তি, চৈতন্যেরই স্ফুরণ,—তা স্বার্থদুষ্ট মনের প্রভাবে জন্মায় না। কর্মশক্তি প্রবল এমন কি অসাধারণও হতে পারে। সাধারণের থাকে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির দীপ্তি, স্বার্থময় আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধির জলুস,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি প্রবলও হতে পারে। কিন্তু প্রতিভার দীপ্তি স্বতন্ত্র বস্তু, আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ।

সাধারণের কথাটা আরও একটু খুলে বলুন না।

সাধারণেব বিদ্যা ও বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে, তীব্রও হতে পারে কিন্তু তার সব কিছু সংস্কার স্বার্থের ছাঁচেই ঢালা। আরও একটা সরল বৈশিষ্ট্য আছে তাদের মধ্যে—সকল কামনার পূর্তি এবং সর্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধির প্রতীক হল ধন; তাদের জীবনে ধনই সবার বড় হয়ে যায়। সাধারণের সর্বনিম্ন স্তর, তারপর মধ্য এবং সর্বোচ্চ স্তরেও মহা প্রতিষ্ঠাবান যারা তাদের সবটুকু বদ্ধি, সকল শক্তি ধনের পিছনেই, নিজ সৃষ্ট সংসার ও পরিজনের লালন-পালন, সুখস্বাচ্ছন্দের পিছনে এবং সঞ্চয়ের পানে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাদের সৎকর্মেও মতি, অনেক ধনসঞ্চয়ের ফলে হয়তো সাধারণের কল্যাণকর কাজে তাদের দান যদি তার প্রতিষ্ঠার অনুকুল হয়, তাহ'লে তার অনেক-কিছু কর্মই সমাজে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটিই হল সাধারণের মোদ্দা কথা।

নাইডু গারু এবার একটু যেন ব্যস্তভাবেই বললেন, সাধারণ সম্বন্ধে সব বলা হয়েছে কি?

সাধু বললেন, মোটামুটি তো ঐরকমই। তুমি বাবা, এবার আমায় কাৎ করবার মতলবেই আছো, দেখছি।

কথাটি কি মনে করে যে বলছেন তা তো আমি বুঝতে পারিনি।

তাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি; তাইতো তোমার আসল কথাটা?

আপনি অন্তর্যামী, ঠিক ঐ কথাই ছিল আমার।

মানুষের সত্তা যে চৈতন্যময়, সেটা একেবারে এড়াবার যো কোথা? তাই যখন প্রবীণ বয়স আসে, তার নিজ সমাজের গুরুস্থানীয় কাকেও আদর্শ ক'রে নিজ চৈতন্য প্রতিষ্ঠার অভাব খানিক পূর্ণ বা সার্থক করবার চেষ্টা থাকে। ঈশ্বরতত্ত্ব ধর্মবিজ্ঞান অথবা আত্মতত্ত্ব নিয়ে সাধারণ ধনৈশ্বর্যবান, তাঁরা কখনও মাথা ঘামাতে পারেন না। একটু স্থির হয়ে অথবা বিষয় বা ধনের চিন্তাধারা ক্ষণেকের জন্যও ত্যাগ ক'রে ধর্ম অথবা জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা তাদের ধাতে আসে না। তবে টেবল্ টক্ বেশ লাগে, দু-চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজ কর্ম, মত, পরের ধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম সম্বন্ধে বা নিজ পছন্দ ও অপছন্দ সম্বন্ধে ধর্ম নিয়ে আলোচনা তাঁদের আনন্দের সময়ক্ষেপ, অবশ্য যখন নিজের কাজকর্ম থাকেনা।

স্বভাবে ভক্তি নেই কিন্তু ভক্তি দেখাতে, ভক্ত পরিচয় দিতে উৎসাহের সীমা নেই; কালের ধর্ম যা, তা নিয়ে ফ্যাসান হিসাবে কিছু কিছু দানের ব্যবস্থাও আছে। ঈশ্বর-কৃপা পেয়েছেন, কতভাবে বিশেষ বিপন্ন ও সঙ্কটময় অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছেন, ভগবান তাঁকে স্পেশাল ফেভার করেন যা অপরকে ক'রতে দেখা যায় না; এইসব বর্ণনায় তাঁদের বড় লোভ। রাম সীতা দুর্গা রাধা কৃষ্ণ কালী অথবা শিব গণপতি বা মহাবীর—এই রকম একটি না একটি প্রতীক চাইই না হলে তাঁরা নড়তে পারেন না। আসলে, আধ্যাত্মিক যা কিছু, এমন কি ঈশ্বরানুরক্তি তাদের বাইরের জিনিস। অথচ সামান্য আয়োজনে কখনও কখনও বাইরের ঘরে হরিসংকীর্তন, কালীকীর্তন,

অথবা ভাগবৎপাঠ দেওয়ার ফ্যাসন, বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে শোনানোর ব্যবস্থা, বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রতিবেশীদের আহ্বানও আছে। বেশী বেড়ে যাচ্ছে, খরচের ব্যাপার মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়—দেখে, কোন একটা অছিলায় তা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার শান্তি। এর বেশী বলা ঠিক হবে না। সাধারণ ধনৈশ্বর্যশালীব এইসব বৈশিষ্ট্য। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে সংঘর্ষ যতক্ষণ না বাধে ততক্ষণ তাঁরা ধার্মিক। সমাজে যারা অল্পবিত্ত তাদেব আত্মীয় কুটুম্ব তাদের আদর্শ হয়েই তাঁরা সমাজে আধিপত্য করেন।

নাইডু গারুর মুখে একটু বিষন্ন হাসি, বললেন—যেমন আমরা।

সাধু নির্বাক।

॥ ৯ ॥

একটুখানি চুপচাপ। নাইডু গারু বললেন,—এখন অসাধারণ যারা প্রতিভাশালী তাদের কথা।

যাদের দুর্দমনীয় সম্ভোগস্পৃহা বলছিলে, তাদের সৃষ্টি-প্রবৃত্তিটাই উদ্দাম। যৌবনে চৈতন্য স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দুর্দমনীয়তাই প্রতিভায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন থেকেই সৃষ্টি-প্রতিভাব খেলা আরম্ভ।

প্রাণচৈতন্য স্পন্দনের এমনই গতিবেগ, ঐ প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয় সম্ভোগস্পৃহা ক্ষীণ হয়েই আসে, যতই গভীর তত্ত্ব, জ্ঞান, এবং চিন্তাসমূহ নিয়ে অন্তঃকরণে আলোড়ন চলতে থাকে।

হঠাৎ নাইডু গারু ব'লে ফেললেন, অটুট ব্রহ্মচর্য না থাকলে কি ঈশ্বরলাভ ঘটে ?

অটুট ব্রহ্মচর্যের হেঁয়ালীতে পেয়েছে দেখছি ; যদি ওটা কারো জীবনে ঘটে যায় তাহ'লে সেটা হবে বড় একটা বিলাস ঈশ্বরলাভের

কোন সম্বন্ধই নেই তার সঙ্গে। ফলে তার আয়ুকাল হ্রাস হয়েও যায় শক্তির অতিরিক্ত চালনার ফলে। এটা কর্মশক্তির কথা।

সে কি, শাস্ত্রে বলে যে, ব্রহ্মচর্যই তো ব্রহ্মলাভের উপায়।

ওটা অকালে ইন্দ্রিয় লালসা থেকে সামলাবার জন্যই অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের সংযমের উপদেশ,—তা ছাড়া আদর্শটা ভালো তো।

কিন্তু—ওর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে—

রক্ষা করো বাবা, সেকালের বশিষ্ঠ, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র এদের কথা নাহয় ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু একালের, গুরু নানক, কবির, কামাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত—এঁরা সংসারী, জীবন নিয়ে কি ঠাট্টা ক'রে গেছেন নাকি? তুমি শিক্ষিত, এখনকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরী তোমার মন, বল না, ঐ অটুট ব্রহ্মচর্য এই পৃথিবীর সমাজে মানবজীবনে স্বাভাবিক কি?

তবুও এটা তো ঠিক, যদি কেউ পারে সে তো শক্তিমান হয়?

হোক না সে শক্তি একটি বিলাসই হবে মানুষের জীবনে। বড় জোর খুব বেশী কর্মশক্তি বাড়তে পারে—সেটাও তো বিলাস। তাছাড়া আর কি হতে পারে?

শক্তিমান হ'লে ঈশ্বরলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার হবে না কেন?

শক্তিমান অবস্থায় সে তো নিজেকেই ঈশ্বর মনে করবে, দ্বিতীয় ঈশ্বর সে চাইবে কেন?

কিরকম?

রকম আবার কি, রুগ্ন শরীর একজনের মন যেমন সর্বদা শরীরে মধ্যে রোগের জায়গাতেই পড়ে থাকে—শক্তিমানের মনও তেমনি তার শরীর আর বলবীর্যের উপরেই পড়ে রইল। তার দম্ভ অহঙ্কারের দাপটে তার সামনে যাওয়াই দায়।

কি বিপদ!

সাধু বললেন,—কার বিপদ?

ঐ অটুট ব্রহ্মচারীর। শক্তিমানের শক্তি লাভ হয়েছে, অথচ ঈশ্বর বিমুখ।

মোটেই না—বিপদটা তোমার মনে। সে তো ভালই আছে নিজ শরীর এবং বল ও বীর্যের আনন্দে। ঐতেই তার সুখ-শান্তি না থাক জীবনের সার্থকতা তো আছে—ঈশ্বরের কথায় তার কাজ কি?

নাইডু বললেন—যেন ক্যেমিক্যাল এ্যাকশানের মতো।

সাধু বললেন—সৃষ্টিতে সবই তো যোগাযোগেরই ব্যাপার—এখানকার খেলাটাই বিচিত্র। এখানে এক নেগেটিভের খেলাও আছে। সবই তো এক নিয়মে হয় না। ধর, সংযত পিতামাতার সন্তান সংযত প্রকৃতিরই হয়; আর যথাকালে সেই নিয়মেই হয়ে যায় প্রতিভার বিকাশ। আর কোথাও কোথাও দেখা যায়, ঐ উদ্দাম সম্ভোগ প্রবৃত্তি কোন প্রাকৃত নিয়মেই এমন আঘাত পায়, সেই বিষম আঘাতের বেদনাই তার প্রতিভা বিকাশের কারণ হয়।

এখানে জীব বিকাশর ক্রম জানতো। প্রাণরূপ চিৎশক্তি ঐ মাংসাস্থিপূর্ণ শরীর মধ্যে বাড়তে লাগলেন। কালের মধ্য দিয়ে সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মার গুণগুলি ফুটতে লাগলো শরীর মন ও বুদ্ধির সঙ্গে। যৌবনকালটাই ঐ সকল গুণ পূর্ণ বিকশিত হবার কাল;—বিশেষ চৈতন্য শক্তি সহজ কথায় বুদ্ধির। এখন কোন বিশিষ্ট আধারে ঐ চিৎশক্তি বিকাশের প্রবল বৈচিত্র আছে যেটা সাধারণ থেকে ভিন্ন।

তাকেই অসাধারণ বলছেন তো?

তারপর সৃষ্টি প্রেরণায় জাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রাম, সম্ভোগের আনন্দেই প্রথম পদক্ষেপ। মস্তিক পূর্ণায়ত, যখন আধার পুষ্ট হয়েছে' সবল মন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তখনই সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে চৈতন্যের যোগ, তারই ফলে প্রতিভা স্ফুরণ জীবন তার প্রতিভাদীপ্ত হয়ে উঠলো। তার

প্রধান লক্ষণ আত্মশক্তির উপর অসাধারণ বিশ্বাস এইটিই প্রথমও প্রধান, তাইতেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে নিজ বুদ্ধিবলে অভ্রান্তরূপে নিজ জীবনের উদ্দিষ্ট কর্মপথ নির্বাচন তার অবশ্যম্ভাবী ফল। দ্বিতীয় লক্ষণ, তার অবলম্বিত কর্মপন্থা গতানুগতিক পথে চলে না। তার কর্ম, ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞান বা শিল্প—যা কিছু প্রবৃত্তি নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েই ফুটতে থাকে। সে প্রতিভার কাছে সাধারণকে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তার উদ্ভাবিত জ্ঞানের অবদান অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণে বাধ্য করে। তীক্ষ্ণতম বিচার-বুদ্ধি তাকে গভীর ফলপ্রসূ চিন্তার অধিকারী, এমন কি পরিণামে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানময় জগতের গভীর রহস্যপূর্ণ প্রবেশপথও তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আপ্তকাম এবং তত্ত্বদর্শী মহান আদর্শ, জগৎগুরুরূপে সৃষ্টির কল্যাণে উৎসর্গী-কৃত জীবন,—পরমাত্মার উচ্চতম বিলাসের আধাররূপে জগতের জনসমাজ নূতন জ্ঞানের আলোকে বহু অজ্ঞাত তত্ত্বের সন্ধানও দিতে পারেন।

এখন বুঝলে, যাকে কামশক্তি, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ প্রবৃত্তি বলেছিলে সেটা আসলে কি পদার্থ এবং উপযুক্ত আধার হ'লে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আমরা স্থির হয়ে শুনছিলাম। সাধু চক্ষু চেয়ে দেখলেন একবার। তারপর বলছেন,—

অশেষ বৈচিত্র্যময় এ সৃষ্টিতে মানবই পরমাত্মার সার্থক সৃষ্টি, সংসারে আজ মানবই মহান; তার মধ্যে চৈতন্যশক্তির খেলা আর তার প্রসারের সম্ভাবনার জন্য মানবগোষ্ঠীই পরমাত্মার সৃষ্টি বিলাসকে পূর্ণ করেছে প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ বিলাসের মধ্যে দিয়ে,—এ বিলাস একমাত্র তাঁরই—এইটিই জানতে হবে আর নিজ নিজ জীবনকালেই তা পূর্ণ করতে হবে মানবকে। সর্বসুখের

অধিকারী এই মানব-মূর্তির ভিতরে বাহিরে তাঁরই সত্ত্বা অনুপ্রবিষ্ট ; —এইটিই এখানকার চরম উপলব্ধি ; এরই নাম ঈশ্বরলাভ, ভগবান পাওয়া বা আত্ম উপলব্ধি। এই হল এখানকাব সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস।

॥ ১০ ॥

এরপর আর আমাদেব কথার কিছুই রইল না। নাইডু একটি কি বলবার জন্য মুখ খুলছেন দেখেই সাধু বললেন,—

চুপ কর বাবা, ওটা আমিই বলছি। এখানে প্রত্যেক মানুষটির স্বাধীন সত্ত্বা, একজনের উপদেশ যে আর একজনের মনঃপূত হবেই এমন কথা নেই, কারণ তাব মূল সত্ত্বা স্বাধীন, তার নিজ বুদ্ধি থাক্‌তে আর কারো বুদ্ধি সে নেবে কেন? এখন এই যে কথায় কথায় আমার উপলব্ধিগত তত্ত্ব, তোমারই আগ্রহে গ্র্যাটিসে তোমাকে ধরে দিয়ে তোমারই গন্তব্যপথে সজাগ করতে চেয়েছি। ব্যবসায়ীবুদ্ধির দিক দিয়ে সেটা আমার কতটা আহম্মকি হয়েছে, তা আমি নিজেই জানি এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি ;—কিন্তু আমার সত্বাও তো স্বাধীন, তারও তো একটা বুদ্ধি বিচার আছে,—তুমি যেটা জানতে না, সেটি জানিয়ে দেওয়াতে আমার, এবং স্রষ্টার একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হ'ল। যেহেতু তাঁরই কাছ থেকে প্রেরণাটা এসেছে তাই তোমার মনঃপূত হয়েছে ; মহাকালই রইলেন তাঁর সাক্ষী।

সাধু চুপ করলেন ; একেবারেই নিস্তব্ধ বায়ুমণ্ডল।

এর পরেও আবার নাইডু যেন কিছু বলতে চাইলেন। এবার সাধু বললেন,—তাহলে নিঃসঙ্কোচেই বলো যখন বলবার বিষয় রয়েচে।

প্রভু, আর কিছুই আমার জানবার নেই, শুধু এইটুকু যে, জপ, ধ্যান, তপস্যা এগুলোর সার্থকতা কি?

শুনে সাধু হেসে বললেন,—

বললাম না, এখানে মানবের দুটি কাজ—ভোগ আর বিলাস। ভোগের কথা বেশ ভালই বোঝ; কেবল বিলাসটি কি পদার্থ তা ধরতে পারো নি।

ভোগটা যদি বুঝে থাক তাহ'লে জেনে রাখ ভোগ ছাড়া তোমার যা কিছু সৎ বা মহৎ কর্মোদ্যম সবই বিলাস। মানবজীবনে মৃত্যু অথবা সমাধি বা আত্মস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সবটুকু ভোগ আর বিলাসেরই জীবন। স্থূল নিয়ে মনের অধিকারে আনন্দ নিরানন্দ সেটা ভোগ, আর চৈতন্যের ক্ষেত্রে ধ্যানাদি, জ্ঞানানুভূতি-মূলক যত কর্ম তাই হল বিলাস। অর্থাৎ তোমার ধর্ম, কর্ম, বিচার ও সৎপ্রবৃত্তির বিস্তার নিয়ে যে ঘন আনন্দ, সেটিই বিলাস।

তার সঙ্গে যদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটে যায়,—সৃষ্ট-প্রবৃত্তি জাগে?—

তাহলে স্থূল ভোগের পর্যায়ে পড়লো;—এও কি বলে দিতে হবে?

তবুও নাইডু বললেন,—ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য জপ, তপ, ধ্যান?

বিলাস ছাড়া আর কি? দেখছ ওটা উদ্দেশ্যমূলক কর্ম, বিলাস ছাড়া আর কি?

যদি প্রেম সম্বন্ধ কারও সঙ্গে ঘটে?

নরনারী নির্বিচারে, কাম সংস্পর্শশূন্য শুদ্ধ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিগত সম্বন্ধ যদি হয়, মানব সমাজে এই বিলাস নিয়েই মানবের মহত্ত্ব নিরূপিত হয়। ফলে অ-ভেদ বুদ্ধিই তো আসবে; তাই তো সৃষ্টির চরম বিলাস। এর বড় এখানে আর কিছু আছে নাকি?

তাকেও বিলাস বলছেন কেন আপনি?

সংক্ষেপে তত্ত্বটি বুঝাতে। তা ছাড়া ওটা আমি বলছি নাকি?

তবে আবার কে বলেছে?

সারা সৃষ্টি, এই চরাচর, বিশ্বজগৎ যার বিলাস মাত্র, এই

বিলাসই যে তাঁর ঈশ্বরত্ব, অহরহ সর্বক্ষণই এর মধ্যে রয়েছেন, প্রত্যেককে (উস্কানি) প্রেরণা দিচ্ছেন, তাঁর বেশী আবার কে বলবে !

আমরা স্তম্ভিত হ'লাম, কথা যেন শেষ হয়ে গেল। সাধু কতক্ষণ পরে বললেন, এখন হয়েছে তো। আর কি চাই ?

নাইডুর সাহস বেড়ে গিয়েছে ; কিছুতে স্থির হতে পারছেন না বেশ বুঝলাম, আত্মাভিমানী মানুষের গরিমার বেগ সংযত হতে চায় না। আরও, বোধ হয় যে, সাধু কিছুতেই রাগ করবেন না, তাই বুঝেই বলে ফেললেন,—চাই তো অনেক কিছুই কিন্তু দেবে কে ?

সাধু বললেন,—

ভিখারীর আকাঙ্ক্ষা কে কবে মেটাতে পেরেছে বাবা, একটির পর আর একটি ভাব অভাব যে আসবেই। ওটা যে তারই অভাব, সৃষ্টির খেয়াল।

দোহাই প্রভু, হেঁয়ালী রাখুন যথার্থ বলুন ; আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কিছু কর্ম চাই কিনা।

জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা চলতে পারে, চিন্তা চলতে পারে কিন্তু যদি ঈশ্বরলাভের, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য হয় তা হলে। কোন চেষ্টাই চলে না বরং সকল চেষ্টা বা কর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করাই আসল কাজ। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের ঠেলায় যা কিছু করবে তাই হবে বিলাস, ঈশ্বরলাভের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। তা তোমারই আনন্দ ও সম্ভোগের ব্যাপার বা বিষয়।

তবুও কেন মনে হয় যেন কিছু করতেই হবে।

আসল কথাটা কি জান, বিসনেস্ ম্যান্, মন নিয়েই কারবার কিনা এখানে সব কিছু চেষ্টার দ্বারাই লাভ হয়। ছোট বড় সকল কিছুর পিছনে চেষ্টা চাই। কাজেই ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা অত বড় জিনিস বিনা চেষ্টায় লাভ হবে, এ যে একটা হাসির কথা, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য আর কি হতে পারে ?

নাইডু তবু ছাড়েন না, আমার দিক থেকে একটু বুঝে দেখুন না, প্রভু!

প্রভু বললেন, বদ্ধ হওয়ার ঐ তো দোষ, কিছু করতে হবেই না হ'লে নাইডুর অহং শান্ত হতেই পারবে না। আরে বাবা! নিজ পুরুষার্থেই করছ তো অনেক কিছুই, বিসনেস করচো কত রকমের দান, ধ্যান, জপ উৎসব, তীর্থভ্রমণ, সম্প্রদায়িক ছাপওয়ালা সাধুসেবা, মন্দির-নির্মাণ আরো কত কি। কিন্তু ঈশ্বরলাভ পুরুষার্থের বিষয় নয় যে ;—বরং বিরোধী। এ কি ক'রে তোমায় বুঝাব বলো দেখি ; তোমার নিজ-শক্তিতে আর পাঁচটা লাভ, করার যে কাজ সেই সব কাজের মত তাকে লাভ করবে, কাছে আনবে, বাধ্য করবে সে বস্তু ঈশ্বর নয়। চেষ্টা বা পুরুষার্থে সব কিছুই হতে পারে, কেবল ঐটি ছাড়া।

তবু কিছু করণীয় উপদেশ বলুন, বুঝতেই তো পারছেন সবই।

তা তো পারছি, কিন্তু ঐ যে বললাম বেশী আর কিছু করতে হবে না, যা করছো তাই স্ফূর্তিতে করে যাও ; সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কালেনাত্মনা বিন্দতি ; জান তো।

আপনি তো চলে যাবেন এখানকাব বিলাস শেষ করে—তখন কি নিয়ে থাকব ? আপনাকে ভোলা যাবে না, তবু কিছু উপদেশ পেলে তাই নিয়েই থাকব। একটু আর বুঝলেন না।

আমাদের দেশে, নেই-আঁকুঁড়ে যাকে বলে, তুমি হলে তাই তোমার ট্যাক্টও যতো টেনাসিটিও ততই দেখছি,—নাছোড়বান্দা। আচ্ছা দেখা যাক, একটা বলছি, দেখ যদি পার।

বলুন, বলুন প্রভু। জয় হোক আপনার। আনন্দে নাইডু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সাধু বললেন—ও ফাঁকা জয় নিয়ে আমি কি করব ? আর ভগবানও ঘুষখোর নয়। মানুষের জয় অধিকারও নেই।

শুনেই নাইডু বললেন, ইউরোপ আমেরিকা তো মানুষের জয় ঘোষণাই করছে, নেচারকে কঙ্কার ক'রে।

ওরা করুক, ওটা ওদেরই কর্মপথ; আর কংকারের মোহটাই ওদের মধ্যে পরমাত্মারই দান,—সেইটাই ওদের শ্রেষ্ঠ বিলাস; করুক না কংকার নেচারকে, ঠেকলে তখন পথ সহজ হয়ে যাবে। এখন একটু স্থির হও দেখি; একেবারেই স্থির।

শুনেই নাইডু সোজা কাঠ হয়ে বসলেন, বাড়ীতে জপ তপ ক'রতে যেমন ভাবে বসেন।

না না, ওরকম কাঠ হ'লে চলবে না, শরীব সহজ করো; রিপোজ,—শরীর জ্ঞান ছেড়ে দাও—সম্পূর্ণ বিরাম চাই।

খানিকক্ষণ দেখতেই রইলেন। তাবপব ধীরে ধীরে কাঁধে ডান হাতটি রেখে বললেন—

এ শরীর কার?

আমার।

তারপর সাধু একটি আঙ্গুল নাইডুর বুকে ঠেকিয়ে,—

এর মধ্যে কে আছে?

আমি—

তারপর ঐ আঙ্গুলটি নাইডুর যুগলেব মধ্যে স্পর্শ ক'রে,—

এখানে কি বোধ হচ্ছে?

নাইডু চক্ষু দুটি বুজিয়েই বললেন—

আমি—শুধু আমি। শুনে সাধু বললেন—

ঠিক তো? নাইডু নির্বাক। সাধু বললেন,—বেশ, ঐ আমি বোধটিই তোমার আসল সত্তা। এখন যেখানে বোধটি হচ্ছে ঐখানে মনটি রাখ দেখি। এই হ'ল তোমার নিত্যকর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।

কতক্ষণ সব চুপচাপ, নাইডু বেশ স্থির হয়েই গিয়েছেন। সাধু খানিক পর বললেন, তোমার দেহাতিরিক্ত ঐ আমিটি অনুভবের

সঙ্গে যখন বেশ মিলে এক হয়ে গিয়েছে তখন থেকেই তোমার আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। শুনছো?

বলুন—

এরপর তোমার সামনে যে মূর্তিই আসবে, তোমার ঐ আমি, সেই মূর্তির মধ্যেই রয়েছে; এইটিই হবে তোমার অনুভূতি. তোমার ঐ আমি সত্ত্বা, সবারই ভিতরে অর্থাৎ তুমি সত্ত্বারূপে সবার মধ্যেই রয়েছ। যাকেই তুমি দেখনা কেন তার মধ্যে তোমারই ঐ আমি সত্ত্বা। এইটি চালিয়ে যাও দেখি। দেখো, ঠিক ধরতে পেরেছো তো?

বোধ হয় পেরেছি।

যদি কল্পনা না মেশাও ওর সঙ্গে তা হ'লে সহজ। অতিবুদ্ধির ফলে কল্পনার যোগ ঘটালেই আর একরকম ফল দেবে তা তোমার ধাতে সইবে না, আমারও বদনাম। তোমার নিজের কোন কাজেই বাধা হবে না এটা। চেষ্টা এটুকু করবে—তোমার শত্রু বলে কেউ যেন ফাঁক না পড়ে, বাদ না যায়। এইভাবে সবাইকে জড়াও দেখি এই জালে। দেখনা, কি ফল হয়। তারপর আর এক কথা—কারো সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথা বা কোন আলোচনাই চলবে না—স্ত্রীর সঙ্গেও না। মোদ্দা কথা এই যে তুমি ছাড়া তোমার এই সাধনের কথা আর কেউ জানবে না। তারপর যা, সেটা শুধু যখন আমি আসবো তখন বুঝবো, কেমন?

প্রথম পরিচয়ে দেখেছিলাম যোগী এবং ঐশ্বর্যশালী; তারপর দেখলাম রাগমার্গের প্রবল অধিকারী। হরি, হরি এখন দেখলাম —পূর্ণজ্ঞানী বৈদান্তিক। এই ত্রি-মূর্তিই সাধুকে পরমহংসের স্তরে ধরে রেখেছে।

এখন শেষ কথাটা শোনো ব'লে সাধু চক্ষু দুটি খুললেন, আজ

আমি যাচ্ছি। যদি আবার কখনও এ দিকে আসি তো দেখা হবে। আচ্ছা, এখন বল, পারবে তো?

চেষ্টা করব, তবে নিশ্চয়ই পারব কিনা,—

আবার সন্দেহ! কাজ নেই তা হ'লে, ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার কিছু—

না না, তা হবে না প্রভু! যা দিয়েছেন তা একেবারেই দিয়েছেন, আমার বিশ্বাসটা প্রথম থেকেই জমে গিয়েছিল, কোন সংশয় নেই, বে বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল তাই। এখন থেকে আমরণ এ ভ্যাস আমি ক'রে যেতে পারব।

যে আত্মবিশ্বাস তোমার সকল কর্মগতির মূলে সেইটিই থাকবে র মধ্যেও,—

এইখানেই ইতি করো বাবাজী।